স্বাধীনতা-দিবস

শ্রীঅমলা দেবী

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫

মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—১০. ১০. ৫০

সূচী

স্বাধীনতা-দিবস

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট।

প্রভাত-ফেরীর গানের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। শহরের ছেলেমেয়েরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—

"ছিঁড়িল বন্ধন, টুটিল শৃঙ্খল
নূতন প্রভাতে কে তোরা যাবি চল্—"

স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রভাত। দেশের নেতৃবৃন্দের হাতে শাসন-রশ্মি তুলিয়া দিয়া বিদেশী-রাজ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা। বহুজনের বহুদিনের স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে। বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, শৃঙ্খল টুটিয়াছে। বাঁকিয়া-পড়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া, জীবনযাত্রার পথে চলিবার অধিকার পাইয়াছে ভারতবাসীরা। জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় দিন আজ।

অতএব আর বিছানায় পড়িয়া থাকা ঠিক নয়; উঠিয়া শুদ্ধ-শান্ত চিত্তে আজিকার প্রভাতকে অভিবাদন করা উচিত।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা দেখিলাম আমার আগেই উঠিয়াছেন। অন্য দিন গৃহিণী বেলা আটটা পর্যন্ত শয্যালগ্না হইয়া থাকেন। ছেলেমেয়েগুলি চা না খাওয়া পর্যন্ত চাঙ্গা হইয়া উঠে না। আজ সকলের মনেই একটি নব-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে; ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। স্বাধীন জীবনের প্রথম প্রভাতে আশাপ্রদ লক্ষণ।

ছাদের উপর হইতে ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহারা। তিন টাকা খরচ করিয়া একটি খদ্দরের জাতীয়-পতাকা কিনিয়া আনা হইয়াছে। মশারির ডাণ্ডায় বাঁধিয়া সেটিকে ওড়ানো হইবে। পতাকা-উত্তোলনের সম্মান বাড়ির কাহার হাতে দেওয়া হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য কাল একটি পারিবারিক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি আমি স্বয়ং। বড় মেয়েটি আমার নাম, বড় ছেলেটি আমার স্ত্রীর নাম প্রস্তাব করে। সংখ্যাধিক্যের উপরে আমার নাম বাতিল হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর পক্ষে ভোট দিয়াছিলাম। কাজেই পতাকা-উত্তোলনের ভার গৃহিণীর উপরে পড়িয়াছে। কথা আছে, উৎসব-সভায় তাঁহাকে একটি বক্তৃতা করিতে হইবে। বক্তৃতা আমি লিখিয়া দিয়াছি। তিনি কাল রাত্রি জাগিয়া সেটি মুখস্থ করিয়াছেন। যাহাদের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নাই তাহারা জানে, বক্তৃতা দেওয়ার আগের সময়টা কি সাংঘাতিক! মুখে আহার রোচে না, চোখে ঘুম আসে না, সারাক্ষণ মনে দারুণ অস্বস্তি। গৃহিণীর সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙার ইহাও কারণ হইতে পারে।

ছাদে উঠিতেই সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল, বাঃ রে! এত দেরি! হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে আসুন। বাড়ির পতাকা তুলতে দেরি হ'লে আবার শহরে যাব কখন?

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। মাথার উপর মেঘহীন আকাশ; পূর্বাকাশে নবীন সূর্য প্রসন্ন হাস্যে দীপ্তিমান। এই ভারত হইতেই প্রথম স্তুতিগান উঠিয়াছিল তাঁহার; শ্রদ্ধানতচিত্তে তাঁহার মহিমা-কীর্তন করিয়াছিল এই ভারতের ঋষিবৃন্দ। ভারতের কত উত্থান, কত পতন, প্রতিভার চরমতম বিকাশ, মোহাচ্ছন্নতার চরমতম গ্লানি, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠা, দুর্ভাগ্যের গভীরতম

গহ্বরে অবলুণ্ঠন, চোখ মেলিয়া দেখিয়াছেন। আজ ভারত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সৌভাগ্য-সৌধের প্রথম সোপানে পা দিয়াছে। প্রসন্ন হাস্যে আশীর্বাদ করিতেছেন তিনি।

প্রতি বাড়িতে জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে—কোনটি খদ্দরের, কোনটি সিল্কের। সাড়া পাড়াটিতে আনন্দ-চাঞ্চল্য। বাড়িতে বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, মাঝে মাঝে পটকার শব্দ। দূরে একটা বাড়িতে রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে।

নীচে নামিলাম। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, গৃহিণী খাবার তৈয়ারি করিতেছেন। পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানটিকে শুধু মনের পক্ষে নয়, রসনার পক্ষেও তৃপ্তিকর করিয়া তুলিবেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিলেন, যাও, তৈরি হয়ে এস, তোমাদের আবার পাড়ায় একবার যেতে হবে তো!

পাড়ার ছেলেরা পাড়ায় পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে। সকলকেই চাঁদা দিতে হইয়াছে, যাহার যেমন সাধ্য। জেলা-কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন। পাড়ার মাঝখানে কতকটা প'ড়ো জমি আছে। সেইখানেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাড়ার ছেলেদের উৎসাহের সীমা নাই। নিজেরাই ঝোঁপ-ঝাড় কাটিয়া জমিটা পরিষ্কার করিয়াছে। সামনে দেবদারুপাতা দিয়া গেট তৈয়ারি করিয়াছে। চারিধারে খুঁটি পুঁতিয়া আম্রপল্লব টাঙাইয়াছে। স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েরা কুচ-কাওয়াজ শিখিতেছে, সামরিক কায়দায় পতাকা-অভিবাদন-প্রণালী রপ্ত করিতেছে। পাণ্ডা-ছেলেরা কাল সারারাত্রি ঘুমায় নাই, হৈ-হৈ করিয়াছে। কাহার একটা গ্রামোফোন সংগ্রহ করিয়া স্বদেশী-গান বাজাইয়াছে ও পটকা ফুটাইয়াছে।

পাড়ার একটি ছেলে আসিয়া বেলা আটটায় সভাস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়া গেল।

স্ত্রীকে কহিলাম, হরিসাধনবাবুর ছেলেমেয়েদের ব'লে পাঠালে না কেন?

স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, খুব তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিয়েছ তো! ভুলেই গিয়েছিলাম।

গৃহকর্তা-সুলভ গাম্ভীর্যের সহিত কহিলাম, তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দাও। বাড়িতে অসুখ; আজকার দিনেও ছেলেমেয়ে দুটো মুখ চুন ক'রে ঘুরে বেড়াবে! আসুক, একটু আনন্দ করুক—

স্ত্রী কহিলেন, খবর কালই দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো এসে গেছে তারা। ওপরে গিয়ে ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা ছাড়া আজ দুপুরেও এখানে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছি ওদের।

অপ্রতিভভাবে কহিলাম, তাই নাকি! বেশ বেশ।—বলিয়া সরিয়া পড়িলাম।

যথাসময়ে ছাদে আসিয়া দেখিলাম, সব প্রস্তুত। গৃহিণী একটি লালপাড় গরদের শাড়ি পরিয়াছেন। মুখে গাম্ভীর্য। একটি শতরঞ্জি পাতা হইয়াছে। এক দিকে একখানি ছোট চৌকির উপর মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ছেলেমেয়েরা সকলে দাঁড়াইয়া আছে। বড় মেয়ের হাতে শাঁক। হরিসাধনবাবুর ছেলেমেয়ে দুটিও আসিয়াছে দেখিলাম। মেয়েটির পরনে মলিন ফ্রক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল রুক্ষ বিশৃঙ্খল। ছেলেটির পরনে ছেঁড়া এখানে-ওখানে-তালি-মারা হাফ-প্যাণ্ট; পা খালি। দুইজনে লজ্জিত মুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটির নাম টুনু। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কেমন আছেন? টুনু

ম্লান মুখে জবাব দিল, ভাল নেই আপনাকে যেতে বললেন একবার।

গৃহিণীকে কহিলাম, আরম্ভ হোক এবার।

ছেলেমেয়েরা 'বন্দে মাতরম্' গান শুরু করিয়া দিল।

গান শেষ হইল। মশারির ডাণ্ডা একটি ছাদের আলিসার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছিল। গৃহিণী একটি টুলে চড়িয়া পতাকাটি ডাণ্ডার মাথায় পরাইয়া দিলেন। মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাইতে লাগিল। বাকি ছেলেমেয়েরা 'বন্দে মাতরম্' হাঁকিল। সকলে জাতীয়-পতাকাকে অভিবাদন করিলাম।

তারপর গৃহিণী মুখস্থ-করা বক্তৃতা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন। আমাকেও কিছু বলিতে হইল। বলিলাম, আজ যে পতাকা দেশের বুকে তোলা হ'ল, আমরা যেন তার উপযুক্ত হতে পারি।

তারপর চা ও খাবার আসিল। খাওয়া-দাওয়ার পরে টুনুকে বলিলাম, আমি একটু পরে যাচ্ছি, তোমার বাবাকে বল গিয়ে।

গৃহিণী কহিলেন, স্নান ক'রেই তোমরা দুজনে চ'লে এস, বুঝলে?

ছেলেমেয়ে দুটি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে পাড়ার অনুষ্ঠানে হাজির হইলাম। পাড়ার সকলেই উপস্থিত। কংগ্রেসের নেতা মহাশয়ও আসিয়াছেন। একটি দামী চকচকে নূতন মোটরগাড়িতে আসিয়াছেন। গাড়িটি কোন বড়লোক মাড়োয়ারীর সম্ভবত। নেতা মহাশয়ের পরিধানে খদ্দরের ধুতি, ঢিলা-হাতা আজানুলম্বিত খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডেল। মুখে প্রবল গাম্ভীর্য। আরও অনেক জায়গায় পৌরোহিত্য করিতে হইবে তাঁহাকে। সেইজন্য সভার কাজ শুরু করার জন্য তাড়া দিতেছেন।

একদল ছেলেমেয়ে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া 'বন্দে মাতরম্' গান

গাহিতে শুরু করিল। ছেলেদের পরিচ্ছদ নানাবিধ। কাহারও হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-হাতা শার্ট ; কাহারও পায়জামা, জওহরী-কোট ; কাহারও বা ধুতি পাঞ্জাবি। মেয়েরা সকলে শাড়ি পরিয়াছে, আঁচল কোমরে জড়ানো। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে সব। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কাহারও স্বাস্থ্য ভাল নয়। স্বাস্থ্যহীনতার চিহ্ন দেহে ও মুখে সুস্পষ্ট। তবু আজ তাহাদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ। নিত্য দেখে তাহারা, সংসারে তাহাদের কত অভাব, কত কষ্ট, কত অশান্তি! তাহাদের বাবা ভাই অ স্বজনরা শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারে না। স্বল্প আয়ে সংসারের সাধারণ খাদ্য ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করিতেই তাহাদের বাপ-মায়েরা হিমসিম খাইয়া যায় ; ভদ্রতার মুখোশ বজায় রাখিবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করিতে করিতে প্রতি মুহূর্তে তাহাদের প্রাণ ক্ষয় হয়। বর্তমান তাহাদের নিরানন্দময়, ভবিষ্যৎ অনির্দেশ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদেশী রাজারা এতদিন শাসন ও শোষণ করিয়াছে, কিন্তু প্রজাদের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সাফল্যময় করিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নাই। স্বাধীন জীবনে এ অবস্থার পরিবর্তন আসিবে নিশ্চয়। দেশের লোকের জীবনযাত্রা সুগম হইবে ; যোগ্যতা অনুসারে উপার্জনের ব্যবস্থা হইবে ; যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাইবে প্রত্যেকে জাতি-ধর্ম-শ্রেণীনির্বিশেষে। দেশের লোকের দেহে স্বাস্থ্য, মনে সজীবতা, প্রাণে শক্তি, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য আসিবে। ইহারই স্বপ্ন দেখিতেছে বোধ হয় ছেলেমেয়েগুলি। এই সুখ-স্বপ্নের আভা পড়িয়াছে তাহাদের মুখে।

দূরে পিছনে দাঁড়াইয়া পাড়ার বাউরীদের স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েরা। ছোট ছেলেমেয়েগুলির কাপড়-চোপড়ের বালাই নাই ; কোমরে

তেল-চিটা ঘুনসি। পুরুষদের কোমরে খাটো ময়লা একখানা করিয়া কাপড় জড়ানো। মেয়েদের, দুই-চারজন যুবতী মেয়ে ছাড়া, পরনে মলিন জীর্ণপ্রায় শাড়ি। যেমন করিয়া পূজার সময়ে দূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া পূজা দেখে, এখনও তেমনই দূরে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখিতেছে। কি ব্যাপার হইতেছে জানে না। ভাবিতেছে. বাবুদের ছেলেদের কোন উৎসব বা তামাশা হইতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকারের অনুভূতি তাহাদের নাই। তবে যদি কাঙালী-ভোজন হয়, এক পাশে বসিয়া একপাতা খাইবার আশা আছে। পাড়ার ছেলেরা ইহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। দুপুরে দুইখানা করিয়া লুচি ও একমুঠা করিয়া বোঁদে দেওয়া হইবে পাড়ার 'ছোটলোক'দের প্রত্যেককে। তখন তাহারা দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিবে; সামান্য ভিক্ষা প্রাপ্তিতেই মুখে আনন্দ ফুটিবে সবারই।

ছেলেমেয়েদের গান শেষ হইল। জমিটার মাঝখানে একটা বাঁশ পোতা হইয়াছে; তাহার মাথায় দড়ি বাঁধিয়া পতাকা তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পতাকাটি মাঝ-পথে কাত হইয়া ঝুলিতেছে। নেতা মহাশয় আগাইয়া গিয়া দড়ি ধরিয়া টান দিলেন; পতাকাটি সরসর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, অন্তরাল হইতে পাড়ার মহিলারা উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন; দম দম শব্দে পটকা ফাটিতে লাগিল। পতাকাটি একেবারে বাঁশের মাথায় উঠিয়া পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা মিলিটারী কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন করিল। তারপর গান ধরিল, "কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—"। গানের মাঝখানে দলপতি হাঁক দিল, ডাইনে ফেরো। ছেলেমেয়েরা একযোগে আদেশ পালন করিল। আবার হুকুমের হাঁক হইল, সামনে আগাও।

ছেলেমেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইল। নেতা মহাশয় বিদায় লইলেন। আমিও শহরের অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

হরিসাধনবাবুকে একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার বাড়ি আমার বাড়ি হইতে একটু দূরে। প্রথমে সেইখানেই যাওয়া স্থির করিলাম।

সদর-রাস্তা হইতে বাঁ-হাতি একটা সরু গলি দিয়া কতকটা গেলেই একটা প'ড়ো জমি। বর্ষায় আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারই মাঝ দিয়া একটি অপরিসর পায়ে-চলা পথ। জমিটার ও-পাশে নীচু মাঠ; মাঠের ও-পারে একটা পুরানো বাগান; বাগানের এক পাশে মদের ভাঁটি। দিনের বেলা বেলা তিনটা পর্যন্ত এ দিকটায় লোক-চলাচল বেশি থাকে না। তিনটার পর হইতে পাড়ার ও বেপাড়ার বাউরী, মুচী, মেথর ও অন্যান্য শ্রমিক-শ্রেণীর লোকেরা ক্রমাগত দলে দলে মদের ভাঁটির দিকে যাইতে থাকে। সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত মাতালদের বেয়াড়া ও বেসুরা কণ্ঠের গানে, অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও বিলাপে স্থানটার নির্জনতা ঘুলাইয়া উঠে।

এই জমিটার এক পাশে হরিসাধনবাবুর বাড়ি—মাটির; খড়ের ছাউনি। বাড়িটি হরিসাধনবাবুর নিজের নয়, ভাড়া করা। শহরের জনৈক ব্যবসাদার তাহার রক্ষিতার জন্য বাড়িটি তৈয়ারি করিয়াছিল। পাখি অনেকদিন পলাইয়াছে, জীর্ণ পিঞ্জরটা কোন মতে টিঁকিয়া আছে। হরিসাধনবাবু নামমাত্র ভাড়া দিয়া এখানে বাস করিতেছেন।

বাড়ির সামনে চোরকাঁটার জঙ্গল। কোঁচা বাঁচাইয়া যাইতে হইল। সদর-দরজা খোলা ছিল। বাড়ি ঢুকিতেই উঠান; উঠান

পার হইলেই পাশাপাশি দুইটি ছোট কুঠরি ; সামনে লম্বালম্বি অপ্রশস্ত বারান্দা। ডান দিকের কুঠরিতে তক্তাপোশের উপর মলিন শয্যায় বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন হরিসাধনবাবু। অস্থিচর্মসার দেহ। বুকের হাড়গুলা চামড়া ঠেলিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। হাত ও পা কাঠির মত সরু। পায়ের পাতা ফুলিয়া উঠিয়া গোদের মত দেখাইতেছে। মুখও ফোলা ; চোখ দুইটা প্রায় ঢাকা পড়িয়াছে। রক্তশূন্যতার জন্য সারা দেহ হলদে হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। যেন নির্বাপিত-প্রায় ধূম-মলিন দীপশিখা। মাথায় বড় বড় রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুল। মুখ গোঁফ ও দাড়িতে আচ্ছন্ন। ক্রমাগত হাঁপাইতেছেন ; বুকটা হাপরের মত দুলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিলেন, এস ভাই, ব'স।

হরিসাধনবাবুর স্ত্রী মাটিতে বসিয়া একটা কাঁসার বাটিতে ঔষধের শিশি হইতে ঔষধ ঢালিতেছেন। আমাকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইয়া, জল খাওয়াইয়া, আঁচলে স্বামীর মুখ মুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

কহিলাম, কেমন আছেন ?

হরিসাধনবাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, ভাল নয়। গলা হইতে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে লাগিল।

কহিলাম, ওষুধে কোনও কাজ হচ্ছে না ? মুখ কুঁচকাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া হরিসাধনবাবু কহিলেন, না। বিনা পয়সার ওষুধ তো।— একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কাল ভারি কষ্ট গেছে সারারাত। এক মিনিট ঘুমোতে পারি নি। তার ওপর সারারাত হাঙ্গামা। হরদম পটকা ফুটিয়েছে ছেলেগুলো।—দম লইয়া

কহিলেন, স্বাধীনতা পেয়েছে ব’লে ফুর্তিতে অস্থির হয়ে গেছে সব। আরে, কাদের স্বাধীনতা হ’ল বুঝে দেখ্ আগে, তারপর ফুর্তি করবি। আবার হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, স্বাধীনতা পাওয়া গেলেও আমার মত লোকদের কি সুবিধে? দু বেলা পেট ভ’রে খেতে পাব আমরা? রোগ হ’লে চিকিচ্ছে হবে আমাদের? ছেলেপিলে মানুষ হবে আমাদের? কিছু হবে না। পরাধীন থাক, আর স্বাধীনই হও, শালগ্রামের শোওয়া-বসা দুইই সমান।

কহিলাম, সুবিধে হবে বইকি! দেশের যাঁরা কল্যাণকামী নেতা, তাঁরাই তো কর্ণধার হলেন।

হরিসাধনবাবু কহিলেন, কর্ণধার তো হলেন, কিন্তু তাঁদের কর্ণ ধারণ ক’রে থাকবে যে দেশের বড়লোকগুলো। তাদের স্বার্থ বজায় ক’রেই চলতে হবে তাঁদের। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার কতদূর কি ব্যবস্থা হবে, ভগবান জানেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বড়লোকগুলোকে তো চিনলে ক বছর ধ’রে! কারও মুখের দিকে তাকায় না ওরা; নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার উপর আঠারো আনা দেখে; টাকার পাহাড় জমিয়েও টাকার লোভ মেটে না ওদের—যেমন ক’রে হোক টাকা চাই; দেশের লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরলেও কিছু যায়-আসে না ওদের। ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জন্তু-জানোয়ারেরও অধম। উত্তেজনায় ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে হরিসাধনবাবু কহিলেন, অর্থের স্পৃহা যে ভদ্র শিক্ষিত লোককেও কত অবিবেচক করে, আমাদের বড় বড় ডাক্তারদের দেখলেই বুঝতে পারবে। মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে, তবু আমাদের মত গরিবের

বাড়িতেও পুরো ফী নেয়। এতটুকু দয়া হয় না। একটিবার ভেবে দেখে না, তাদের একটা পুরো ফী আমাদের মত লোকের সমস্ত পরিবারের এক সপ্তাহের আহার।

টুনু ও তাহার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিল। হরিসাধনবাবু কহিলেন, কোথায় গিয়েছিলি ? একটু পাখা কর্ দেখি। টুনু একটা পাখা লইয়া পাখা করিতে লাগিল। ছেলেটি মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

হরিসাধনবাবু কহিলেন, কাল রাত্রে যা হ'ল, ভাবলাম, বুঝি হয়েই গেল। অনেক কষ্টে সামলালাম। বাঁচব না আর বেশিদিন। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, বাঁচব কি ক'রে ? কহিলাম, মাখনবাবু কি আসছেন না ? ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, মাখনবাবুর কোন ত্রুটি নেই। দিনে একবার আসেন, দেখেন, ওষুধ দেন। একটি পয়সা নেন না। বড় ভাল লোক। কিন্তু কিছু জানেন না তো। গুরুপদ ডাক্তারকে যদি একবার দেখাতে পারতাম! শহরের বড় ডাক্তার। সেরে উঠব না আর জানি, তবু একটু ভাল চিকিচ্ছে হ'লে যদি কিছুদিন টিঁকে যেতে পারি। ছেলেটাকে যদি পাস ক'রে একটা ভাল চাকরি-বাকরি করতে দেখি তো নিশ্চিন্তে মরতে পারি। তবে টাকা চাই। স্ত্রীর গায়ে এক টুকরো রাংও নাই ; সব বিক্রি হয়ে গেছে। তবে বাসন-কোসন দু-চারখানা এখনও আছে, যদি বাঁধা দিয়ে কিছু পাওয়া যায়—

কহিলাম, ওসব থাক্। গুরুপদবাবুর কাছে যাব আজ। বুঝিয়ে বললে হয়তো ফী নেবেন না। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, পাগল! তা কি আসবে ? ফী পাবে না জানতে পারলে কোন অছিলা ক'রে পাশ কাটিয়ে যাবে, দেখো, তার চেয়ে বরং—

বাধা দিয়া কহিলাম, আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক নিয়ে আসব ওঁকে। আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ—

বেশ, যদি পার তো ভালই। তোমার উপকার—। যাক্, ও কথা ব'লে আর অপমান করব না তোমার।

বাহিরে আসিলাম। হরিসাধনবাবুর কথা মনে ভাসিতে লাগিল। জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না তাঁহার। পনরো আনা শিক্ষিত বাঙালীর মত অন্তরের যোগ ছিল। কিন্তু শাস্তি পাইয়াছেন রীতিমত। মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়ে তাঁহার বোর্ডিঙের ছেলেরা কয়েকটি হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়ে। জাঁদরেল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই অপরাধে তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। কর্তৃপক্ষদের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন; কোনও ফল হয় নাই। অনেক স্কুলে নীচু ক্লাসের শিক্ষকতার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে, কেহ তাঁহাকে চাকুরি দিতে সাহস করে নাই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া পড়েন। শেষে আমাদের শহরে আসেন। ওই মাটির বাড়িটা অতি অল্প টাকায় ভাড়া লইয়া বাস করিতে শুরু করেন। সেই সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ হয়। আমি কয়েকটি টিউশনি যোগাড় করিয়া দিই। তাহাতেই কোন মতে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে কষ্টের সীমা ছিল না। লঙ্গরখানা হইতে লাপসি আনাইয়া খাইতে হইয়াছিল অনেকদিন। এই সময়ে ভদ্রলোক অসুস্থ হইয়া পড়েন। টিউশনিগুলি হাতছাড়া হইয়া যায়। স্ত্রীর সামান্য অলঙ্কার যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে হয়। কাজেই চিকিৎসা নিয়মিতভাবে হয় নাই। ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া

গিয়াছেন। বৎসর তিন আগে বড় ছেলেটি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের অনুগ্রহে কোন এক সওদাগরী আপিসে অতি সামান্য বেতনে কেরানীর চাকরিতে ঢুকিয়াছে। তাহা ছাড়া দুই-তিনটি টিউশনি করে। নিজের খরচ চালাইয়া যাহা বাঁচে, পাঠাইয়া দেয়। তাহাতেই কোন মতে দুই বেলা অনশনকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। ছেলেটি চাকরি করিতে করিতে আই. কম. পাস করিয়া বি. কম. পড়িতেছে। পাস করিতে পারিলে চাকরিতে উন্নতি হইবে—আপিসের বড়বাবু আশা দিয়াছেন। এইটি চোখে দেখিয়া যাইবার জন্য হরিসাধনবাবু জীবনকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শহরের দিকে চলিলাম। কতকটা যাইতেই রাস্তার ধারে রায় বাহাদুর সঞ্জীব সোমের বাড়ি। ইনি অবসরপ্রাপ্ত পুলিসের বড় সাহেব। বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। ড্রয়িং-রূমে রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে। উপরে তাকাইয়া দেখিলাম, বাড়ির মাথায় জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে। বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটর-গাড়ি, তাহার সামনে একটা পতাকা। ছেলেমেয়েরা খদ্দরের ধুতি শাড়ি পরিয়া আনন্দ-কলরব করিতেছে। জন দুই মিস্ত্রী বাড়ির কার্নিসে বিদ্যুতের তার বসাইতেছে। রাত্রে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হইতেছে সম্ভবত।

স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে করিতেছেন রায় বাহাদুর। অথচ সারা জীবন ধরিয়া স্বাধীনতার স্রোতকে প্রাণপণে রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইনি। সামান্য দারোগা ছিলেন প্রথমে। জন কয়েক বিপ্লবীকে ধরিয়া পদোন্নতি হয়। কাঁথিতে লবণ-আন্দোলনের সময় সেখানে পুলিসের কর্তা ছিলেন। অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন

সেখানে। মেদিনীপুরে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময়ে শহরবাসী, তথা জেলাবাসীদের উপরে নির্মম নির্বিচার নির্যাতন চালাইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতার সূর্য উঠিতে না উঠিতেই অভিনন্দন জানাইতেছেন। পেন্‌শনটি যাহাতে নির্বিবাদে ভোগ করিতে পারেন, পুত্রকন্যার জীবনযাত্রা যাহাতে বিঘ্ন-সঙ্কুল না হয়, এই আশায় বোধ হয়। যাহাদের একদিন নির্যাতন করিয়াছেন, অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় তাহাদের দরজায় দরবার করিবেন সর্বাগ্রে।

পাশের একটা রাস্তা হইতে একটি মিছিল বাহির হইল। শহরের নিকটবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছে সম্ভবত। মিছিলের মাথায় একটি লোক ঘোড়ায় চড়িয়া পতাকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারই পিছনে কয়েকজন লোক নাকাড়া বাজাইতেছে। তাহাদের পিছনে সারিবদ্ধ জনশ্রেণী। ভিড়ের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে শিঙ্গা বাজিয়া উঠিতেছে; মাঝে মাঝে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও নেতাদের জয়ধ্বনি। দলের মধ্যে মুসলমান দেখিলাম অনেক। ইহারাও সানন্দে যোগ দিয়াছে। শুভলক্ষণ নিশ্চয়ই। দেশের মুক্তি আসিয়াছে। মুক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, দেশের জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের। প্রত্যেকের জীবন বন্ধন-মুক্ত হইল; পূর্ণ পরিণতি লাভের পথ পরিষ্কৃত হইল প্রত্যেকের। মুক্তির আনন্দ সকলে সমানভাবে উপভোগ করিবে না কেন? চিরদিনই তো করিয়াছে। বিপদে-আপদে, কাজে-কর্মে, সুখে-দুঃখে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বাধা কখনও একেকে অপরের কাছ হইতে বিযুক্ত করে নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিকদের কুটিল চক্রান্তে দেশের যাহারা আশু ভবিষ্যতে পদ-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লোভে জাতির দেহে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছে, যাহার ফলে

এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিতেছে না, একে অপরকে নির্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে দেশ ও জাতির কত অকল্যাণ করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার নেশায় আজ হয়তো তাহা বুঝা যাইবে না; কিন্তু নেশা কাটিলে যখন বুঝা যাইবে, তখন প্রতিকারের উপায় থাকিবে না। তবু আজ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাদের সত্যকার মনের অবস্থা, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি যাহাই হোক, আজ সব পিছনে সরাইয়া রাখিয়া আনন্দের দিনে আত্মীয়ের মত যোগ দিয়াছে—ইহা আনন্দের কথা বইকি!

মিছিলটি দ্রুত পার হইয়া গেল। দলে দলে আরও অনেক লোক চলিয়াছে। রিক্‌শা করিয়া অনেক মহিলাও যাইতেছেন। ইঁহারা শহরের লোক। জাতীয়-পতাকা-উত্তোলনপব দেখিতে যাইতেছেন। আমিও ধীরে ধীরে ভিড় বাঁচাইয়া অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং বাইকের ঘণ্টির সতর্কধ্বনি ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, আমাদের বিশ্বম্ভর বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পরনে আপাদমস্তক খদ্দর, বুকে স্বরাজ-পতাকা আঁটা। এক হাত হ্যাণ্ডেলে, আর এক হাত সুর-সাধনা-নিরত ওস্তাদের ভঙ্গীতে সম্মুখে প্রসারিত। চোখে মুখে উত্তেজনা, কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান। আমাকে দেখিয়া বাইকে ব্রেক কষিয়া নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চলেছেন নাকি? আসুন পা চালিয়ে। হাতঘড়ি দেখিয়া কহিল, আর বেশি দেরি নেই, আমাকে আবার ওপ্‌নিং সঙ্‌টা গাইতে হবে। চললাম আমি।—বলিয়া বাইকে চড়িয়া ঘণ্টি বাজাইতে বাজাইতে ও 'বন্দে মাতরম্' গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

বিশ্বম্ভর আবার কংগ্রেসী হইল কবে হইতে? এতদিন তো তাহাকে কম্যুনিস্টদের পাণ্ডা বলিয়া জানিতাম। কংগ্রেস বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের নেতারা পুঁজিপতিদের অর্থদাস, ধনিক ও বণিকদের ধ্বংস ও মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা না হইলে দেশ ও জাতির মুক্তি নাই, মস্কো নিখিল-বিশ্বের নর-নারীর তীর্থস্থান, স্তালিন নির্যাতিত মানবের পরিত্রাতা, ইত্যাদি বলিয়া গলাবাজি করিয়াছে। হঠাৎ রাতরাতি কংগ্রেসী বনিয়া গেল! শুধু বিশ্বম্ভর কেন, অনেকেই তো তাই। ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী শতকরা কয়জন? আন্দোলনের হিড়িকে অনেকে হয়তো জেলে গিয়াছে, অনেকে খদ্দর পরিয়াছে, দুই-চারজন মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে কটি-বস্ত্রধারী হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়াছে কয়জন? কংগ্রেসের কাজে নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে কয়জন? আমরা স্বাধীনতা চাহিয়াছি বটে, স্বাধীনতা লাভের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, কতটুকু কষ্ট সহ্য করিয়াছি? চাকুরে চাকুরি করিয়াছে, ব্যবসায়ী বেপরোয়া ব্যবসা চালাইয়াছে, চাষী চাষ করিয়াছে, মজুর মজুরি করিয়াছে, মেয়েরা মন-প্রাণ দিয়া সংসার করিয়াছে। দেশের জন কয়েক নেতা, কয়েক সহস্র কর্মী আন্দোলন চালাইয়াছেন, পুলিসের হাতে মার খাইয়াছেন, বন্দুকের গুলিতে মরিয়াছেন, ফাঁসি গিয়াছেন, আজীবন জেলে পচিয়াছেন, অনশনে প্রাণ দিয়াছেন। আমরা বাহবা দিয়াছি, কখনও ভাবাবেগে অশ্রুপূরিতলোচন হইয়া উঠিয়াছি; কখনও রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছি; বৈঠকখানায় বসিয়া মজলিস করিয়া চা, সিঙাড়া ও সিগারেটের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে গলাবাজি করিয়াছি; সভা-সমিতিতে হুঙ্কার ছাড়িয়াছি; খবরের কাগজে ও মাসিকের পৃষ্ঠায় কড়া

কড়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও গান লিখিয়া ছাপাইয়াছি; আবার নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিজ নিজ কর্মে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছি। দেশসেবকদের অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, অকাতরে জীবনদান আমাদিগকে নিজ নিজ জীবন-পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আমরা কোন দিন বিশ্বাস করিতে পারি নাই—কংগ্রেসের মুক্তি-আন্দোলন এত শীঘ্র সাফল্যমণ্ডিত হইবে। যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে দেশের জন্য না হোক, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৎসরে চার আনা পয়সা খরচ করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রাখিতাম। বাক্যে-ব্যবহারে, পরনে-করণে এতটা ঔদাসীন্য দেখাইতাম না। আজ হঠাৎ কংগ্রেসের হাতে শাসনভার তুলিয়া দিয়া ইংরেজ এ দেশ হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; আমরা হকচকিয়া গিয়াছি। যে যতটা পারি সামলাইয়া কংগ্রেসের দলে ভিড় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। যে দুঃখের অনলে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হয়, সে আগুনের আঁচ পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগে নাই। আমাদের চরিত্রের খাদ যাহা ছিল, তাহা পুরাপুরি আছে। আমরা বাহিরে খাঁটি সাজিয়া সুযোগ-সুবিধায় ভাগ বসাইবার জন্য ছুটাছুটি শুরু করিয়াছি।

কতকটা আসিতেই এক দল মেয়ে বাঁ-হাতি একটা রাস্তা হইতে বড় রাস্তায় আসিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের মেয়ে অধিকাংশ। পরনে মিলের কালোপাড় সাদা শাড়ি, কোমরে আঁচল জড়ানো। নবজীবনের প্রত্যাশায় মুখগুলি আভাময় গান গাহিয়া চলিয়াছে—"জাগে নব ভারতের জনতা, একজাতি একপ্রাণ একতা—"

এক পাশে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলাম। তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে সব। সারা দেহে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে।

আগামী কালে বাংলার যে ছেলেদের সকল বাধা বিপত্তি বিরোধ অবিচার অতিক্রম করিয়া ভারতের মধ্যে অগ্রণী হইতে হইবে, তাহাদের ভাবী জননী ইহারা। যে জাতীয়-পতাকা আজ সাড়ম্বরে তোলা হইতেছে, তাহাকে অনবনমিত রাখার গুরুভার যাহাদের, তাহাদের বুকের রক্ত দিয়া লালন-পালন করিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে চরিত্রগরিমায় দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ করিবার দায়িত্ব ইহাদের। যে আনন্দের দীপ আজ সারা দেশের প্রত্যেকটি মানুষের বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনির্বাণ রাখিবার দায়িত্ব ছেলেদের চেয়ে ইহাদের এক বিন্দু কম নয়, এ সম্বন্ধে তাহারা যেন আজ হইতে সচেতন হইয়া উঠে।

মেয়েরা চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে চলিলাম। কতকটা যাইতেই প্রচণ্ড ঝড়-ঝড়-ঝড়াং ঝড়-ঝড়-ঝড়াং শব্দে শশব্যস্তে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম। একটা পুরাতন, রঙ-চটা ঝড়ঝড়ে মোটর-গাড়ি বেসুরা ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ির আরোহীকে চিনিলাম। জেলার সি. আই. ডি.-র বড়কর্তা। বিপুল দেহ; কোলা-ব্যাঙের মত মোটা থ্যাবড়া নাক; নাকের নীচে কড়া বাটারফ্লাই গোঁফ। মাথার সামনেটায় বিস্তৃত টাক—পালিশ-করা ব্রোঞ্জের পাতের মত চকচকে। পরনে পুলিসের খাকী পোশাক। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বৎসর কয়েক আগে ইঁহার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল আমার। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়। আমার একজন আত্মীয় ও ছাত্র এই জেলার এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করিত। ভদ্রলোক স্থানীয় থানার দারোগা ছিলেন। কোথায় ঘুষ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ছেলেটি বাগড়া দেওয়ায় সুবিধা হয় নাই। আন্দোলন আরম্ভ হইবার মাস কয়েক পরে, একদিন রাত্রে গ্রামের পোস্ট-অফিসের খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। ভদ্রলোক

ছেলেটিকে ধরিয়া গারদে পুরিয়া দিলেন। ছেলেটির বিধবা মা আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ছেলেটি নির্দোষ, ঘটনার দিনে নাকি বাড়িতেই ছিল না। আমি দারোগাবাবুর কাছে গিয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিলাম। কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছেলেটির জেল হইয়া গেল। শুধু ওই ছেলেটিকে নয়, ওই সময়ে আরও পচিশ-ত্রিশজন ছেলেকে ভদ্রলোক বিনা অপরাধে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সরকার বিশেষ পারদর্শিতার জন্য পুরস্কৃত করেন তাঁহাকে। অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হয়। এখন তো অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। ইনিও আজ স্বাধীনতা-দিবস উৎসবে সবেগে যোগ দিতে ছুটিয়াছেন।

চলিতে শুরু করিলাম। কিছুক্ষণ পরে, বাজখাঁই কণ্ঠে—"মহাত্মা গান্ধীকি জ্যায়, জহরলালজীকি জ্যায়, নেতাজীকি জ্যায়' শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম—একটা রিক্‌শা প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। রিক্‌শাওয়ালার দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। ভদ্রলোকের ছেলে, নাম পশুপতি। শহরেই বাড়ি। বেঁটে, মোটা, লোমশ দেহ; মুখে এক মুখ দাঁত; দুই পাশে দুইটা গজদন্ত ঠোঁটের কোণ ঠেলিয়া উঁচাইয়া আছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল, মাথায় বড় বড় চুল। পশুপতি নাম সার্থক উহার। শহরে 'পাগলা পশু' বলিয়া খ্যাত। পাগল ঠিক নয়, ভান করে মাত্র। পুলিসের স্পাই ছিল যুদ্ধের সময়ে। চা ও খাবারের দোকানে বসিয়া যুদ্ধের আলোচনা করিত; হিটলারের জয়গান করিত; ইংরেজের পতন অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণী করিত। নানা চমকপ্রদ খবর বানাইয়া লোককে হকচকাইয়া দিত। ওদিকে গোপনে পুলিসকে শিকারের সন্ধান দিত। যুদ্ধের সময়ে অনেক লোককে ফাঁসাইয়াছে সে। এখন রেশনের দোকান

করে। গরিব লোকদের নামের চিনি কেরোসিন ও কাপড় কালো দামে বিক্রয় করিয়া রোজগার করে মন্দ নয়। সাপ্লাই-বিভাগের কর্তাদের দালালের কাজ করে। তাহা ছাড়া আর একটি কাজ—পুলিসের লোকদের জন্ত বাউরী মেয়ে সংগ্রহ করিয়া দেয়। পশুপতির পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খয়েরী রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি, মাথায় খদ্দরের টুপি, তাহাতে ছোট একটি জাতীয়-পতাকা আলপিন দিয়া আঁটা। রিক্‌শার ভিতরে তাকাইয়া দেখিলাম, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও নেতাজীর ছবি পাশাপাশি বসানো। রিক্‌শার সামনের ডাণ্ডায় বাঁধা একটা বাঁশের কঞ্চির মাথায় জাতীয়-পতাকা উড্ডীয়মান। আমাকে দেখিয়া পশুপতি থমকিয়া দাঁড়াইল; এবড়ো-খেবড়ো দাঁতগুলা বাহির করিয়া, হাসিয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটা চাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মহাত্মা গান্ধীকি জ্যায়, জহরলালজীকি জ্যায়, নেতাজীকি জ্যায়। তারপর লাফাইতে লাফাইতে দ্বিগুণিত বেগে ছুটিতে শুরু করিল।

ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। পাশ দিয়া একটা কালো ঝকঝকে মোটর পার হইয়া গেল। শহরের গুরুপদ ডাক্তার চলিয়াছেন। অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। আর ডাক্তারের বাড়িতে ছুটিতে হইবে না। ওইখানেই পাওয়া যাইবে তাঁহাকে। দিবারাত্র অর্থোপার্জনে ব্যস্ত থাকেন ভদ্রলোক। আজ বোধ হয় বিশ্রাম লইবেন। কাজেই ডাকিয়া আনাও যাইবে। স্বাধীনতা-দিবসে মনের সুর যদি উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকে তো ফীটা রদ করাইবার জন্ত বেশি বাক্‌বিস্তারের প্রয়োজন হইবে না।

পাশের একটা গলি হইতে রিক্‌শারোহণে বাহির হইলেন—রায় সাহেব রাঘবেন্দ্র। বেঁটে মোটা চেহারা; মেটে রঙ; ভারী মুখ;

ফোলা-ফোলা গাল ; ভোঁতা চিবুক, চিবুকের নীচে থলথলে মাংসের থাক। মাথায় বড় বড় চুল, সামনের দিক হইতে পিছনে উলটানো ; পিছনে বব-করা। ছোট ছোট চোখ দুইটি চাতুর্যে চকচক করিতেছে। গালে পান ; ফোলা গাল আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে। পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ও চাদর। হাঁকিয়া কহিলাম, নমস্কার, চলেছেন নাকি ? রিক্‌শাওয়ালাকে থামিতে বলিয়া রায় সাহেব ভুরু নাচাইয়া কহিলেন, যাব না ! বলেন কি ! জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দিন আজ ! কাল রাত্রে জওহরলালের স্পীচ শুনেছেন ? রেডিও নেই, শুনবেন কি ক'রে ? বাংলায় তর্জমা করেছি, 'সেবকে'র বিশেষ সংখ্যায় বেরুবে আজ, পড়বেন। রায় সাহেব স্থানীয় পত্রিকা 'সেবকে'র সম্পাদক। কহিলাম, আপনি তো হিন্দু-মহাসভার পাণ্ডা, আপনাদের—

বাধা দিয়া রায় সাহেব কহিলেন, না না, পাণ্ডা নয়, সাধারণ সভ্য। তা অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে। কিন্তু আমি তো শুধু হিন্দু নয়, ভারতীয়ও তো ; সে হিসাবে কংগ্রেসেরও সভ্য। তা ছাড়া, হিন্দুসভার সভ্য ব'লেই তার অন্যায় নির্দেশ মানতে হবে নাকি ? মুসলমানরা তো স্বাধীনতা-দিবস পালন করতে অস্বীকার করে নি ! যাক ও কথা, যাচ্ছেন তো ওখানেই ? আসুন না, রিক্‌শায় জায়গা হবে।

রিক্‌শাওয়ালার পাতলা ডিগডিগে চেহারা রায় সাহেবের ভার বহনেই জখম হইয়া উঠিয়াছে। আবার ভারবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া সকাতরে তাকাইল। কহিলাম, ধন্যবাদ। থাকৃগে, আপনি চলুন রায় সাহেব। রায় সাহেব হাত নাড়িয়া কহিলেন, আর রায় সাহেব না, ওটা ছেড়েই দিলাম। স্বাধীন ভারতে দাসত্বের তকমা সহ্য হবে না আর। কহিলাম, তাই নাকি ? ভাল।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে।—বলিয়া রায় সাহেব প্রস্থান করিলেন।

আশেপাশে লোক ছুটিতেছে। কেহ রিক্‌শায়, কেহ মোটরে, অধিকাংশই পদব্রজে। সকলের গন্তব্য স্থান একই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠির সামনে বিস্তৃত মাঠে পতাকা-উত্তোলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পতাকা তুলিবেন জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। নিজ নিজ বাড়িতে পতাকা উঠিয়াছে সবারই। তবু ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। কারণ ওই অনুষ্ঠান সর্বসাধারণের। যেন বাড়ির পূজা, আর বারোয়ারী পূজা। যেন বাড়ির তোলা-জলে স্নান, আর সরোবরে সকলে মিলিয়া অবগাহন। একটা আনন্দ পারিবারিক, আর একটি সর্বজনীন। একটা পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে কয়েকটি মনের যোগাযোগ, আর একটি সর্বজন-মনের সঙ্গে সংযোগ। এই সর্বজনীন অনুষ্ঠানের মধ্যে এই কথাটি মনে-প্রাণে বুঝা যাইবে, স্বাধীনতা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের। ইহা রক্ষার দায়িত্বও সর্বসাধারণের। স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য সকলের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাই এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

হনহন করিয়া একটা লোক পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। ঢ্যাঙা, কাহিল, কালো। পরনে হাফ-হাতা খাটো টুইলের পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি, পায়ে তালি-মারা জুতা। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতেছে। ডাক দিলাম, ওহে, অত তাড়াতাড়ি কেন? দাঁড়াও না। লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, আর দেরি নয়, যাবেন তো পা চালিয়ে আসুন।

লোকটির নাম পাঁচুগোপাল। মনিহারী দোকান ছিল। যুদ্ধের বাজারে উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে, যাহাদের দোকান কোন

কালে ছিল না তাহাদের নূতন করিয়া পত্তন হইল, আর পাঁচুর পুরাতন দোকান উঠিয়া গেল, তাহার হেতু হিটলার। হিটলারই পাঁচুর স্কন্ধে ভর করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিটলার যে কত ক্ষতি করিয়াছে, পাঁচুই তাহার প্রমাণ। অথচ পাঁচুর মত হিটলারের হিতৈষী কয়জন ছিল ?

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে পাচু পাঁচখানি বাংলা-ইংরেজী খবরের কাগজ কিনিয়া দোকানে বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিত। যুদ্ধের খবরগুলি মাথা খাটাইয়া এমন ভাষ্য করিত যে, শঙ্করভাষ্যও হার মানিয়া যায়। দোকানে খরিদ্দার আসিলে বিরক্ত হইত, বলিত, কি তেল-সাবান স্নো-ক্রীম কিনে বেড়াচ্ছেন! দুনিয়াতে কি হচ্ছে একবারটি ভেবে দেখুনগে না বাড়িতে ব'সে। শেষে বলিয়া দিত, মশায়, আরও দোকান আছে, সেখানে যান না, আমাকে বিরক্ত করেন কেন? যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানেরা যখন ঝড়ের মত দুর্নিবার বেগে আগাইয়া চলিয়াছিল, তাহাদের নির্মম আঘাতে শহরের পর শহর উন্মূলিত তরুর মত ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল, পাঁচুর তখন তুরীয় অবস্থা। স্নানাহার ভুলিয়া সারা শহর চষিয়া বেড়াইত, পরিচিত কাহাকেও দেখিলেই পাকড়াও করিয়া যুদ্ধের খবর শুনাইত, হিটলারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করিত। বলিত, আরে, কল্কি অবতার মশায়! যত পাপের আবর্জনা পাহাড়ের মত জমেছে, সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে সত্যযুগ এনে দিয়ে তবে যাবে। এত বড় মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মেছে কি কখনও? এত বড় বীর? এত বড় ধার্মিক? যেমন নির্মল চরিত্র, তেমনই নির্লোভ। এত বড় দেশের মালিক, একটা পয়সা ব্যাঙ্কে নেই।

মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত দেখে না। তা ছাড়া সদাচারী। মাছ মাংস স্পর্শ করে না, শুনেছি, স্নান ক'রে গীতার এক অধ্যায় পাঠ না ক'রে চা খায় না। নামেই খ্রীষ্টান, আচারে আচরণে গোঁড়া হিন্দুকেও হার মানিয়ে দেয়। ইংরেজরা যখন 'বিসমার্ক' ডুবাইয়া দিল, পাঁচু সাত দিন শয্যাশায়ী ছিল। যুদ্ধের শেষ দিকটাতে জার্মানদের যখন ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হইল, পাঁচু একেবারে দমিয়া গেল। মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত কথা বলিত না, দোকান খুলিত না, ঝ'ড়ো কাকের মত মূর্তি করিয়া এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। শেষে দোকান যখন উঠিয়া গেল, বাড়িতে বসিয়া নিঃশব্দে দাদার ধমক-অপমান, স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিত ।

পাঁচুর সঙ্গ লইতেই সে জোর-কদমে ছুটিতে শুরু করিল। কহিলাম, এত ছুটছ কেন? পাঁচু মুখ ফিরাইয়া কহিল, ছুটব না! বলেন কি! কি ব্যাপারটা হচ্ছে বলুন দেখি? আগাগোড়া যদি না দেখলাম তো করলাম কি এত দিন ধ'রে? মহামানবের মহাদান সারা দেশের লোক মাথা পেতে নিচ্ছে, সেই দৃশ্য—

বাধা দিয়া কহিলাম, মহামানবটি কে? অ্যাটলি, ক্রিপ্‌স, মাউণ্টব্যাটেন, ইংলণ্ডেশ্বর—

পাঁচু থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইল। পাঁচুর মাথার সামনে দিকটায় ঢালাও টাক। মুখটায় ঘোড়ার মুখের আদল সুস্পষ্ট; মুখে গোঁফদাড়ি স্বল্প; ছোট ছোট চোখ, সেই চোখ দুইটার দৃষ্টি দুইটা সঙ্গিনের মত খোঁচাইতে লাগিল। পাঁচু মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সক্ষোভে বলিতে লাগিল, সোজা জিনিসটা সোজাভাবে দেখতে জানেন না আপনারা, এইটাই হয়েছে আসল গলদ। এত বড় লোকক্ষয়ী যুদ্ধটা বৃথা হয় নি। এর পিছনে ছিল একজন মহামানবের মহৎ

উদ্দেশ্য। সেই মহামানব মহাপ্রাণ হিটলার; মহৎ উদ্দেশ্য—জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। তবে প্রত্যেক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথেই মহতী বাধা; কাজেই, কাজের শেষ দেখে যেতে পারলেন না, অকালে আত্মগোপন করতে হ'ল। কহিলাম, খবরের কাগজে তো লিখেছে, হিটলারের মৃত্যু হয়েছে। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মৃত্যু হয় নি। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তিনি, এত সহজে তাঁর মৃত্যু হয় না। উত্তরমেরুতে বরফ-গুহায় তপস্যা করছেন; শক্তি সঞ্চয় করছেন। এবার দৈহিক শক্তি নয়, আত্মিক শক্তি। ইংরেজরা জানে। তাই মানে মানে সাম্রাজ্যের জাল গুটোতে শুরু করেছে—

আমাদের স্বাধীনতা তা হ'লে—

হ্যাঁ, হিটলারের জন্যে। এই কথাটি মনে প্রাণে বোঝা দরকার সবারই। স্বাধীনতার পতাকা যখন উঠবে, এই কথাটি ভাববেন যে, আর কারও জন্যে নয়—একমাত্র সেই মহাপুরুষের জন্যে স্বাধীনতা পেয়েছেন আপনারা।

আবার ছুটিতে শুরু করিল। আমিও চলিতে লাগিলাম। কতকটা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি করা হচ্ছে? দোকান? ডান হাতটা চিত করিয়া দিয়া সে কহিল, সে গয়া। ওঃ, যতদিন ছিল, বাড়িতে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে দিয়েছিল মশায়! একে মনের সেই দারুণ অবস্থা, তার ওপরে দিনরাত খেচাখেচি। এখন আর মুখে কথাটি নেই কারও। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দাদাকে বলেছি একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিতে, দরজীর দোকান করব।

কহিলাম, কাটছাঁট শিখেছ নাকি?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, ও একরকম শেখাই। স্বাধীন ভারতে

তো আর ফ্যাশান-ট্যাশান থাকবে না। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ফতুয়া, বালিশের অড় সেলাই করতে জানলেই হবে।

হঠাৎ কানের কাছে মুখটা আনিয়া কহিল, তা ছাড়া একটা গাঁথবার চেষ্টায় আছি। কংগ্রেস গভর্মেণ্ট তো! যারা কংগ্রেসের কাজ করেছে, তাদের আর বেকারবৃত্তি করতে হবে না।

কহিলাম, তুমি কংগ্রেসের কাজও করেছিলে নাকি?

ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, করি নি! বলেন কি! পিকেটিং করেছিলাম গাঁজার দোকানে।

জেলে তো যাও নি?

সখেদে কহিল, না নিয়ে গেলে যাব কি ক'রে? ধ'রে নিয়ে গিয়ে যদি ছেড়ে দেয়, সে কি আমার দোষ? আমি তো চেষ্টার কসুর করি নি। মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনি না জানলেও শহরসুদ্ধু সবাই জানে, আমি একজন কংগ্রেস-কর্মী। আর আপনিই বা জানবেন না কেন? সেদিনের কথা। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে পাড়ার সব ভোট যোগাড় ক'রে দিলাম কংগ্রেসকে। মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না কাউকে, আমার হয়ে যাবে।

মাঠের সামনে পৌঁছিলাম। লোকে লোকারণ্য, তিল ফেলিবার জায়গা নাই। দূরে আদালতের বাড়িগুলি দেখা যাইতেছে। মাথায় মাথায় জাতীয়-পতাকা উড্ডীয়মান। ১৯৩০-৩১ সালের আন্দোলনের কথা মনে পড়িল। স্কুল ও কলেজের ছেলেরা আদালত-গৃহের মাথায় জাতীয়-পতাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিস-সাহেব ছিলেন খাঁটি সাহেব। দেশী কুত্তা-বাচ্চাদের দুঃসহ স্পর্ধা দেখিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে পুলিস—আমাদের দেশের লোক, সমস্ত ছেলেকে রুলের বাড়ি মারিয়া আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়া

দিল। মারের চোটে একটি ছেলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু আমাদের এখানেই নয়, সারা দেশের জেলায় জেলায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক বিদেশীর দল কোথায় গেল? তাহারা চোখ মেলিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে কি? আর আমাদের দেশের পুলিস, যাহারা আজ ভিজা বিড়াল সাজিয়া মুখে স্বদেশী বুলি কপচাইতেছে, তাহাদের এসব কথা মনে পড়িতেছে কি?

পাঁচুগোপালের পাছু পাছু ভিড় ঠেলিয়া চলিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে, দেশের নেতৃবৃন্দের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। নানা রাস্তা দিয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে জনস্রোত বিশাল জনসমুদ্রে আসিয়া মিশিতেছে।

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া অনুষ্ঠান-স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শহরের ও জেলার কংগ্রেসের মাতব্বরেরা সকলে সমুপস্থিত। সকলেই খদ্দরধারী। মুখে গাম্ভীর্য। কংগ্রেসের তরুণ কর্মীরা প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্খলাবিধানে ব্যস্ত। অত্যন্ত উদ্ধত উন্নাসিক ভাব। এই অনুষ্ঠান যে একমাত্র তাহাদেরই নিজস্ব ব্যাপার, বাকি সকলে রবাহূত দর্শকমাত্র, ভাবে ভঙ্গীতে ইহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ডাক্তার ও উকিল, জমিদার ও কন্‌ট্র্যাক্‌টর, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সভ্যবৃন্দ আসিয়াছেন। অনেক সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত হইয়াছেন। দুই-চারজনের পরিধানে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। পুলিস-কর্মচারী আসিয়াছেন কয়েকজন; পরিধানে পুলিসের পোশাক, কিন্তু হাবে ভাবে পরমবৈষ্ণবসুলভ বিনয়-বিগলিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখে উল্লাসোচ্ছল কোলাহল-মুখর জনারণ্য। পুরোভাগে এক দিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা, আর এক দিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা ও শহরের প্রগতিসম্পন্না মহিলাবৃন্দ। মাঝখানে মাস্টার, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার, কেরানী ইত্যাদি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভিড়। পশ্চাতে শহরের ও শহরের আশেপাশে পল্লীগ্রামের হাজার হাজার লোকের বিরাট সমাবেশ। ইহার মধ্যে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জমি-জায়গার আয়ভোগী সাধারণ ভদ্রলোক, জোতদার, মহাজন, ছোটখাটো ব্যবসাদার, শিল্প-জীবী, কৃষক ও মজুর। ইহাদের স্বার্থ বিভিন্ন, অনেক ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী। তবু আজ একটি বৃহৎ আনন্দ-তরঙ্গে হাজার হাজার মানুষের হাজার ধরনে বাঁধা হাজার রকমের মনের তারে একই সুর বাজিয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ হরিসাধনবাবুর কথাটা মনে পড়িল, স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, কিন্তু কাহাদের স্বাধীনতা? ওই নবলব্ধ প্রভাবে স্ফীতগণ্ড কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীদের, স্বার্থ-সর্বস্ব অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের, অভাবকণ্টকিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের, দারিদ্র্য-জর্জর জনগণের? স্বাধীন জীবনের সুখ-সুবিধার যে স্বপ্ন প্রত্যেকের চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ওই হৃদয়হীন বিবেক-বিচারশূন্য ব্যবসায়ীর—যে অর্থের লোভে দেশবাসীর খাদ্যে বিষ মিশাইতে দ্বিধা করে না, দেশবাসীর খাদ্য ও পরিধেয় লইয়া জুয়া খেলে, ওই জবরদস্ত জমিদারের—যে প্রজাপীড়ন করিয়া নিজের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করে, ওই কুসীদজীবী মহাজনের—যে নিরক্ষর সরলবুদ্ধি কৃষকদের ঠকাইয়া তাহাদের জীবন-যাত্রার স্বল্প সম্বলকে নিজের সিন্দুকে ঢোকায়, ওই অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের—দুর্গম জীবন-যাত্রাপথে যাহারা দিশাহারা, ওই দীন দরিদ্র কৃষক ও মজুরদের—যাহারা বংশানুক্রমে পশুর মত জীবন যাপন করিয়া

মনে ও প্রকৃতিতে পশুর মত হইয়া উঠিয়াছে, ওই সব স্বপ্নের প্রকৃতি তো এক হইতে পারে না। একসঙ্গে সকল স্বপ্নের সাফল্য অসম্ভব। কাহাদের স্বপ্ন সফল হইবে ?

হঠাৎ জনসমুদ্র গর্জন করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জেলা-কংগ্রেস-কমিটীর সভাপতি মহাশয় পতাকার দড়ি ধরিয়া টানিতেছেন, পতাকা সরসর করিয়া উপরে উঠিতেছে। জনসমুদ্র পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল, বন্দে মাতরম্, মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়, জহরলালজীকি জয়—

কে একজন হাঁকিয়া উঠিল, নেতাজীকি জয়। এখানে ওখানে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠিল।

পতাকা উপরে উঠিয়া পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল।

সকলে পতাকাকে অভিবাদন করিলাম। বক্তৃতা হইল না। সভাপতি মহাশয় ফতোয়া দিলেন, বিকালবেলায় এই মাঠে সভা হইবে ; এই মাঠে কংগ্রেসের মাতব্বরেরা বক্তৃতা করিবেন ; সকলে যথাসময়ে যেন উপস্থিত হন। কংগ্রেসকর্মীরা হাঁকিয়া হাঁকিয়া সভাপতি মহাশয়ের আদেশ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জানাইয়া দিল।

ইহার পর মুক্তি-সংগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন-পর্ব। এক পাশে কতকটা জায়গার উপরে শহাদ-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে সভাপতি মহাশয় সেই স্থানের দিকে চলিলেন। অনেকে অনুসরণ করিল। বাকি জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

আমি ডাক্তারবাবুর খোঁজে শ্যেনদৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিলাম। এখানে আসিয়াছেন নিশ্চয়। হঠাৎ চোখে পড়িল, দূরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। ভদ্রলোককেও

চিনিলাম। মিউনিসিপ্যালিটির একজন ধুরন্ধর পাণ্ডা। ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়া হাজির হইলাম। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, জয় হিন্দ, কি খবর? নমস্কার করিয়া কহিলাম, জয় হিন্দ। ডাক্তারবাবু কহিলেন, স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, এর পর?

কহিলাম, এর পরের সমস্তাই তো আসল সমস্তা ডাক্তারবাবু। আসন্ন ঝড়ের মুখে মাঝ-দরিয়ায় হাল ছেড়ে দিয়ে মাঝি তো স'রে পড়ল। হাল আর বৈঠা ধরবার ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা এ কাজে অনভ্যস্ত, অনভিজ্ঞ। ঢেউ কাটিয়ে, ধাক্কা সামলে কূলে পৌছানো যাবে, না, মাঝ-দরিয়ায় তলিয়ে যেতে হবে—এইটাই তো ভাববার কথা।

ভদ্রলোকটি মুচকি হাসিয়া মুরুব্বিয়ানার স্বরে কহিলেন, কিছু চিন্তা নেই। স্বায়ত্তশাসন তো কতকগুলো প্রতিষ্ঠানে আমরা আগেই পেয়েছি, তা কৃতিত্বের সঙ্গে চালিয়েও যাচ্ছি। সারা দেশের স্বায়ত্ত-শাসনেও কোন অসুবিধা হবে না। উপযুক্ত লোকের তো দেশে অভাব নেই।—বলিয়া ভাবে ভঙ্গীতে নিজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ডাক্তারবাবু কহিলেন, কাজের ভার না পেলে তো যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে যাঁরা ভার নিয়েছেন, তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি, হৃদয়ে শক্তি, চরিত্রের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশবাসীর প্রতি দরদ, স্বার্থত্যাগের তো প্রমাণের অভাব নেই। গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তা এঁরা বহন করতে পারবেন না, এ সম্বন্ধে আগে থেকে সন্দিহান হওয়া উচিত নয় কারও। হাতঘড়ি দেখিয়া কহিলেন, এখনই অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে, জরুরী কেস—

কহিলাম, আমার একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে—

কি বলুন দেখি, বাড়িতে অসুখ নাকি?

বিস্ময়ের আভাস ফুটিল মুখে ও কথার সুরে। ওঁর মত বড়

ডাক্তারকে সচরাচর ডাকি না আমরা। হোমিওপ্যাথ ডাকিয়া কাজ চালাই। অবশ্য নেহাৎ বাড়াবাড়ি হইলে ওঁদের ডাকিতেই হয়। কহিলাম, না, আমার বাড়িতে নয়। আমাদের পাড়ার একজন ভদ্রলোককে একবার দেখতে হবে।

কে বলুন দেখি ?

নাম বলিতেই ডাক্তারবাবু কহিলেন, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক তো কোথায় মাস্টারি করতেন, গোলমালে প'ড়ে চাকরি গেছে। আমাকে একবার ডেকেছিলেন বটে, অনেকদিন আগে। ওষুধের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছিলাম। তারপর আর খবর দেন নি।

কহিলাম, ওষুধ তো নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন নি। আজকাল দাম জানেন তো। অভাবী মানুষ—

এক টুকরা বাঁকা হাসি হাসিয়া শ্লেষের সুরে কহিলে, ওষুধ না কিনতে পারেন তো ডাক্তার দেখিয়ে লাভ কি ? ডাক্তারের মুখ দেখলেই তো রোগ সারবে না।

ভদ্রলোক সায় দিয়া কহিলেন, সত্যিই তো। মিছিমিছি ওঁদের সময় নষ্ট। তা ছাড়া রোগী টেঁসে গেলে দুর্নাম।

কহিলাম, ভদ্রলোকের অসুখটা খুবই বেড়ে উঠেছে। তবে ওঁর বিশ্বাস, আপনি একবার দেখলেই হয়তো সেরে উঠবেন। ডাক্তারবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাই নাকি! আমি দেখলেই সেরে উঠবেন ? আমার ওষুধ খেতে হবে না ? কহিলাম, ওষুধ খাবেন বইকি, নিশ্চয় খাবেন। তবে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের চেহারা দেখলেও রোগী আদ্ধেক সেরে যায়।

ভদ্রলোক আমার কথায় সায় দিয়া কহিলেন, তা সত্যি। ডাক্তার-বাবুর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলাম, আজ কি একটি বার

যেতে পারবেন ? ডাক্তারবাবু কহিলেন, এখন তো অসম্ভব। শুনলেনই তো, অনেক দূর যাচ্ছি। সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারব ব'লে মনে হয় না।

কহিলাম, সন্ধ্যের পরে কি খবর নেব ?

বেশ, নেবেন। আচ্ছা, আমি চলি।

মিউনিসিপ্যালিটির ভদ্রলোককে কহিলেন, যাবেন নাকি ? চলুন, নামিয়ে দোব আপনার বাড়ির সামনে।

কাছেই তাঁহার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। দুইজনে গিয়ে গাড়িতে উঠিলেন।

শহরের ভিতর দিয়া চলিলাম। অত্যন্ত ভিড়। প্রত্যেক দোকানের মাথায় স্বরাজ-পতাকা উড্ডীয়মান। চা-খাবারের দোকানগুলা সরগরম। খরিদ্দার অধিকাংশ মফস্বলের। সকাল হইতে এতখানি মেহনত করিয়া ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে সকলে। দোকানীদের নূতন-করিয়া-ভাজা বাসি মাল আকণ্ঠ গিলিতেছে। স্বাধীনতা-দিবস-পর্ব সারিয়া থলি হাতে বাজারের দিকে ছুটিয়াছে অনেকে। আজিকার মত দিনে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তরি-তরকারি যাহাই হউক, মাছ একটু নিশ্চয়ই দরকার। দাম যাহাই হউক। মাংস তো পাওয়া যাইবে না। পাঁঠাদের আজকার দিনটির মত বাঁচিয়া থাকিবার সনদ মিলিয়াছে—দিল্লীর দরবার হইতে।

পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। দিনেশবাবুর বাড়ি যাইতে হইবে। দিনেশবাবু আমার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। তাঁহার পুত্রবধূ এখানের মেয়ে-স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস। সেই সূত্রে এখানে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র জীবিত নাই।

বিপ্লবী ছিল সে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল তাহার। কারাবাসেই মৃত্যু হইয়াছে। সে খবর দিনেশবাবুকে দেওয়া হয় নাই। তিনি এখনও জানেন, পুত্র তাঁহার বাঁচিয়া আছে; একদিন বাড়ি ফিরিবে। নিদারুণ রোগের আক্রমণে চোখের দৃষ্টি হারাইয়াছেন অনেকদিন, পুত্রবধূর বৈধব্য-দশা চোখে দেখিতে পান না। ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে, এই খবরে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। কবে তাঁহার ছেলে বাড়ি ফিরিবে—এই আশায় দিন গনিতেছেন।

মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে গিয়া বসি। ছেলের গল্প ছাড়া আর কোন কথা বলেন না। মাতৃহীন শিশুকে মানুষ করিয়াছিলেন তিনি। ছেলের মত ছেলে, যেমন বুদ্ধি, তেমনই গায়ে শক্তি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সকলের সেরা ফল করিত, গায়ের জোরে সব ছেলেদের মাথার উপরে থাকিত। এম. এ.-তে রেকর্ড মার্ক পাইয়াছিল অর্থনীতিতে। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, ছেলে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেয়। দিলে পাস করিতই সে। ছেলে রাজী হইল না। পূর্ববঙ্গের কোন এক বে-সরকারী কলেজে চাকুরি লইয়া চলিয়া গেল। সেইখানে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসিল। বৈপ্লবিক কর্মে যোগ দিল। চরিত্র ও কর্মশক্তি-মহিমায় দেখিতে দেখিতে দলের নেতা হইয়া উঠিল। দিনেশবাবুর এক বন্ধু পুলিসে চাকরি করিতেন। তাঁহার কাছে খবর পাইয়া তিনি ছেলেকে নিজের গুরুতর অসুখের খবর দিয়া বাড়ি আনাইলেন। সুন্দরী শিক্ষিতা একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কলিকাতার এক কলেজে চাকরি যোগাড় করিয়া দিলেন। ছেলে কলিকাতায় বসিয়া বিপ্লবের কাজ চালাইতে লাগিল। পুলিসের তাহা অগোচর রহিল না। হঠাৎ একটা ব্যাপারে ধরা পড়িল সে। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল তাহার। দিনেশবাবু এই আঘাত

সহ্য করিতে পারিলেন না। নিদারুণ রোগে পড়িলেন; চোখের দৃষ্টি গেল; চাকরি গেল। গ্রাসাচ্ছাদন চালাইবার জন্য তাঁহার পুত্রবধূ চাকরিতে ঢুকিতে বাধ্য হইলেন।

মাঝে মাঝে ছেলেকে চিঠি লেখেন তিনি। নিজে লিখিতে পারেন না; পুত্রবধূকে দিয়া লেখান, কবে আসবি? চোখে দেখতে পাব না কোনদিন; একবার তোকে ছুঁয়ে মরতে চাই, বাবা।

চিঠি জমা থাকে বউমার একটি বাক্সে। বাক্স ভর্তি হইয়া গেছে চিঠিতে। চিঠির জবাব আসে মাস খানেক পরে; জবাব লেখেন বউমা, পড়িয়া শুনান—আর দেরি নাই, বাবা। ভারতের বুকে জোঁকের মত ব'সে যারা রক্ত চুষে ফুলে উঠেছে, খ'সে পড়বে তারা শগগির। পরাধীনতার বেড়ি প'রে কারাবাসে ঢুকেছিলাম, শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে মাথা উঁচু ক'রে বেরুব।

বাবার দুই চোখ হইতে জল পড়ে, বর্ষার অপরাহ্নের মত আর্দ্র ম্লান হাসি হাসেন।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে এক ফালি রোয়াক। ভিতরে ঢুকিতেই অপরিসর উঠান, সামনে বারান্দা। বারান্দায় একটি ডেক-চেয়ারে বসিয়া ছিলেন দিনেশবাবু। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। জীর্ণশীর্ণ দেহ। রঙ ধবধবে ফরসা। আবক্ষলম্বিত দাড়ি কাশফুলের মত সাদা। মাথায় এলোমেলো দুধের মত সাদা চুল। পরিধানে খদ্দরের খাটো ধুতি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। ডান হাতটি কোলের উপরে ন্যস্ত। অনবরত কাঁপিতেছে হাতটি। বাম পাশে একটি ছোট টেবিলের উপরে একটি আনকোরা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি, একটি খদ্দরের জাতীয়-পতাকা।

আমার পায়ের শব্দে সচকিত প্রশ্ন করিলেন, কে? আমি

আগাইয়া গিয়া কহিলাম, আমি। বৃদ্ধের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল; নিস্তেজ কণ্ঠে কহিলেন, ওঃ, তুমি! এস, ব'স। পাশে একটা টুলে বসিলাম। বৃদ্ধ কাহলেন, সকালের গাড়িতে এল না তা হ'লে। দুপুরে একটা গাড়ি আছে, না? সেটাতে তা হ'লে আসবে নিশ্চয়।

প্রশ্ন করিলাম, কে?

কেন? আমাদের শিবু। ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়। আজই তো আসবার দিন। স্বাধীনতার প্রথম দিন আজ। বাড়িতে বাড়িতে উৎসব। তারাও আজ নিজের নিজের বাড়িতে এসে উৎসব করবে। স্বরাজ-পতাকা, খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি আনিয়ে রেখেছি। সে এসে স্নান ক'রে শুদ্ধ-শান্ত হয়ে, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বন্দে মাতরম্ গান গাইতে গাইতে পতাকা তুলবে। তারই জন্যে তো অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি ভোরবেলা থেকে। বন্দে মাতরম্ গান তার শুনেছ তো? সমস্ত প্রাণ দিয়ে গায়। শুনলে মনে হয়, মা যেন মূর্তি ধ'রে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাও তখনকার দিনে ভয়ে ভয়ে গাওয়া, পুলিস শুনতে পেলেই চোখ রাঙিয়ে তেড়ে মারতে আসত। আজ স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে মুক্তির হাওয়ায় বুক ভ'রে নিয়ে গাইবে মায়ের গান, প্রাণ ভ'রে শুনব। কতদিন শুনি নি!—বৃদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, দুপুরের গাড়িতে আসবে নিশ্চয়ই, কি বল? বউমাকে রান্না করতে বলেছি। কি কি খেতে ভালবাসত সবই তো জানে। হ্যাঁ হে, কইমাছ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না? বড় প্রিয় ছিল তার। কহিলাম, শিবুদাদা ছাড়া পান নি সম্ভবত। দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন? ছাড়া পাবে না কেন? সবাই পেয়েছে—

সব রাজবন্দী তো এখনও ছাড়া পান নি।

সে কি! দেশের মুক্তি হয়েছে, দেশের জন্যে যারা জীবন ক্ষয় করেছে, তাদের মুক্তি হয় নি?

হবে, পরে। জাতীয় সরকার কর্মভার হাতে নিয়ে সকলকে মুক্তি দেবেন।

সক্ষোভে কহিলেন, তবে এ উৎসবের অর্থ? এ যে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো! যারা মাতৃপূজার ঘট স্থাপন করলে, বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের বেদীকে মার্জনা করলে, জীবনের সব সুখ-সম্ভাবনাকে উৎসর্গ ক'রে দিলে মায়ের উদ্দেশে, তারা রইল অন্ধকার কারাবাসে বন্ধ হয়ে, আর বাইরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জাঁকজমক ক'রে মায়ের পূজো হতে লাগল!

কহিলাম, আমাদের নেতারা তাঁদের স্মরণ করেছেন বক্তৃতায়—

তীব্রকণ্ঠে দিনেশবাবু কহিলেন, তবে তো সব দুঃখ ঘুচে গেল আমাদের! দয়া ক'রে তাদের কথা স্মরণ করেছেন! এ দয়াটা নাই বা করতেন।—উত্তেজনায় মুখ লাল হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সামলাইয়া কহিলেন, পশ্চিম-বঙ্গের কথা জানি না, পূর্ববঙ্গে কত ঘরে কত বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, কত আশা নিয়ে পথের পানে তাকিয়ে ছিল আজ; কতদিন পরে তাদের ছেলে, ভাই, স্বামী বাড়ি ফিরবে; তারা আজ মুখ শুকনো ক'রে ঘরের কোণে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগল, উৎসবে যোগ দিলে না।

কহিলাম, পূর্ববঙ্গের কেউ তো যোগ দিলে না। তারা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে।

তাও তো বটে। স্বাধীনতা পেলাম আমরা, কিন্তু কি হবে এ

স্বাধীনতা নিয়ে, যা সবাই মিলে ভোগ করতে পারলাম না, যা সবার মনে মুক্তির আনন্দ আনলে না?

চুপ করিয়া রহিলাম। দিনেশবাবু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা হ'লে আসবে না এখন? খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ও পতাকা বাম হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি আর হবে এসবে, রেখে দিকগে তুলে। পতাকা তুলতে হবে না আমাদের। গভীর হতাশার সহিত কহিলেন, হয়তো আসবেই না, ছাড়বেই না হয়তো তাদের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে, প্রত্যাঘাত করে, তাদের শাসক মাত্রেই ভয় করে,—শাসক দেশীই হোক, আর বিদেশী হোক। শাসকই বদলেছে দেশের, শাসন-পদ্ধতি তো বদলায় নি। যখন বদলাবে, তখন হয়তো মুক্তি পাবে। তখন আমি থাকব না।

কহিলাম, তা কি হয়! ছেড়ে দেবে সবাইকে, আজ না হোক, দুদিন পরে।

সোৎসাহে কহিলেন, দেওয়াই তো উচিত। সসম্মানে তাদের এনে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত। দেশের জন্যে যারা এত দুঃখ ভোগ করলে, জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করলে, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশের সরকারের উচিত, সব কাজের আগে তাদের সব ক্ষয় সব ক্ষতি পূরণ করা; তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রতিভা, কর্মশক্তি, যা এত দিন বৃথা নষ্ট হ'ল তাকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োগ করা।

কহিলাম, সবই হবে।

সক্ষোভে কহিলেন, হবে তো, কবে? নিজের নিজের ব্যবস্থাই করবে তোমাদের নেতারা। এদের কথা কারও মনে থাকবে ব'লে মনে হয় না। যারা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, সভা-সমিতি ক'রে তাদের

শুকনো শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে, কিন্তু তাদের অসহায় বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা হবে কি? কিছু হবে না। তেলা মাথাতেই তেল ঢালা হবে, যেমন বরাবর হয়েছে; রুখু মাথায় খড়ি উঠতে থাকবে চিরদিন।

চুপ করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, চোখে দেখতে পাই নে; নড়তে-চড়তে পারি নে; মরণের প্রতীক্ষা করছি প্রতি মুহূর্তে; তবু ভগবানের কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করছি, মরবার আগে যেন সে ফিরে আসে; যেন দেখে যেতে পাই, সে সংসারী হয়েছে, সন্তানের পিতা হয়েছে। এ কি অসম্ভব প্রার্থনা? ভগবান পূর্ণ করবেন না কিছুতেই? আমার মরণের সঙ্গে সঙ্গে বংশের ধারা শেষ হয়ে যাবে, অভাগী মেয়েটা একেবারে অনাথা হয়ে যাবে? ভেবে রাতে চোখ বুজতে পর্যন্ত সাহস হয় না আমার।

বউদিদি এক কাপ চা আনিলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। ছিপছিপে গঠন। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। পরিধানে শুভ্র বিধবার বেশ। মুখের গঠন সুন্দর। চোখ দুইটিতে ক্লান্ত বিষণ্ণতা। নাক ও চিবুকের গঠন মনের দৃঢ়তার পরিচায়ক। মুখের ভাবে আজীবন কৃচ্ছ্রব্রতী তপস্বিনীর শান্ত বৈরাগ্য। মাথায় অল্প অবগুণ্ঠন। শুভ্র সীমন্তরেখার দুই পাশের চুলে দুই-এক গাছি পাকা চুল রূপার তারের মত চিকমিক করিতেছে। কহিলেন, বাবা, আপনি চা খাবেন?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, না মা, থাক্। আশা করেছিলাম, এখনই আসবে, একসঙ্গে ব'সে খাব। এল না; আসবেও না। আমার নাম করিয়া কহিলেন, বলছে, ছাড়া পায় নি ওরা। ধুতি পাঞ্জাবি পতাকা রেখে দাওগে তুলে। আজ স্বাধীনতা-দিবস নয় আমাদের।

ও যেদিন বাড়ি আসবে, সেই দিন থেকেই আমাদের স্বাধীন জীবন শুরু হবে, সেই দিনই উৎসব হবে আমাদের।

কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম। দরজার কাছে বউদিদি দাঁড়াইয়া ছিলেন ; জলভরা মেঘের মত থমথমে মুখ। আমাকে দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, ঠাকুরপো, আর কতদিন ওঁকে ভুলিয়ে রাখব ? আর তো পারছি না।—বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িতেই দেখিলাম, আনন্দ-প্রবাহ আগের মতই বহিয়া চলিয়াছে। মনে হইল, যেন একটি হিম-শীতল অন্ধকার গুহা হইতে বাহির হইয়া সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে, আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরে এত আলো, এত উল্লাস, এত উদ্দীপনা—ইহার একটি কণাও সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আজিকার দিনেও সেই গুহাবাসীরা দুর্ভাগ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দূরে সরিয়া রহিল। কেহ তাহাদের ডাকিয়া বাহিরে আনিল না। শুধু এই শহরেই নয়, সারা বাংলা দেশে, সারা ভারতে, এমনই কত শত নর-নারী আজিকার আনন্দ-উৎসবে যোগ দিল না ; তাহাদের কথা দেশের জনসাধারণের বা তাহাদের নেতৃবৃন্দের, কাহারও মনে পড়িল না।

সামনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছি আর একজন এমনই গুহাচারিণীর সংবাদ লইবার জন্য। আমার এক বন্ধুর বোন বীণা। বন্ধু বড়লোকের ছেলে, নিজে বড় ব্যবসায়ী। শহরে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাবা বাঁচিয়া নাই, সে-ই এখন বাড়ির কর্তা। বীণা তাহার ছোট বোন। বীণার স্বামীও ব্যবসা করিত ; কলিকাতায় ফার্নিচারের দোকান ছিল। বাড়ি ও দোকান দুইই ছিল পার্ক স্ট্রীটে। নির্ভেজাল মুসলমান-পল্লী।

বাড়িটি ছিল দোতলা। নীচের তলায় দোকান, উপর-তলায় বীণারা বাস করিত—বীণা, বীণার স্বামী আর বীণার মেয়ে। একটি মাত্র মেয়ে বীণার, আর সন্তান হয় নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনরো। এই পল্লীতে অনেকদিন বাস করিতেছিল, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ছিল। কলিকাতায় হাঙ্গামা শুরু হইবার পরও প্রতিবেশীরা বরাবর তাহাদের সাহস দিয়াছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তের দল যখন আক্রমণ করিল, প্রতিবেশীরা সাহায্য করা দূরে থাক্, অনেকে আক্রমণকারীদের দলে যোগ দিল। দোকান লুঠ হইল, বীণার স্বামী দোকানেই খুন হইল। দুর্বৃত্তের দল দোতলায় উঠিয়া বীণাদের সর্বস্ব লুঠ করিল, বীণার পনরো বছরের মেয়েকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল; বীণাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। স্বামী-সন্তানহীনা বীণা জনৈক সহৃদয় প্রতিবেশীর সাহায্যে এখানে চলিয়া আসিল। তারপর হইতে সে তাহার দাদার বাড়িতেই বাস করিতেছে।

বীণাকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়াছি। হাসি গানে গল্পে, আনন্দে, প্রাণের প্রাচুর্যে উৎসের মত উচ্ছ্বাসময়ী। বিবাহের আমিই ঘটকালি করিয়াছিলাম। বরের নাম করিয়া ঠাট্টা করিলে কৃত্রিম রাগে মুখ লাল করিত, কথা বন্ধ করিত, আবার যাচিয়া কথা বলিত। বিবাহের পরে তাহার কলিকাতার বাসায় গিয়াছি। তখন সে স্বামীর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী। কলস্বনা স্রোতস্বিনী তখন বৃহৎ নদীর মত বিপুল বিস্তারে ও গাম্ভীর্যে গৌরবময়ী। কত আপ্যায়ন, কত সেবা, কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা! মেয়েটিও তেমনই, দেখিতে যেমন সুশ্রী, তেমনই মিষ্ট স্বভাব। নিজের মামার মত শ্রদ্ধা করিত আমাকে। বীণার সাজানো সুখের সংসার একদিনে ছারখার হইয়া হইয়া [illegible]জরাণী পথের ভিখারী হইল।

বীণার কাছে মাঝে মাঝে যাই। মস্ত বড় বাড়ির একান্তে একটি ছোট ঘরে থাকে সে। সারাদিন চুপচাপ বসিয়া থাকে। এখন আর কাঁদে না; অশ্রুপাথার মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। যাই, কাছে বসি। একই কথা, কোথায় কেমন করিয়া আছে মেয়ে। শুষ্ক শীর্ণ কণ্ঠে কহে, মরতে পারছি না শুধু তারই জন্যে। যদি জানতে পারি, সে ম'রে গেছে, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

আজ স্বাধীনতা-দিবস। বন্ধু আমার কংগ্রেস-পন্থী। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। বাড়িতে উৎসব চলিয়াছে নিশ্চয়। সকলের মুখে হাসি, মনে আনন্দ। আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দময় সংস্রব হইতে দূরে নিজের অন্ধকার ঘরটিতে একলা বসিয়া চারিপাশে শোকের হোমানল জ্বালিয়া দুশ্চর তপস্যাব্রতী সন্ন্যাসিনীর মত বীণা তিলে তিলে নিজেকে দগ্ধ করিতেছে। কেহ তাহার কাছে যাইতেছে না, পাছে তাহার শোকের কালিমা আজিকার নির্মল আনন্দটিকে মলিন করিয়া তুলে।

বীণাদের বাড়িতে গেলাম। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। বাড়ির মাথায় প্রমাণ সাইজের রেশমী স্বরাজ-পতাকা উড়িতেছে। বাড়ির সামনে বাগানে ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল ভাল পোশাক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সারা বাড়িটাতে একটি আনন্দময় চাঞ্চল্য। বাড়িতে ঢুকিতেই বন্ধুর মায়ের সহিত দেখা হইল। সস্নেহ-আপ্যায়ন করিলেন, কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার অন্যান্য মেয়েরা আসিল, সকলের মুখে চোখে হাসি ঝলমল করিতেছে। উৎসবের ঢেউ লাগিয়াছে সকলের মনে। রান্নাঘর হইতে রান্নার সুগন্ধ নাকে আসিতেছে। ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে নিশ্চয়। মা কহিলেন, অমর বলছিল তোমার কথা। যেতে পারলে না। ভারি ব্যস্ত তো আজ ওরা। এসেছ, ভালই করেছ। একেবারে নাওয়া-

খাওয়া সেরে যাবে। মেয়েরা আবদারের স্বরে মাকে সমর্থন করিল। হাঁ বা না—কিছুই না বলিয়া প্রশ্ন করিলাম, বীণা কোথায়? মায়ের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। কহিলেন, আছে ওর ঘরে। ঘর থেকে তো বেরোয় না; দিনরাত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আর ভাবে। কি যে করব ওকে নিয়ে? যাবে নাকি ওর কাছে? যাও, পার তো বুঝিও। আজকের দিনটাতেও যদি একবার বাইরে এসে সকলের সঙ্গে বসে, দাঁড়ায়! হাসি ফুর্তি ওর ফুরিয়ে গেছে জানি, তবু অদৃষ্টকে তো মেনে নিতে হবে। রোগেও কত মেয়ের স্বামী সন্তান একসঙ্গে ম'রে যায়। তা সামলেও তো তারা বাঁচে, সাধারণ মানুষের মত খায়-দায়, গল্প করে, ও যে কিছুতেই পারছে না তা! সকলের মুখের দিকে তাকিয়েও তো ওর সামলানো উচিত।

মায়ের কথায় বিরক্তির রেশ। শোককে আমরা বেশি দিন সহ্য করিতে পারি না। নিরবচ্ছিন্ন শোক সুমধুর সুর-সঙ্গতির মধ্যে বেয়াড়া বেসুরের মত মনের গায়ে কাঁটা ফুটাইতে থাকে। পারিপার্শ্বিক প্রশান্তিকে ঘুলাইয়া তুলে। মন বিরক্ত হয়, বিরূপ হয়।

একতলার এক প্রান্তে একটা ঘরে থাকে বীণা। বীণার ছোট বোন আমাকে বীণার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিলাম। অন্ধকার ঘর। এক পাশে মেঝের উপর বীণা বসিয়া আছে। ডাকিলাম, বীণা! মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল কিছুক্ষণ, যে মন ওর অন্যত্র ব্যাপৃত ছিল, তাহাকে যেন বহু চেষ্টায় দৃষ্টির সঙ্গে যোগ করিল, তারপর উদাসকণ্ঠে কহিল, দাদা! আসুন।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বসুন।

এক পাশে একটা মাদুর পাতা ছিল। এক দিকে বীণার স্বল্প

শয্যা গুটানো। মাদুরে বসিয়া কহিলাম, তুমি ব’স। বীণা নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এক বৎসরের মধ্যে বীণা কত বদলাইয়াছে! শীর্ণ মলিন দেহ, পারিপাট্যহীন অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ। মাথার চুলগুলা এলোমেলো, রুক্ষ। চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, চোখের কোলে কালি। মুখে নৈরাশ্যময় সুগভীর ঔদাস্য। শোক যেন মূর্তিমতী হইয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে। এই দিগন্তগ্রাসী গাঢ় শোকান্ধকারে সান্ত্বনার ক্ষীণ দীপ জ্বালিয়া কি হইবে? চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল, খুকীকে আর পাওয়া যাবে না! আমার চোখের সামনে তিনি গেছেন। তাঁকেও আর পাওয়া যাবে না জেনেও মনকে বোঝাতে পারি। ভোলবার চেষ্টা করতে পারি; হয়তো ভুলতেও পারি একদিন। মেয়েটাকে যে কিছুতেই ভুলতে পারি না দাদা! কিছুতে ভুলতে পারি না, ফুলের মত মেয়ে আমার হিংস্র জানোয়ারদের হাতে গিয়ে পড়েছে। দিনরাত কত অত্যাচার, কত যন্ত্রণার সহ্য করছে! আমি মা হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে কি ক’রে বেঁচে থাকি? সবাই বলে, ভুলে যা, মনে কর্ ম’রে গেছে ব’লে। তা কি সম্ভব? যদি সত্যি ম’রে গেছে খবর পাই, তা হ’লেও নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তাও তো পাচ্ছি না। চুপ করিয়া রহিলাম। বীণা বলিতে লাগিল, তোমাদের স্বাধীনতা এসেছে, দেশের রাজশক্তি তোমাদের নেতাদের হাতে এসেছে; তোমাদের নেতারা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য উঠে-প’ড়ে লেগেছেন; যারা পশুর দলকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করেছে, তারাও নাকি রাতারাতি সাধুপুরুষ হয়ে উঠে অহিংস-মন্ত্র জপ করতে শুরু করেছে; তোমাদের নেতারা তাদের সব দোষ ক্ষমা ক’রে কোল

দিয়েছেন ; তাদের সঙ্গে মিলে ভাঙা-চোরা তালি দিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে হতভাগিনীরা পশুদের গহ্বরের মধ্যে প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের কথা তো কেউ ঘুণাক্ষরে বলছেন না— কি তোমাদের নেতারা, কি দেশের আর কেউ! একবার মুসলমানদের বলছেন না, তাদের ফিরিয়ে দাও, তাদের ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের সঙ্গে মিত্রতা আমাদের হবে না।

কহিলাম, নেতারা তো অন্যায় করেন নি বীণা। দেশে তো শান্তি স্থাপন করতে হবে! না হ'লে স্বাধীনতা পাওয়া তো কোন দিন সার্থক হবে না। বীণা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কে বলছে দাদা, শান্তি চাই না? কে বলছে তোমাদের স্বাধীনতা ব্যর্থ হোক? তবু, সেই সব হতভাগিনীদের ফিরিয়ে আনতে হবে না? আমার মত যারা স্বামী-সন্তান—সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুকের আগুন এমনই জ্বলতে থাকবে?

কহিলাম, রথ যখন চলে, তার চাকার তলায় পথের ধূলো গুঁড়ো হবেই। ধূলোকে বাঁচিয়ে চলা তো সারথির চলে না, বীণা। আমাদের জাতীয় জীবনের রথ চলেছে স্বাধীনতার পথে, দেশের মানুষকে অনেক রকমের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। সব দেশেই হয়েছে। এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে হবে যে, আমাদের বুকের ওপর দিয়েই চ'লে গিয়ে রথ স্বাধীনতায় পৌঁছেছে।

পথের ধূলোর তাতে সান্ত্বনা কোথায় দাদা? স্বাধীনতায় পৌঁছে কে আর পথের কথা ভাবে, বল? পথের ধূলোর কথা ছেড়ে দাও।— কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বীণা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আজ সারা দেশে কত আনন্দ! বাড়িতে বাড়িতে উৎসব! আমাকে তো ছোটবেলা থেকে জানেন। স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতাম

একদিন; ছেলেদের মত কষ্ট সহ্য করার সুযোগ পাচ্ছি না ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। আজ স্বাধীনতা পাওয়ার দিনে সকলের সঙ্গে যোগ দিতে পারছি না, সবাই বিরক্ত হচ্ছে।—এ কি সাধ ক'রে? পারছি না কিছুতে যোগ দিতে। এগুতে গেলেই মনে হচ্ছে, সারা দেশের লোক তাদের কথা ভুলেছে ব'লে আমরাও তাদের ভুলব? যে আনন্দের বন্যায় তাদের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে নিয়ে যাচ্ছে, আমরাও কি ক'রে তাতে সাঁতার দিই? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ যেখানে তারা আছে, সেখানেও সবাই হয়তো আনন্দে মেতে উঠেছে। কালীপূজোর রাত্রে বলির পশুদের মত উন্মত্ত জনতা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তারা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে। বলির পশুরাও ওদের চেয়ে ভাল। তাদের মৃত্যু আসবে এক মুহূর্তে। আর ওদের মৃত্যু চলবে দিনের পর দিন, তিল তিল ক'রে। এই দীর্ঘায়িত মৃত্যু, মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কথা আজ আনন্দের দিনে একটি বারও কি কেউ ভাবছে, দাদা? বড় বড় আদর্শের, বড় বড় ভাবের, বড় বড় কথার দেওয়াল গেঁথে তাদের কান্নার শব্দকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তোমাদের নেতারা। কিন্তু মা-বাবা ভাই-বোনদের কাছ থেকে তা কি আড়াল ক'রে রাখা যায়? সে কান্না যে তাদের প্রাণের মধ্যে এসে তীরের মত বিঁধছে সারাক্ষণ।

বাড়ি ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। একটা চিঠি আসিয়াছে দেখিলাম। বন্ধুর চিঠি। পূর্ববঙ্গে এক গ্রামে বাড়ি। ডাক্তারী পাস করিয়া আজ বিশ বৎসর ধরিয়া গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। মুসলমানপ্রধান গ্রাম। চারিপাশের গ্রামগুলিতেও মুসলমানরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বন্ধুর বাবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তেজারতি

কারবার ছিল তাঁর। বন্ধুও ডাক্তার হিসাবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, গত বৎসর নোয়াখালিতে মুসলমানেরা যখন হিন্দুমেধযজ্ঞ শুরু করিয়াছিল, ওই গ্রামের মুসলমানরাও—নোয়াখালির মত অতটা ফালাও করিয়া না হউক—ছোটখাটো রকমের শুরু করে। ফলে, গ্রামের কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার হৃতসর্বস্ব হইয়া পথের ভিখারী হয়, কয়েকটি হিন্দু রমণী তাহাদের স্বামী-পুত্রের চক্ষের সামনে ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিতা হয়, এবং সেই হতভাগিনীদের চক্ষের সামনে তাহাদের স্বামী-পুত্রেরা নৃশংসভাবে নিহত হয়। সেই সময়ে মুসলমানদের দলপতির দয়ায় বন্ধু নিষ্কৃতি লাভ করে। এখন বিরোধের অগ্নিশিখা নিবিয়াছে বটে, আগুন নিবে নাই, আপাত-নিবৃত্তির ভস্মাচ্ছাদনের তলে তেমনই গনগন করিতেছে। ফলে যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিতে সাহস করে নাই। যাহারা কোনমতে গ্রামে টিকিয়া ছিল, অবিরত অপমান অবিচার ও অত্যাচারের অঙ্কুশাঘাতে তাহাদের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অতি দীর্ঘ চিঠি। নানা নির্যাতন-কাহিনীতে ভরা। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বহু পুরুষের পিতৃভূমি আজ শত্রুভূমিতে পরিণত। যাহারা একদা আপন ছিল, তাহারা পর হইতেও পর। শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ ও সহানুভূতির সুদৃঢ় বন্ধন ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পুরুষ ও মেয়েদের অবস্থা যুদ্ধে বন্দী ও বন্দিনীর চেয়েও শোচনীয়। মাথা উঁচু করিয়া সহজ মানুষের মত চলা-ফিরা করিবার উপায় নাই। পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপমান। সামাজিক জীবনের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত তাহারা। নারীত্বের চরম লাঞ্ছনার সম্ভাবনা সর্বদাই শাণিত খড়্গের মত উদ্যত হইয়া

আছে মেয়েদের চক্ষের সম্মুখে। নিজেদের পুরুষদের উপর নির্ভরতা হারাইয়াছে মেয়েরা। এক দিকে মৃত্যুর অতলস্পর্শ গহ্বর, আর এক দিকে জীবনব্যাপী যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড; মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা নিদারুণ ভয়ে পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হিন্দু গ্রামবাসীরা, যাহাদের সামর্থ্য আছে, ভিটেমাটির মায়া কাটাইয়া পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যাহাদের সামর্থ্য নাই, মুখ বুজিয়া সমস্ত অপমান সহ্য করিতেছে। মুসলমানেরা মাঠের ধান কাটিয়া লইয়া যাইতেছে, গোয়ালের গরু খুলিয়া লইয়া যাইতেছে, ঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে, এমন কি কন্যা-বধূদের বাড়ি হইতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নিষ্ফল ক্রোধে, নিরুপায় ক্ষোভে চাহিয়া দেখিতেছে তাহারা। মনে সাহস নাই, দেহে শক্তি নাই, হাতে হাতিয়ার নাই, নিজেদের মধ্যে একতা নাই, সর্বোপরি আত্মসম্মান ও আত্মীয়দের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য প্রাণ দিবার মত নির্বিচার নির্ভয়তা নাই। কোনমতে টিকিয়া থাকা, বাঁচিয়া থাকাই ইহাদের উদ্দেশ্য। যদি ধর্ম পরিবর্তন করিলে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারা যায়, ইহারা হয়তো একদিন তাহাই করিতে দ্বিধা করিবে না। ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু বলিয়া আর কেহ থাকিবে না।

শেষে লিখিয়াছে ভাই, তোমাদের বড় আনন্দের দিন। তোমাদের দিগন্তে স্বাধীনতার স্বর্ণাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা কি পাইলাম? স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা কি কোনদিন কাহারও পশ্চাতে ছিলাম? কাহারও চেয়ে কম দুঃখ, কম ক্লেশ ভোগ করিয়াছি আমরা? দেশ-মাতৃকার মুক্তিকল্পে আমাদের ছেলেমেয়েরা দুঃসাহসিক কর্ম-প্রচেষ্টায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে, নির্বিচার জীবনদানে, কোনদিন কি দ্বিধা করিয়াছে? দেশের মুক্তি-যজ্ঞে স্বামী-পুত্র-কন্যাকে

বলি দিয়া যে মেয়েরা মর্মান্তিক বেদনাকে আজীবন নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কি পূর্ববঙ্গে কম? বঙ্গভঙ্গ-বিপ্লব, অসহযোগ-আন্দোলন, লবণ-সত্যাগ্রহ, আগস্ট-বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্যে দুলিতে দুলিতে আমরাও তোমাদের মতই আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। বিদেশী শাসকেরা আমাদের মুক্তি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার জন্য বিরোধ ও বিদ্বেষের বিষে আমাদের দেশবাসীর এক বিরাট অংশের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেও আমরাও আশা করিয়াছিলাম, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি দেশপূজ্য নেতাদের চরিত্র, আচরণ, স্বার্থত্যাগ, আত্মবলি ও জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর প্রতি প্রেম, বিষঘ্ন ওষধির মত বিষ-ক্রিয়া নিঃশেষে নাশ করিবে; চল্লিশ কোটি ভারতবাসী একজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, একপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, একযোগে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিবে, ভারতকে আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের নেতৃবৃন্দের অশেষ চেষ্টা, ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তবু তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা ভারতের মূল দেহে আশ্রয় পাইলে; আমরা বিচ্ছিন্ন অংশে বিরোধীদের মধ্যে পড়িয়া রহিলাম। যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে প্রাণপণে বাধা দিয়া আসিয়াছি এতদিন, সেই বিচ্ছেদকে স্বীকার করিতে হইবে আমাদের। না স্বীকার করিলে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও লাঞ্ছনার সম্ভাবনা উদ্যত হইয়া থাকিবে। কাজেই স্বাধীনতা-দিবসে তোমরা যখন স্বাধীন ভারতের পতাকাকে অভিবাদন করিবে, সেই সময়, আমরা ইহাদের কড়া পাহারায় পাকিস্তানের পতাকাকে অভিবাদন করিব।

তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইব বলিয়া মনে হয় না। এ দেশে যদি ধন

প্রাণ ও মান বজায় রাখিয়া বাস করিতে হয় তো নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি হয়তো ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইবে।

ভাই, তোমাদের আনন্দের দিনে আমাদের কথা ভুলিয়া থাকিও না। মনে রাখিও, প্রায় দুই কোটি হিন্দু মর্ম-যাতনায় আর্তনাদ করিতেছে। তোমাদের দিগন্তব্যাপী আনন্দধ্বনির মধ্যে একবার কান পাতিয়া তাহাদের আর্তনাদ শুনিবার চেষ্টা করিও।

সর্বশেষে লিখিয়াছে—ভাই, এমন করিয়া এখানে বাস করা সম্ভব হইবে না। গ্রাম ছাড়িতেই হইবে। পূর্বপুরুষের ভিটা জন্মের মত ছাড়িয়া যাওয়ার কষ্ট ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না। পূর্বপুরুষদের ধর্ম কর্ম, সামাজিক শুভ অনুষ্ঠান, জন্ম ও মৃত্যুর স্মৃতি ইহার প্রত্যেকটি ইট কাঠ মৃত্তিকাকণার সহিত জড়াইয়া আছে। বাসগৃহের পাশেই দেবমন্দিরে বাস্তুদেবতা কত পুরুষ ধরিয়া পূজা পাইতেছেন। বাগানের এক প্রান্তে সারি সারি পিতা-পিতামহের স্মৃতি-মন্দিরে কতদিন ধরিয়া সংসারের সকলে মিলিয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আসিয়াছি। এখান হইতে চলিয়া গেলে দেবতার পূজা বন্ধ হইবে, স্মৃতি-মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিবে না। বিধর্মীরা দেবতাকে কলুষিত করিবে, মন্দির ও মঠ ভাঙিয়া মাঠ করিয়া দিবে। মা এখন হইতে কান্নাকাটি শুরু করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এখন তোমাকে অনুরোধ, তোমাদের ওখানে যেমন করিয়া হউক আমাদের জন্য একটু মাথা গুঁজিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। বহুদিনের বন্ধুত্বের দাবিতে এই অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, নিরাশ করিবে না।

দুপুরে হরিসাধনবাবুর ছেলে-মেয়ে দুইটি খাইতে আসিয়াছিল। মেয়েটি কহিল, কাকাবাবু, মা জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? কহিলাম, দেখা হয়েছে; একটা ডাকে বেরিয়ে গেলেন; সন্ধ্যের সময়ে ফিরবেন। আমি ধ'রে নিয়ে আসব এখন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা এখন আছেন কেমন? মেয়েটি মুখ চুন করিয়া কহিল, তেমনই। খাবার সময়ে বড় ছেলেকে দেখিলাম না। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিলেন, পাড়ার ছেলেদের ফিষ্টি হচ্ছে; নেমন্তন্ন করেছে ওকে। কহিলাম, সে আবার কি? বাড়িতে এত খাবার আয়োজন করেছ; বাড়িতে না খেয়ে সেখানে গেল কেন? দলে প'ড়ে যা-তা খেয়ে অসুখ ধরিয়ে বসবে। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, বললাম তো তাই। শুনলে কই! বললাম এত ক'রে, কত বেলা হবে, দু মুঠো খেয়ে পিত্তি রক্ষা ক'রে যা; তা কে কার কথা শোনে! মুচকি হাসিয়া কহিলেন, কেমন লোকের ছেলে! গম্ভীর মুখে কহিলাম, লোকটার আবার কি দোষ হ'ল?

না, দোষ আর কি! কোথাও নেমন্তন্নর কথা শুনলে বেসামাল হয়ে ছুটতে থাকে এই যা। কথাটা চাপা দিয়া কহিলাম, এর জন্যে আবার চাঁদা লাগবে তো?

তার কথা তো কিছু বলে নি। তা ছাড়া চাঁদা তো আদায় করেছে; আবার কিসের?

আহারের পরে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গৃহিণীর ডাকে ঘুম ভাঙিল। চোখ মেলিতেই গৃহিণী কহিলেন, একবার ওঠ দেখি। মুচী-বউ কি বলছে।

কে মুচী-বউ?

গৃহিণী ধমকের সুরে কহিলে, জান না নাকি? আমাদের ঘুঁটে দেয় যে, ওই যে খোঁড়া মুচীর বউ।

মনে মনে বিরক্ত হইলাম। কে কোথাকার মুচীর বউয়ের জন্ম কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়া দিল! বিরক্তি চাপিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলাম, কি ব্যাপার?

গৃহিণী ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, জানি নে কি ব্যাপার। জিজ্ঞেস করগে ওকে। বিরক্তির সহিত কহিলেন, বারণ করলাম বার বার, যাস নে; মিথ্যে যত ছোট ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া—

চোখের ঘুম ছাড়িয়া গেল। বাহিরে আসিলাম। মুচী-বউ উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল।

আমার বাড়ির পিছনে, কতকটা গেলেই ধানের ক্ষেত—রেল-লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই একাংশে কতকটা উঁচু জমির উপর কয়েক ঘর মুচী বাস করে। সকলেই জাত-ব্যবসা করে; আজকালকার দিনে রোজগার করে মন্দ নয়। শুধু মহেন্দ্র মুচীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। লোকটা বেতো রোগী। বৎসরে ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকে। বাকি ছয় মাস উঠিয়া দাঁড়ায়; লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। কাজকর্ম কিছুই করিতে পারে না। সংসার চালায় মুচীর বউ। বেঁটে কাহিল মেয়েটি। অত্যন্ত পরিশ্রমী। সারাদিন রাস্তায় মাঠে গোবর কুড়াইয়া আনে; ঘুঁটে তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। আজকাল বিড়ি বাঁধিতে শিখিয়াছে। তাহাতেও কিছু রোজগার হয়। তাহা ছাড়া চামড়া কষ করার কাজ জানে। তাহা করিয়াও কিছু আয় হয়। কয়েকটি পাঁঠা-পাঁঠী আছে। পাঁঠাগুলি বড় করিয়া বিক্রয় করে; পাঁঠীর দুধ বিক্রয় করে। মোট কথা, পাঁচ রকম করিয়া কোন মতে নিজের ও স্বামীর গ্রাসাচ্ছাদন চালায়।

কহিলাম, কি হয়েছে তোমার?

মুচী-বউ ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, পাড়ার বাবু-ছেলেরা আমার একটি কচি পাঁঠা খেয়ে দিয়েছেন এজ্ঞে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি! দাম দেয় নি তোমাকে?

ঘাড় নাড়িয়া মুচী-বউ 'না' জানাইল।

কহিলাম, তোমাকে বলে নি?

মুচী-বউ কহিল, বললে দিতাম নাই এজ্ঞে। কচি পাঁঠা আবার কেউ দেয়!

কহিলাম, ছেলেদের কাছে গিয়েছিলে?

উয়াকে পাঠিয়েছিলাম। গেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনেক কষ্টে। তো বাবু-ছেলেরা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন করিলাম, ওরা যে খেয়েছে তার প্রমাণ কি?

আর কে খাবেক এজ্ঞে? ওনাদেরই আজ ভোজ হইছে—

তোমরা পাঁঠার খোঁজ করেছ? কারও মাঠে হয়তো পড়েছে, খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে।

বাবুদের ঘর গেছলম। ওনাদেরই জমি সব। ওনারা বললেক, পাঁঠা-টাঠা ছাড়ে দেয় নাই ওনারা।

বাবু, অর্থাৎ অভয়বাবু। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এ পাড়ার প্রাচীন বাসিন্দা। শহরের এই অংশটা যখন শহরের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই, তখন এদিকটার জমিদার ছিলেন ওঁরা। এ পাড়ার অধিকাংশ বাড়ি ওঁদের জমিতেই নির্মিত।

তলাস করেছি এজ্ঞে, সারা পাড়ায়, উদিকে লাইন তক। কোথাও পাই নাই। ওনারাই কেটে খেয়েছেন, বাবু। এর একটা বিহিত করেন আপুনি।

কহিলাম, আমি কি করব? তোমাদের বাবুর কাছে যাও।

ওনার কাছে যেয়ে কি হবেক, বাবু, ওনার ছোট খোঁকাই তো পাণ্ডা। আপুনি একবার ডেকে ব'লে গ্যান। আমার অনেক ক্ষেতি হইছে। বড় হ'লে অনেক টাকা দাম হ'ত। তা বাবু-ছেলেরা যখন খেয়েইছেন তো কি বলব! আমার ন্যায্যি দাম দিয়ে গ্যান ওনারা।

ছেলেদের কাছে গিয়ে বল না বুঝিয়ে।

আমার কথা কি কানে লিবেন ওনারা? উয়াকেই তো হাঁকিয়ে দিয়েছে। আবার গেলে হয়তো মারধোর করবেক। যা খোঁকাবাবুর মেজাজ!

আমার কথাই কি তোমাদের খোকাবাবু শুনবে? তার চেয়ে তুমি অভয়বাবুর কাছে যাও। উনিই ব্যবস্থা করবেন। মুচী-বউ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উনি কিছুই করবেক নাই, বাবু। উল্টে গাল-মন্দ করবেক। এমনই তো ক বছর খাজনা বাকি আছে ব'লে কেবলই শাসাচ্ছে, উঠিয়ে দিব। খোঁকাবাবু পাঁঠা কেটে খেয়েছেন শুনলে বলবেক—বেশ করেছে খেয়েছে; টাকার সুদ উসুল হয়ে গেল। মিনতি করিয়া কহিল, আপুনিই একবার ওনাদের কাউকে ডাকিয়ে ব'লে গ্যান। খোঁকাবাবুকে নাই বা হ'ল, আর কাউকে। কহিলাম, যাচ্ছা যাও, আমি ডাকাচ্ছি এখনই। মুচী-বউ চলিয়া গেল।

বড় ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোদের আজ কি কি খাওয়া হ'ল রে?

সে কহিল, লুচি, পাঁঠার মাংস, আলুর দম—

মাংস পাওয়া গেল কোথায়? আজ তো বাজারে মাংসের দোকান বন্ধ।

তা তো জানি নে। খেলাম তো মাংস।

প্রশ্ন করিলাম, তোদের পাণ্ডা কে? ঘনশ্যাম?

সে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

ঘনশ্যাম অভয়বাবুর ছোট ছেলে। লম্বা, চওড়া, বলিষ্ঠ চেহারা। উদ্ধত প্রকৃতি। লেখাপড়া বিশেষ করে নাই। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়া-আসা করিয়াছিল কিছুদিন। যে কয়েকদিন স্কুলে ছিল, স্কুলের মাস্টাররা তাহার উপদ্রবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে পাড়ায় রেশনের দোকান চালায়। পাড়ার কাহাকেও বিশেষ খাতির করে বলিয়া মনে হয় না। গত বৎসর কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখাইয়া রীতিমত কংগ্রেসী হইয়া উঠিয়াছে।

খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অপরেশও তো তোদের দলের একজন কর্তা, নয়? তাকেই একবা'র ডেকে নিয়ে আয়।

অপরেশ আসিয়া হাজির হইল। কলেজের ছাত্র। পরনে পাৎলুন ও হাফ-হাতা শার্ট। ব্যাপারটা শুনিতেই যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, আমরা তো এসব ব্যাপার কিছু জানি নে, সার্! ঘনশ্যামের হাতেই সব টাকা, ও-ই সব ব্যবস্থা করছে। কোত্থেকে পাঁঠা নিয়ে এল ওবেলা। জিজ্ঞাসা করতে বললে, ওদের নিজেদের পাঁঠা।

কহিলাম, তা তো নয়। নেহাৎ গরিব লোকের জিনিস। ওদের দাম দিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

অপরেশ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ঘনশ্যাম কি মিথ্যে কথা বলেছে?

সত্যি-মিথ্যে তো আমিও জানি না। তবে মেয়েটি আমার কাছে এসে ব'লে গেল ওই কথা। সে-ও তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে বলতে সাহস করবে ব'লে মনে হয় না।

অপরেশ কহিল, ঘনশ্যামও ওরকম ছেলে নয়, সার্। ওকে তো

অনেক দিন থেকে জানি। অত্যন্ত চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি যাচ্ছি এখনই; ঘনশ্যামের কাছে সব জেনে আপনাকে খবর দেব।

অপরেশ আর আসিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মুচী-বউ আসিল। চোখে মুখে কান্নার চিহ্ন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপুনি কি খোঁকাবাবুকে ডাকিয়েছিলেন?

কহিলাম, তোমাদের খোকাবাবুকে তো নয়, আর একটি ছেলেকে।

মুচী-বউ কহিল, খোঁকাবাবু এসে লাফাতে লাগল। উয়াকে মারলেক। আমাকে গালাগালি করলেক। আকালের বছর পাঁচটি টাকা দিয়েছিলেন। দিতে লেরেছি। বললেক, টাকা না দিলে পাঁঠাগুলোকে সব কেড়ে নিয়ে যাব, চাল কেটে বাস তুলে দিব। হাতে পায়ে ধ'রে ওনাকে ঠাণ্ডা করতে হ'ল। ওনাকে আর কিছু বলবেন নাই দয়া ক'রে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, তুমি বলেছিলে ব'লেই তো বলতে গেলাম, না হ'লে আমার কি?

এজ্ঞে, তা তো বটেই। তবে জমিদারের ছেলে তো। কচি একটা পাঁঠা খেয়েছেন তো কি করা যাবেক বলুন? ওনাদের খেয়েই তো বেঁচে আছি আমরা।

বেশ, আমি আর কিছু বলব না।

আপনাকে কষ্ট দিলম মিছামিছি। ক্ষেতি আমার হইছে বইকি; কি করব বলুন? চুপ ক'রে সওয়া ছাড়া গতি কি আমাদের?

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কহিলেন, ক্ষতি কি ক'রে হ'ল? পাঁচটি টাকা তো নিয়েছিলে; তা শোধ দিতে হবে তো?

তা নিয়েছিলম বইকি, গিন্নীমা। মিছে কথা বলব কেনে? তবে উ ভাল থাকলে ওনাদের বাড়ির সব্বাইকার পুরোনো জুতো সেরে-সুরে দেয়। একটি পয়সাও কখনও দেয় না ওনারা। ওনাদের বাড়ির কামিন না থাকলে কামিনের কাজও ক'রে দিয়েছি কতবার। একটা কড়িও কখনও নিই নাই। একটু থামিয়া কহিল, কি করব গিন্নীমা, একলা মেয়েমানুষ, কি ক'রে যে পেট চালাই তা ভগবান জানেন। উ যদি ভাল থাকত, তা হ'লে কি আর ভাবতাম মা?

মুচী-বউ চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গৃহিণী কহিলেন, স্বাধীনতা-দিবসের ফুর্তিটা ভালই হ'ল ছেলেদের। গরিবের সম্বল জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে নিজেদের পেট-পূজো হ'ল। স্বাধীন ভারতেও ওই চলবে নাকি?

কহিলাম, যা এতদিন ধ'রে চ'লে এসেছে, তা কি একদিনে বন্ধ হবে? যতদিন না দেশের সব মানুষ সব দিক দিয়ে সমান হয়ে উঠবে, ততদিন মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার বন্ধ হবে না।

তা কি আর হবে কোনদিন?

হবে আশা ক'রেই তো সবাই আনন্দ করছে আজ। আমাদের মহাত্মা তো সেই কথাই বলেছেন বার বার। তাঁর মত দীন-দরিদ্র-দুর্বলের শুভানুধ্যায়ী আর কে আছে, বল?

সত্যি। বেঁচে থাকুন তিনি। তিনি বেঁচে থাকলে লোকের আশা হয়তো একদিন মিটবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কতকগুলো লোক রাজার হালে আছে, আর বাকি লোকগুলোর হাড়ির হাল হচ্ছে, আর সহ্য করা যায় না, বাপু। হাসিয়া কহিলাম, সবাই সমান হ'লেই কি সহ্য করতে পারবে? মুচী-বউ তোমার হেঁসেল-ঘরে এসে দাঁড়াবে, এক

পংক্তিতে ব’সে নেমন্তন্ন খাবে ; ভজুয়া মেথর এসে তোমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে—

মুখ চুন হইয়া গেল গৃহিণীর। দম লইয়া কহিলেন, তা সহ্য করতে হবে বইকি। যখন যা রীত হবে, মানতে হবে—শুধু তো আমাকেই নয়, সব্বাইকে।

হরিসাধনবাবুর মেয়েটি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কেমন ? মেয়েটি ম্লান মুখে কহিল, বাবা ভারি ছটফট করছেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা কি করছেন ?

মেয়েটি কহিল, মা বাবার বুকে মালিশ করছেন।

গৃহিণী রান্নাঘরের দিকে গেলেন। মেয়েটি তাহার পাছু পাছু গেল। আর একটু পরে মেয়েটি চলিয়া গেল। হাতে একটি বাটিতে কি লইয়া গেল। গৃহিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নিয়ে গেল বাটিতে ?

গৃহিণী কহিলেন, দুধ। ওর মা চেয়ে পাঠিয়েছে ওর বাবার জন্যে।

বিকাল পাঁচটায় বাহির হইলাম। শহরে বিরাট জনসভার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস-নেতারা বক্তৃতা করিবেন। সভা সারিয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ি যাইতে হইবে।

সভাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। বিস্তৃত মাঠের এক পাশে সভামঞ্চের উপরে কংগ্রেস-নেতারা ও বিশিষ্ট কর্মীরা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপবিষ্ট। বক্তৃতা শুরু হইয়া গিয়াছে।

বক্তৃতা করিতেছেন নকুড়বাবু। বহুদিনের পুরাতন কংগ্রেসকর্মী, জেলার অন্যতম কংগ্রেস-নেতা। লম্বা কাহিল দেহ, পরিধানে মহাত্মা

গান্ধীর মত কটিবাস, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। খঞ্জন পাখির মত নাচিয়া নাচিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। স্বাধীনতা-লাভের জন্য কংগ্রেস-কর্মীরা, তিনি নিজেও, কি কি কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহারই দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতেছেন। অবশেষে কহিলেন, ইংরেজরা সহজে স্বাধীনতা দিয়া সরিয়া পড়ে নাই। সাম্রাজ্য রক্ষা করা আর সম্ভব নহে বলিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। এখন এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই সমস্যা। ঘরে বাহিরে শত্রু। ঘর ও বাহির—দুই-ই সামলাইতে হইবে। সমগ্র দেশবাসী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম সুখ ও সুবিধার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলে চলিবে না। অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে এখনও। স্থির ও ধীর ভাবে মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত পথে চলিলে সব বিপদ কাটিয়া যাইবে একদিন।

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হইল। আর একজন দাঁড়াইলেন। বেঁটে মোটা, মেটে গায়ের রঙ, বয়স পঞ্চাশের উপর, মাথায় কাঁচা-পাকা ছোট ছোট চুল; মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে খদ্দরের খাটো কাপড়, খদ্দরের ফতুয়া, কাঁধে খদ্দরের চাদর। জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, স্বাধীনতা আমরা এখনও পাই নাই। স্বাধীনতার পথে পা দিয়াছি মাত্র। সত্যকার স্বাধীনতা পাইতে অনেক দেরি। সারা দেশের লোকের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন দরকার, সমগ্র দেশবাসীর কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। দেশের জন্য বাঁচিবার ও মরিবার মত শক্তি আহরণ করা দরকার। চাই শৃঙ্খলা, সংযম, ধৈর্য ও নেতাদের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথে চলিবার মত চাই নিয়মানুবর্তিতা। না হইলে সব পণ্ড হইবে। দেশে নানা দলের সৃষ্টি

হইয়াছে। দেশের জনশক্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া জাতিকে শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। কোন দলে যোগ না দিয়া একমাত্র কংগ্রেসের পশ্চাতে দাঁড়াইতে হইবে সকলকে। আজ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর অবিরত সংগ্রাম করিয়া কংগ্রেস দেশের শাসন-দণ্ড আয়ত্ত করিয়াছে। স্বাধীনতার সূচনা হইতে না হইতেই ক্ষমতালোভী লোকেরা শাসন-শক্তি হাত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এ কথা সকলের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কংগ্রেস কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নহে। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গল-সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাণশক্তিই তাহার শক্তির উৎস। দেশের সমগ্র জনগণের মধ্যে শান্তি ও সম্পদ আনিতে একমাত্র কংগ্রেসই সক্ষম।

আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া তিনি থামিলেন। যথারীতি করতালি-ধ্বনি হইল।

তারপর দাঁড়াইলেন আর একজন। ইনি বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী; পূর্বে বিপ্লবপন্থী ছিলেন, পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। লম্বা একহারা গঠন; ফরসা রঙ; পরনে দুধের মত সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, চোখে সোনার চশমা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কহিলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতমাতা মুক্তি পেয়েছেন। দুর্গম গিরিশিখরে দুর্ভেদ্য কারাগারে ছিলেন বন্দী। দিনের পর দিন তাঁর উপরে চলেছে অকথ্য অত্যাচার, অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অসহনীয় উৎপীড়ন। তাঁর আর্তনাদে সারা পৃথিবীর আকাশ আন্দোলিত হয়েছে। মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা দিনের পর দিন করজোড়ে প্রভুদের কাছে মায়ের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। সে প্রার্থনায় ক্ষমতা-মত্ত দাম্ভিক প্রভুরা কান দেয় নি।

শেষে একদল দুরন্ত ছেলে দুর্গম গিরিভূমি পার হয়ে সশস্ত্র

প্রহরীদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কারাগারের লৌহদ্বারে করলে আঘাত লৌহদ্বার ঝনঝন ক'রে উঠল। বিপুল বিস্ময়ে প্রভুরা সচকিত হয়ে উঠল। নেংটি ইঁদুরদের এত স্পর্ধা! প্রতিহিংসায় হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। মারলে তাদের পশুর মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে; বন্ধ ক'রে রাখলে অন্ধকার কারাগারে; পাঠাল দূর দুর্গম নির্বাসনে। যন্ত্রণার নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে তাদের প্রাণশক্তিকে পিষে গুঁড়ো ক'রে দিলে। কিন্তু নিরস্ত হ'ল না মায়ের ছেলেরা। প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে দলে দলে তারা এগিয়ে গেল, করলে আঘাতের পর আঘাত কারাগৃহের দ্বারে, কারাগৃহের ভিত্তিমূলে। মরলও তারা দলে দলে; তাদের দেহের কঙ্কাল জ'মে জ'মে পাহাড় হয়ে উঠল; তাদের বুকের রক্তে গিরির কঠিন বুক নরম হয়ে উঠল। শক্তিমানের বিপুল শক্তির কাছে ব্যর্থ হ'ল তারা। কিন্তু তাদের পায়ে পায়ে দুস্তর গিরিবক্ষের উপরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল একটি পরিচ্ছন্ন পথ।

তারপর সেই পথে হ'ল এক অভিনব অভিযান। অভিযানের নেতা গান্ধীজী—ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। কৃশ খর্ব দেহ, কিন্তু লোহার চেয়ে কঠিন মন। অহিংসামন্ত্রে সিদ্ধ হয়ে এলেন সাগর-পার থেকে। তিনি ভারতমাতার কোটি কোটি সন্তানদের ডেকে বললেন, এস তোমরা আমার পিছনে সকলে। সমবেত কণ্ঠে মায়ের মুক্তি চাইব আমরা। অস্ত্র চাই না, আমাদের চাই মনের শক্তি, মরবার সাহস। ওরা মারবে আমাদের, মার মাথা পেতে নেব আমরা; মারের বদলে মারব না কাউকে। যদি মরতে হয়, হাসিমুখে মরব। কিন্তু মরতে মরতেও চাইব মায়ের মুক্তি—

চল্লিশ কোটি সন্তান জয়গান ক'রে উঠল তাদের নেতার; পূজো করলে তাঁকে ঘরে ঘরে, তাঁর নাম করতে করতে ভাবে গদগদ হয়ে

যেতে লাগল, তাঁকে ডাকতে লাগল মহাত্মা ব'লে। কিন্তু এগিয়ে গেল না বেশি লোক। যাঁরা গেলেন তাঁরা সব দিক দিয়ে মায়ের সেরা সন্তান, আগুনে পোড়-খাওয়া সোনার চেয়েও খাঁটি। এ দের নিয়ে গান্ধীজী দিনের পর দিন জানাতে লাগলেন দাবি—মায়ের মুক্তি চাই। মুখে প্রশান্ত হাসি, কিন্তু কণ্ঠে বজ্রের দৃঢ়তা। তাঁর ক্ষমা-সুন্দর মূর্তির সামনে আততায়ীর উদ্যত অস্ত্র স্তব্ধ হ'ল, প্রভুদের দম্ভ বিন্ধ্যগিরির মত মাথা নোয়ালে—

হঠাৎ ডান বাহুর উপর প্রবল চাপ অনুভব করিতেই পাশে চাহিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। লম্বা কাহিল চেহারা; ফরসা রঙ; মুখে আবক্ষলম্বিত দাড়ি; চোখে চশমা। পরনে খাকী রঙের পাজামা ও হাফ-হাতা শার্ট। পায়ে বুটজুতা। মাথায় পাগড়ি। আপাদমস্তক তন্নতন্ন করিয়া দেখিলাম। পূর্ব-পরিচয়ের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখিতে পাইলাম না। লোকটাকে অবাঙালী বলিয়া মনে হইল। হিন্দু না মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দী জানি না, তবুও কোন মতে প্রশ্ন করিলাম, ক্যা বোলতা ?

লোকটি পরিষ্কার বাংলায় কহিল, আসুন আমার সঙ্গে। বিশেষ প্রয়োজন।

গলার স্বর চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিলাম, কেন ? কোথায় ?

লোকটি কহিল, ভয় নেই। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

মনে মনে কহিলাম, ক্ষতি তো করবে না বলছ, কিন্তু বিশ্বাস কি ? তোমার চেহারা আর পোশাক ! আজকাল ওই পোশাকে কলিকাতায় কত লোক কত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে ! আকাশের দিকে

তাকাইলাম, সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। কহিলাম, বক্তৃতা শুনব না? লোকটি কহিল, বক্তৃতা তো অনেক শুনেছেন। আরও শুনবেন। এর পর বক্তৃতার বন্যা বইবে দেশে। সামলানো দায় হবে। আসুন আমার সঙ্গে।—বলিয়া হাত ধরিয়া টান দিল। জোর করিয়া লইয়া যাইবে নাকি? ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কোথায় যেতে হবে? যা বলবার এখানে বলুন না।

এখানে হবে না। গোপনীয় কথা।

হাজার হাজার লোকের মধ্যে বাছিয়া শুধু আমাকেই গোপন কথা শুনাইবার জন্য এই অপরিচিত লোকটার আগ্রহ কেন, বুঝিলাম না। সসঙ্কোচে কহিলাম, আপনার গোপনীয় কথা শোনবার আমার প্রয়োজন?

লোকটি কহিল, আপনার শোনবার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার শোনাবার প্রয়োজন। সোৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, আমাকে চেনেন নাকি? লোকটি 'হাঁ'-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সঙ্গে যাইতে হইল। মনটা কিন্তু সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিল। মতলব কি লোকটার? ধাপ্পা দিয়া লইয়া গিয়া, কোন গলি-ঘুঁজিতে ঢুকাইয়া পকেট মারিবে নাকি? সঙ্গে কয়েকটা টাকাও লইয়া বাহির হইয়াছি। হরিধনবাবুর জন্য এক শিশি হরলিক্স পাই তো কিনিয়া লইয়া যাইব। বুকে হাত দিয়া পাঁচ টাকার নোটটি যথাস্থানে নিরাপদে আছে কি না দেখিয়া লইলাম।

একটা অন্ধকার ছোট গলির মুখে আসিতেই সভয়ে কহিলাম, এদিকে কেন? বড় রাস্তা দিয়ে চলুন না।

লোকটি কাহল, এ দিকেই যেতে হবে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সকাতরে কহিলাম, না না, এ দিকে না।

লোকটি হাসিয়া কহিল, কি মুশকিল! ওদিকে যাবার দরকার নাই, তবু যেতে হবে?

দরকার নেই কেন?

এই গলিতেই যে আমি থাকি। ভারি ভীতু হয়েছেন তো! বুড়ো হয়ে গেছেন দেখছি।

কণ্ঠস্বরে আবার পূর্ব-পরিচয়ের রেশ বাজিল। চেনা লোক নাকি? কে তাহা হইলে?

গলির মধ্যে কতকটা গিয়া একটা পুরাতন দোতলা বাড়ির সামনে আসিয়া কহিল, এই বাড়িটাতে থাকি, আসুন।

ভিতরে ঢুকিলাম। ছোট উঠান; তাহারই এক পাশে কুয়া। কুয়ার একটু দূরে রান্নাঘর। উনানে আঁচ দেওয়া হইয়াছে। সারা বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের বারান্দায় চাকর মসলা পিষিতেছে। মেসের ঠাকুর এক পাশে একটা টুলে বসিয়া হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে ঝিয়ের সহিত রসালাপ করিতেছে।

অত্যন্ত পুরাতন বাড়ি। দেওয়ালের চুন-বালি খসা। সামনে বারান্দায় একটা তক্তাপোশ; তাহার উপরে একটা কম্বল পাতা। দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটা তেলচিটা ময়লা বালিশ। দেওয়ালের উপরে কয়লা দিয়া আঁকাবাঁকা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—আপিস। অর্থাৎ এখানে বসিয়া হোটেলওয়ালা ব্যবসা পরিচালনা করে। ওই তেলচিটা বালিশটায় ঠেস দিয়া বসিয়া খাদ্যের নামে অখাদ্য খাওয়াইয়া হোটেলের বাবুদের স্বল্প মাহিনার সবটাই কেমন করিয়া আত্মসাৎ করিবে, সেই সম্বন্ধে ফন্দি আঁটে। স্বাধীনতা-দিবসের সভায় সেও যোগ দিয়াছে সম্ভবত।

লোকটির পাছু পাছু দোতলায় উঠিলাম। সিঁড়ির মাথার কাছেই

একটা ঘরের সামনে আসিয়া কহিল, এইটাই আমার আস্তানা। দরজা তালা-দেওয়া ছিল। খুলিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

নেহাৎ ছোট কুঠরি। এক পাশে একটা ভাঙা চৌকি। তাহাতে লোকটির স্বল্প শয্যা বিছানো। মেঝেতে একটা মাঝারি-গোছের সুটকেস; এক কোণে একটা দড়িতে গেরুয়া-রঙের একটি লুঙ্গি ও একটি গামছা ঝুলিতেছে।

লোকটি কহিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। বিছানার উপরে বসিয়া পড়িলাম। নড়বড়ে চৌকিটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

লোকটি মাথার পাগড়ি ও চোখের চশমা খুলিয়া ফেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, চিনতে পারছেন এবার?

মাথায় বড় বড় চুল; সামনের চুলগুলা একটু পাতলা; চওড়া কপাল; ডান চোখের জ্রর এক পাশে একটা কাটা দাগ; উজ্জ্বল আয়ত চোখ—যেন প্রাণের দীপ্তি ওই দুইটি চোখের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। খাড়া নাক। কানের পাতা দুইটির একটি বিশেষ ধরনের গঠন।

চিনিলাম, সুনির্মল। ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের একজন ছাত্রনেতা। কলিকাতায় এম. এ. পড়িত তখন। প্রতিভাবান ছাত্র ছিল। এম. এ. পাস করিলে যে কোন প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় পাস করিয়া সরকারী চাকুরি লাভ করিতে পারিত। আমাদের জেলায় এক গ্রামে বাড়ি। তাহার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। অতি কষ্টে ছেলেটির পড়ার খরচ চালাইতেন ও ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখিতেন।

এক রাত্রির কথা মনে পড়িল। ভাদ্র মাস সম্ভবত। অন্ধকার রাত্রি। দুর্যোগ নামিয়াছে। রাত্রি দুপুরে দরজায় ধাক্কা পড়িল।

প্রথমটা ভয়ে দরজা খুলি নাই। তারপর নাম ধরিয়া ডাকিতেই দরজা খুলিয়া দেখি, এক ভদ্রলোক—মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, চোখে চশমা। চিনিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, দাড়ি পাগড়ি ও চশমা একে একে খুলিয়া ফেলিল। তখন চিনিলাম, আমাদের সুনির্মল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? হাসিয়া কহিল, ফেরার; পুলিস পাছু নিয়েছে। বাড়ি যাচ্ছি। বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আজই স'রে পড়তে হবে। ক্ষিদে পেয়েছে ভারি। খাবার আছে নাকি বাড়িতে?

ছিল না। স্ত্রী উঠিয়া তাড়াতাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিলেন। যাইবার সময়ে কহিল, অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ। পায়ে-পায়ে শত্রু। আর ফিরতে পারব কি না কে জানে!—বলিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

কহিলাম, দাড়ি-গোঁফগুলোও খুলে ফেল। দাড়িটা হাত দিয়া টানিয়া সুনির্মল কহিল, এখন আর নকল নয়, আসল। গজাতে অনেক সময় লেগেছে।—বলিয়া হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম, কখন এলে?

জবাব দিল, কাল রাত্রে। স্বাধীনতা এসেছে। আর লুকিয়ে থাকব কেন? বাবা কেমন আছেন? আর আর খবর কি?

সুনির্মলের বাবা আসেন মাঝে মাঝে শহরে। আমার বাড়িতেই উঠেন। কহিলাম, ভাল নেই বিশেষ। বুড়ো হয়ে গেছেন একেবারে। মাথার চুল সব পেকে গেছে। কুঁজো হয়ে গেছেন। দেখলে হয়তো চিনতেই পারবে না তাঁকে। বউমা তোমার বাবার কাছেই আছেন। নিজের মেয়ের মত সেবা-যত্ন করেন ওঁর। তোমার

বাবা খুব প্রশংসা করছিলেন। গত বৎসর আমার বাড়িতে এসেছিলেন বউমা আই. এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে। ভাল ক'রেই পরীক্ষা পাস করেছেন। সুনির্মল মৃদু হাসিয়া কহিল, তাই নাকি ?

কহিলাম, বাড়ি যাচ্ছ কবে ?

কালই যাব।

দাড়িগুলো কামিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। পোশাকটা বদলাও।

সুনির্মল মৃদু হাসিল। পাশে বসিয়া কহিল, এবার কি করা যাবে বলুন দেখি ?

কহিলাম, পরীক্ষা দিয়ে দাও। পাস করবে নিশ্চয়। তারপর চাকরি-বাকরি করবে। দেশের নেতারা এখন দেশের শাসক। তোমাদের সম্বন্ধে সুবিবেচনা করবেন নিশ্চয়।

সুনির্মল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দেশের কাজ করেছি ব'লে পুরস্কার ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কংগ্রেসের ছোট বড় নেতারা, ছোট বড় কর্মীরা, এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যাদের নামমাত্র যোগ ছিল কোনও দিন তারাও, সবাই নূতন শাসন-ব্যবস্থায় কে কি সুবিধা আদায় করবে তারই হিসাবে ব্যস্ত। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের কেমন ক'রে দুঃখ-মোচন হবে, দু-চারজন ছাড়া এ কথা কেউ ভাবছে না। এ ক বছর ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে মিশে, এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, দেশের অধিকাংশ লোকই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচিত্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ। শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, প্রদেশগতভাবেও স্বাধীনতা-লাভের পর এই মনোবৃত্তি যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো মুশকিলের কথা। চিলের মুখ থেকে

আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি বটে, কিন্তু সে তো আর পালায় নি। কাছেই ডালে ব'সে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নাল ফেলছে। তা ছাড়া আরও অনেক চিল আশেপাশে উড়ছে—

কহিলাম, যার চেষ্টায় আমাদের মুক্তি-লাভ হয়েছে, তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। যত বিপদই আসুক, যত বাধাই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাক্, তাঁর নেতৃত্বে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর প্রিয় মন্ত্রশিষ্যগোষ্ঠী দেশকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তারপর নূতন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশে জন্মাবে নূতন মানুষ; পুরাতনের পচা সারে জন্মাবে নূতন প্রাণশক্তি; তখনই শুরু হবে ভারতের জয়যাত্রা।

নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিল। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। সকলে সভায় গিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝিটার খনখনে গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে। চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে সম্ভবত।

এক সময়ে কহিলাম, আমার ওখানে যাচ্ছ কবে?

সুনির্মল কহিল, কাল যাব, বউদিদিকে বলবেন।

কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় ভিড়। সভাভঙ্গের পর লোকে বাড়ি ফিরিতেছে। বাড়িতে বাড়িতে আলোকসজ্জা। রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে।

সুনির্মলের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি। শ্যামবর্ণ। ভারি শান্ত-শিষ্ট। বুদ্ধিমতী। স্বামীকে বেশিদিনের জন্য পায় নাই। তবু স্বামীর গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বামীর কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখ-মুখ দীপ্ত হইয়া উঠে।

স্বামী তাহার একদিন ফিরিয়া আসিবেন। আশাভঙ্গের শত আঘাতেও এ বিশ্বাস সে কোনদিন হারায় নাই। এই বিশ্বাসটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে স্বামীর সহিত দীর্ঘ-বিচ্ছেদভার নীরবে বহন করিয়াছে। আজ তাহার মুখে হাসি ফুটিবে।

বাংলা দেশে যাহারা আজ স্থনির্মলের মত ফিরিয়া আসিল, তাহাদের বাড়িতে আজ আনন্দের আলো ফুটিবে। যাহারা ফিরিল না, ফিরিবে না, তাহাদের বাড়ির অন্ধকার আজ হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিবে।

এক শিশি হরলিক্স কিনিবার জন্য একটা ঔষধের দোকানে উঠিয়া চাহিতেই দোকানের মালিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, নাই। তারপর একবার মুখের দিকে তাকাইয়া কম্পাউণ্ডারকে কহিল, দেখ তো হে, হরলিক্স আছে কি না? কম্পাউণ্ডার একবার ভিতরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, নাই। মালিক মোলায়েম হাসিয়া কহিল, বলেছিলাম তো, ও-জিনিস থাকতে পায় না, আসবামাত্র বিক্রি হয়ে যায়।

সব দোকানের মালিকেরই ওই এক ভাব। কোন জিনিস চাহিলেই থাকে না, থাকিলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; দোকানের কর্মচারীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়া যায়, তবুও না। মহা মুশকিলে পড়িয়াছে বেচারারা! আর একটি মজা যে, এ বিষয়ে মালিকদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, হালি-পুরাতন—সব এক ধরনের।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে চলিলাম। রাস্তার দুই পাশে বাড়িগুলি দীপমালায় সজ্জিত। কাহারও বাড়িতে রেডিও, কাহারও বাড়িতে গ্রামোফোন বাজিতেছে। কোন বাড়িতে গানের আসর বসিয়াছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও অপরূপ আলোক-সজ্জা। ডাক্তারবাবু বাড়িতে

ছিলেন। ড্রয়িং-রূমে রেডিও বাজিতেছিল। খবর পাইয়া বাহিরে আসিলেন। হরিসাধনবাবুর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলিতেই কহিলেন, আজ আর হবে না মশাই। কয়েকজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করেছি, তাঁরা এসে পড়লেন ব'লে।

কহিলাম, বেশি দেরি হবে না, কাছেই।

দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন, মাপ করবেন; আজ আর হবে না। কাল সকালে বরং একবার খবর দেবেন। আচ্ছা, আসুন আপনি, নমস্কার।—বলিয়া আর কিছু বলিবার আগেই চলিয়া গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

হরিসাধনবাবুর বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, অবস্থা সঙ্গিন। বিছানায় শুইয়া আছেন। অত্যন্ত অবসন্ন ভাব। চোখ দুইটি মুদ্রিত। মুখ দিয়া শ্বাস টানিতেছেন। উপরের ঠোঁটটা গুটাইয়া গিয়া সামনের কয়েকটা হলুদ রঙের দাঁত দেখা যাইতেছে। গলার ঘড়ঘড় শব্দ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হরিসাধনবাবুর স্ত্রী বুকে মালিশ করিতেছেন। ছেলেমেয়ে দুইটি এক পাশে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

একটু দূরে একটা টুলে মাখনবাবু বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার হাতে টিপ্‌নি দিয়া বাহিরে গিয়া চোখের ইঙ্গিতে ডাকিলেন। বাহিরে যাইবামাত্র ফিসফিস করিয়া কহিলেন, অবস্থা ভাল দেখছি নে; রাতটা কাটলে হয়। মাখনবাবু শুধু রোগীর জীবনেরই দায়িত্ব লইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, মৃত্যুর পরের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সমধিক সচেতন। কহিলেন, যে রকম ফুর্তির ফোয়ারা ছুটছে চারদিকে, লোকজন পাওয়া গেলে হয়! কি যে করা যাবে? তবে আমার কম্পাউণ্ডার চৌকস লোক। ওকে আজ ছাড়া হবে না। বাড়িতে চারটি খাইয়ে দেব। আপনিও খেয়ে-দেয়ে আসুন।

মাখনবাবু একেবারে শেষের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, আজ রাত্রেই কিছু হবে নাকি ?

মাখনবাবু চোখ দুইটি বুজিয়া ঘাড় কাত করিয়া কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে ?

তা হ'লে আর কি ? খেয়ে-দেয়ে চ'লে আসুন। আমরাও আসছি।—বলিয়া চলিয়া গেলেন। মাখনবাবুর চিকিৎসাবিদ্যা স্বল্প ; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি দরদ সমধিক। আজকাল চিকিৎসকদের মধ্যে ইহার অত্যন্ত অভাব।

হরিসাধনবাবুর মেয়েকে ডাকিয়া কহিলাম, তোমাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা ? রান্না হয়েছে ? মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল। হরিসাধনবাবুর স্ত্রীকে কহিলাম, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাচ্ছি। ওরা ওখানেই খাবে। আমিও আসছি একটু পরে।

ছেলেমেয়েদের লইয়া বাড়ি গেলাম। গৃহিণী তাহাদের খাওয়াইয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। হরিসাধনবাবুর স্ত্রীর জন্যও খাবার দিলেন মেয়েটির হাতে।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছাদের উপরে গেলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশ তারায় সমাকীর্ণ। উত্তর-পূর্ব কোণে মেঘ জমিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। কোথায় যেন বৃষ্টি হইয়া গেল। হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। বাড়িতে বাড়িতে দীপসজ্জা। রায় বাহাদুরের দ্বিতল বাড়িটি বিদ্যুতের লাল-নীল দীপমালা পরিয়া উৎসবসভায় সালঙ্কারা ধনী-গৃহিণীর মত অহঙ্কারে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। বাতাসে গানের মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে হরিসাধনবাবুর বাড়ির দিকটা ঘন অন্ধকার। মৃত্যু যেন কালো জটা

বিস্তার করিয়া ক্ষুধার্ত আগ্রহে ঝুপটি মারিয়া বসিয়া আছে। ওখানে পাড়ার ছেলেদের হল্লা শুনা যাইতেছে না। দুপুরের ভুরিভোজনটা পরিপাক করিবার জন্য সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়।

দেহ ও মনে গভীর ক্লান্তি। সারাদিন নানা ধরনের আনন্দ ও বেদনায়, নানা চিন্তা ও নানা ভাবের দোলায় দোল খাইয়াছে মনটা। দেহটাও ছুটাছুটি করিয়াছে বিস্তর। ইহার উপর রাত্রে যদি হরিসাধনবাবু মারা যান, তাঁহার শেষকৃত্যের ব্যবস্থা ও শোকার্ত পরিবারের ব্যবস্থা—এই দুই গুরুভারের অনেকটা আমার ঘাড়ে পড়িবে। একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ছাদের উপর একটা মাদুর পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন গৃহিণী। তাহাতেই গড়াইয়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে নিদ্রার গাঢ় কুহেলিকা সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

ঘন অন্ধকার রাত্রি। বিপুল জনপ্রবাহের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছি। অত্যন্ত ক্লান্ত। তবু থামিবার উপায় নাই। জনতার চাপ ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। তাহারই আলোকে সঞ্চরমাণ বৃহৎ জনপ্রবাহ মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ জনস্রোতের গতি রুদ্ধ হইল। সম্মুখে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই অন্ধকারের মধ্যে দূরে একটি আলোক-শিখা দৃষ্টিগোচর হইল, মিলিত কণ্ঠের ক্ষীণ ধ্বনিও কানে আসতে লাগিল; যেন ওই অন্ধকার প্রান্তরের মধ্য দিয়া কাহারা আসিতেছে! জনতা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তাহাদের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার তরল হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি অবসানপ্রায়। পূর্বদিগন্তে উষার ঈষৎ আভাস দেখা দিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে।

আবার সম্মুখে চাহিলাম। উষার অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলাম, অদূরে একটি শিবিকা ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে। পাশে পাশে আসিতেছেন নগ্নকায়, কটীবাসধারী, ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান—মহাত্মা গান্ধী। আরও কাছে আসিতে বাহকদেরও অনেককে চিনিতে পারিলাম। ভারতমাতার যেসব সন্তান মায়ের মুক্তিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা। ধীরে ধীরে শিবিকা সম্মুখে নবনির্মিত মর্মর বেদীর উপরে স্থাপিত হইল। শিবিকার ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক অপূর্ব মহিমময়ী নারী; গান্ধীজীর কাঁধে ভর করিয়া ক্লান্ত শ্লথ চরণে জনতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমগ্র জনতার মধ্যে অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, মা মা—

এমন সময়ে পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হইল। তরুণ অরুণালোক মায়ের মুখ ও দেহের উপর পড়িল। দেখিলাম, ঋজু সুঠাম দেহ; শুষ্ক পদ্মের পাপড়ির মত ম্লান শুভ্র রূপ, যেন গলিত রৌপ্যের উপর ভস্মের সূক্ষ্ম প্রলেপ পড়িয়াছে। মুখখানি শীর্ণ; ফ্যাকাশে; যেন রক্তশোষী জোঁকের দল দেহের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘ রুক্ষ আলুলায়িত কেশ পিঠের উপর লুটাইতেছে। পরিধানে জীর্ণ বসন; সর্বদেহে রিক্তাভরণ। আয়ত চোখ দুইটিতে অপরিমেয় স্নেহ ও অপার করুণা টলমল করিতেছে; শুষ্ক ওষ্ঠ দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বিশাল জনসমুদ্র উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, বন্দে মাতরম্। সেই ধ্বনি সমুদ্রগর্জনের মত দিক্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, মা অঙ্গহীনা। ডান হাতটি সদ্য-ছিন্ন। ছেদস্থান হইতে অবিরত রক্তক্ষরণ হইতেছে। অপরিসীম যন্ত্রণা দুই ওষ্ঠ চাপিয়া মা নিঃশব্দে সহ্য করিতেছেন।

জনতা 'বন্দে মাতরম্' গান শুরু করিল। সমবেত কণ্ঠের স্তুতিধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

মাতৃবন্দনা বিচিত্র সুরে-লয়ে আকাশে-বাতাসে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, সুর বেসুরা হইয়া উঠিতেছে। যেন দূর দিগন্তের ওপার হইতে কাহাদের রুদ্ধ ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ক্ষীণ তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মাতৃবন্দনার সুরমাধুর্যকে বিস্বাদ করিয়া দিতেছে।

মায়ের মুখের দিকে তাকাইলাম। মুখের সেই প্রশান্ত প্রসন্ন হাসি অম্লান ; কিন্তু দুই চোখের কোণে দুইটি মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু।

হঠাৎ কাহার ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। গৃহিণী বলিতেছেন, ওগো, শুনছ ? ওঠ দেখি। ওদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হরিসাধনবাবুর হয়ে গেল বোধ হয়।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। ছাদের ও পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। রায় বাহাদুরের বাড়িতে লাউডস্পীকারে 'বন্দে মাতরম্' গান বাজিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতেই শুনিতে পাইলাম, নারীকণ্ঠের ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরিয়া চিরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

বেবি

দূর কর্ ওই কালো হুঁদহদে ছোঁড়াকে, রাতদিন জ্বালাতন ক'রে মেরেছে! আর ওই হারামজাদীকে কানে ধ'রে ঘরে বেঁধে রাখ্। ববি, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? বাইরে যা।

বৈঠকখানায় বসিয়া আগামী বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈয়ারি করিতেছিলাম। স্ত্রীর উঁচু পর্দার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম সকাল হইতেই সপ্তমে শুরু করিলেন কেন? ব্যাপারটা কি দেখিবার করিতেছি, এমন সময়ে আমার দশ বৎসরের মেয়ে ববি ঘরে ঢুকিল। ইঙ্গিতে কহিলাম, কি হ'ল? ববি হাস্য গোপন করিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, জানি না বাবা।—বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

উঠিয়া অন্দরে যাইতেই দেখিলাম, ভৃত্য পাঁচকড়ি বেবির কানে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে। বেবির করুণ আর্তনাদ তাহার হৃদয় দূরে থাক্, কর্ণপটহ পর্যন্ত স্পর্শ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

স্পষ্ট দিবালোকে, চক্ষের সম্মুখে নারী-নির্যাতন! পৌরুষ চাড়া দিয়া উঠিল। ধমক দিয়া কহিলাম, ও কি করছিস? ছেড়ে দে।

পাঁচকড়ি জবাব দিল না, টানাটানিও বন্ধ করিল না। কেবল একবারমাত্র রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। দৃষ্টিপথ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের দাওয়ায় পত্নী গম্ভীর বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। চোখোচোখি হইতেই কড়া স্বরে আদেশ দিলেন, ছাড়িস নি, একেবারে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে আয়। তারপর ওই হতভাগাকে মেরে দেশছাড়া ক'রে দিয়ে আয়।—বলিয়া বাহিরের

দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, অর্ধোন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়া ও-পাড়ার ভুলো উঁকি মারিতেছে।

দীর্ঘ, উন্নত, পরিপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ ; কুচকুচে কালো রঙ ; ছোট-ছোট লোমওয়ালা গায়ের চামড়া, সভ্য-বুরুশ-করা কালো বনাতের মত চকচকে লেজটি একটি পরিপুষ্ট তিন-ফুটের মত পৃষ্ঠান্তদেশ হইতে লম্বমান। খাঁটি দেশী হইলেও ভুলোর চেহারা দুদণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, অবশ্য ভুলোর মরজি হইলে। কারণ কোন অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তিকে নিজের এলাকায় দেখিলেই ভুলো এমনই হাঁকডাক ও তাড়া করে যে, রূপাবেক্ষণ দূরে থাক্, সাদা ভদ্রলোকের চালে পথচারণই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

এই স্বনামধন্য শ্রীমান আমার বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছে কেন ? আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে বলিয়া তো মনে হয় না। কারণ, স্কুলে যাইবার সময় সামনে পড়িলে তাড়া না করুক, যেভাবে তাকায়, তাহাতেই বুকের রক্ত জল হইয়া যায়।

তবে কি বেবির বন্ধন-দশা ও ভুলোর আবির্ভাবের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে ? থাকিলে কেমন করিয়া থাকা সম্ভব হইল ?

সমস্যার স্বয়ং সমাধান না করিয়া শ্রীমতী উত্তর-মালার দিকে চাহিলাম। তিনি তখনও দাওয়ায় দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহার আদেশ পুরাপুরি প্রতিপালিত হইতেছে কি না দেখিতেছিলেন, এবং ভাব ও ভঙ্গীর দ্বারা প্রতিবাদীকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিতেছিলেন। তথাপি ডাক দিয়া কহিলাম, শুনছ! জবাব দিলেন না। কাছে গিয়া কহিলাম, কি ব্যাপার ? পত্নী ঝাঁজের সহিত কহিলেন, বোঝ না নাকি ? কচি খোকা!

সবজান্তার মত হাসিয়া কহিলাম, সব বুঝেছি, তবু তোমার মুখে—

কথাটা শেষ করিতে না করিতেই পত্নী কহিলেন, আমার এত ঢঙ দেখবার সময় নেই।—বলিয়া রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমিও পশ্চাদনুসরণ করিলাম। রান্নাঘরের মধ্যে আমাকে দেখিয়া পত্নী মুচকি হাসিলেন। সাহস পাইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার বল দেখি?

পত্নী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, বলছি, ব'স। জরুরী কথা। —বলিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। আমি উবু হইয়া বসিয়া, কলিকাতায় ফুটপাথের উপর জ্যোতিষীর সামনে যেমন করিয়া লোকে হাত দেখাইবার জন্য বসিয়া থাকে, তেমনই ভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বেবিকে কোন দিন চোখ মেলে চেয়ে দেখেছ?

দেখিয়াছি এবং চক্ষু মেলিয়াই দেখিয়াছি, কিন্তু কিছু না বলিয়া শুধু হাঁ-সূচক ঘাড় নাড়িলাম। পত্নী কহিলেন, ঘাড় তো নাড়ছ, তবে চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন?

বলিলাম, কি করতে হবে?

কেন? ডাক্তারবাবুদের টমকে নিয়ে এসে ওর সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও।

মাস্টার ও মালিনী মাসী—দুইয়ের কাজ আমাকেই করিতে হইবে নাকি! এড়াইবার জন্য কহিলাম, কেন, ভুলো? নিজেই যখন এসে পড়েছে, তখন আপত্তি কিসের? দেখতে-শুনতে তো বেশ।

স্ত্রী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, ছিঃ, দিশী! ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, তুমি টমকেই আনার ব্যবস্থা কর।

আমাদের গ্রামের সরকারী ডাক্তারখানার যিনি ডাক্তারবাবু,

টম তাঁহারই সম্পত্তি। হাড়-বাহির-করা জিরজিরে চেহারা; দাঁত-বাহির-করা শীর্ণ মুখ; সলিতার মত সূক্ষ্ম লেজ। ডাক্তারবাবু তাহাকে যতই বিলাতী গ্রে-হাউণ্ড-বংশীয় বলিয়া জাহির করুন, সে যে বর্ণ-সঙ্কর ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা তাহাকে দেখিবামাত্র কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না।

তবু এক জোড়া লটকানো কান এবং কিঞ্চিৎ লোম-বাহুল্যের জোরে সে যে ভুলোর উপর টেক্কা দিয়া যাইবে, তাহা আমার কাছে অত্যন্ত অন্যায় মনে হইল। তাহা ছাড়া নিজেরও কিছু স্বার্থ ছিল। ভুলোর এলাকা দিয়া আমাকে নিত্য স্কুলে যাতায়াত করিতে হয়। ভুলোর সঙ্গে একটা সুবাদ স্থাপিত হইলে, আর ভরা-পেটে ঘোড়দৌড় করিতে হইবে না। অতএব কহিলাম, কি দরকার এত হাঙ্গামায়, যখন—

পলিতায় আগুন দিতে না দিতেই বোমা ফাটিয়া গেল। স্ত্রী সগর্জনে কহিলেন, তুমি পারবে না তো? তা আমি জানি। কাঁচুমাচু মুখে কহিলাম, না না, পারব না কেন? স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি গো, জানি। কোন্ কাজটা তোমাকে দিয়ে হয় শুনি? ভাগ্যে আমি আছি তাই। যাক, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি পাঁচুকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করব। তুমি দয়া ক'রে কর্তামি না করলেই বাঁচি।—বলিয়া আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া মামলা ডিস্‌মিস করিয়া দিলেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিলাম।

স্কুলে যাইবার সময়ে দেখিলাম, অদূরে পথের ঠিক মধ্যস্থলে ভুলো দাঁড়াইয়া আছে। অত্যন্ত চিন্তাকুল ও ম্রিয়মাণ ভাব। শুনিয়াছি, প্রেমে পড়িলে অনেককে কবিত্বে ধরে; ভুলোরও সেই অবস্থা নাকি? তবু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। কারণ কবি হইয়া উঠিলেই যে ভদ্র হইয়া

উঠিবে, তাহার কোন মানে নাই। সঙ্গে সঙ্গে নজিরও মনে পড়িল। মাস দুই আগে জেলা-জজের কোর্টে জুরি হইয়া গিয়াছিলাম। জজ-মহোদয় একজন স্বনামধন্য বাঙালী কবি। কিন্তু তিনি একজন নিরীহ ডাক্তারকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কায়দায় পাইয়া যে ভাবে নাস্তানাবুদ করিলেন, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া হাকিম বাহাদুর নিজে ছাড়া, আদালত-সুদ্ধ উকিল, আমলা, মায় পেয়াদারা পর্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল। তবে? কিন্তু খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই তো চলিবে না, স্কুলের সময় হইয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই ভুলোর চক্ষে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়, ভুলো তাহার সনাতন তর্জন-গর্জন বর্জন করিয়া, বাৎসরিক পরীক্ষার পর অত্যন্ত ডানপিটে ছেলেও যেমন বিনয়ের অবতার বনিয়া পায়ে পায়ে ফিরিতে থাকে, তেমনই ভাবে আমার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

রাস্তায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি আমার সঙ্গে ভুলোকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কি মশায়! একেও পুষেছেন নাকি? প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আজ্ঞে না, দেখুন না, কি মুশকিল! ভুলো তখন গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডাক্তার অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, আর 'না না' কেন? কিন্তু খুব পোষ মানিয়েছেন তো! সঙ্গে ক'রে স্কুলে পর্যন্ত নিয়ে চলেছেন দেখছি।—বলিয়া একবার আমার ও একবার ভুলোর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু কি মুশকিল দেখুন দেখি! আমি একজন গরিব স্কুল-মাস্টার, আমার এই সারমেয়-সাহচর্য লোকে সহ্য করিবে কেন? হাকিম-হুকিম হইলেও বা কথা ছিল। বৎসর কয়েক পূর্বে তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব আমাদের ইউনিয়ন-বোর্ড পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে আসিয়াছিল, একটা বাঘের মত প্রকাণ্ড কুকুর, যেমন থাবা, তেমনই মুখের হাঁ,—নিশ্বাস লইতেছিল, না, হাপর চালাইতেছিল। আমরা মেম্বাররা যুক্তহস্তে সাহেবের সামনে বসিয়া মনে মনে ইষ্টনাম জপ করিতেছিলাম—সাহেবের ভয়ে যত না হোক, ওই দুশমনী চেহারাওয়ালা কুকুরটার ভয়ে; একটু ত্রুটি হইলেই যদি ঘাড়ে পড়িয়া প্রাণবায়ুটুকু বাহির করিয়া দেয় তো কোন চারা থাকিবে না। কিন্তু ইহা দেখিয়া আমাদের গ্রামের সকলে, কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করা দূরে থাক্, একসঙ্গে মোহিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ওই ডাক্তারবাবু (যিনি একটি নেংটি ট্যাঁস পুষিয়া নিজেকে কুকুরের বিশেষজ্ঞ মনে করেন) উক্ত সারমেয়প্রবরের কুলপঞ্জী ও কৃতিত্বের বিশদ বর্ণনা করিয়া, আমাদের মত অখ্যাত পল্লীগ্রামে তাহার পদার্পণ যে অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার, তাহা এমনই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়েছিলেন যে, আমরা সকলেই তাহার যথোচিত সমাদর করিতে না পারার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আজ সেই ডাক্তারবাবুই— কিন্তু যাক সে কথা।

ভুলো সঙ্গ ত্যাগ করিল না। তাহাকে নিষেধ করিব বা বুঝাইয়া বলিব—বাবাজী! তোমার দুঃখ আমি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি, তোমার জন্য চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু নিরুপায়। কারণ, নিষেধ করিলেই যে শুনিবে এবং বুঝাইয়া বলিলেই যে বুঝিবে, তাহার স্থিরতা কি? বরং উল্টা যদি প্রাক্তন-মূর্তি ধরিয়া বসে তো অনর্থের সীমা থাকিবে না। তাহার চেয়ে, সে যাহা ইচ্ছা করুক এবং লোকে যাহা ইচ্ছা বলুক, আমার পক্ষে নির্বাক ও নির্বিকার থাকাই নিরাপদ।

যাক, স্কুল পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া ভুলো নিরস্ত হইল। কিন্তু সারাদিন অস্বস্তির সীমা রহিল না। বাড়ি ফিরিবার সময়েও সঙ্গ লইবে নাকি? তাহা হইলে ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছে অত্যন্ত লজ্জায় পড়িতে হইবে, এবং স্ত্রীর চোখে পড়িলে যাহা ঘটিবে তাহা সকলের কাছে না বলাই ভাল।

স্কুল বন্ধ হইবার পরও অনেকক্ষণ অফিসে বসিয়া কাজ করিলাম, এবং সকলে চলিয়া যাইবার পর বাহিরে আসিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় তন্ন তন্ন করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। সমস্ত রাস্তা নির্জন ও নিঃশ্ব। নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। কিন্তু ভুলো কোথায় গেল? এই সময়ে প্রতিদিন সে রাস্তার ধারে একটা বটগাছের তলায় পাড়ার ও বে-পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের লইয়া মজলিস করে। আজই সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দিয়া একেবারে বৈরাগী বনিল নাকি? বিশ্বাস নাই। প্রেমের পাল্লায় পড়িলে কাহারও কোনও কাজ করিতে বাধে না। আমাদের পাড়ার নটবর এক বৈষ্ণবীর প্রেমে পড়িয়া, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সব ছাড়িয়া দিয়া আশ্রম-বাস শুরু করিয়াছে এবং গলায় মালা ও কটিতে কৌপীন পরিয়া বৈষ্ণব-বাবাজী বনিয়াছে। কাজেই—। না না, ভুলোর সম্বন্ধে এই চরম পরিণাম চিন্তা করিবার এখনও সময় আসে নাই। কারণ, দেখিলাম, রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া আমাদের পাড়ার দিকে গিয়াছে, ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া ভুলোর অনুচরদের একজন; শহরে মোড়ে মোড়ে মোতায়েন পুলিস-কন্‌স্টেব্‌লদের মত সোহং ভাব, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। না করুক, কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কেন? পাশ কাটাইয়া চলিলাম। আরও কিছু দূরে দেখিলাম, আর একজন দাঁড়াইয়া, আরও কিছু দূরে আর একজন। তবে? ব্যাপারটা সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইতেছে না। ভুলো কি দিনে ডাকাতি

করিবে নাকি ? পা চালাইয়া দিয়া. একে একে আরও তিন মূর্তিকে পাশ কাটাইয়া, বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিলাম, বাড়ির পিছনে বেড়ার ধারে স্বয়ং ভুলো। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বেড়ার ও-পাশে বেবি, দুইজন বেড়ার ফাঁক দিয়া, মুখে মুখ ঠেকাইয়া, প্রস্তরমূর্তিবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বাবাজী তাহা হইলে এইখানেই আসিয়া জুটিয়াছে! কিন্তু কাজটি কি ভাল হইতেছে ? আমি না হয় ভয়ে হোক, ভক্তিতেই হোক, কিছু বলিতেছি না; কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকের বেড়ার ধারে প্রকাশ্যে প্রেমালাপ! ইহার প্রতিবিধান করিতে না পারিলেও প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু পা বাড়াইতে গিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, ভুলোর অনুচরবর্গ দল বাঁধিয়া একেবারে কাছেই আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, প্রভুর প্রণয়-ব্যাপারে কাহারও হস্তক্ষেপ তাহারা পছন্দ করিবে না। অতএব পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম।

কিন্তু নিজের অসহায়তা ও অক্ষমতার জন্য মনটা ছোট হইয়া গেল। জানি, কুকুর-জাতি আমাদের রাজাদের পরম প্রীতিভাজন; কিন্তু তাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে নাকি ? রীতি-নীতি আইন-কানুন কিছুই মানিবে না ? নিরীহ গৃহস্থের মান-মর্যাদার মাথায় পা দিয়া ভরাডুবি করিয়া দিবে ? কিন্তু আক্ষেপ নিষ্ফল। ইহাই আমাদের, মানে, বাঙালী হিন্দুর ভাগ্যলিপি।

বৈঠকখানা হইতে অন্দরে ঢুকিতেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই দিকেই আসিতেছিলেন; আমাকে দেখিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া দিক পরিবর্তন করিলেন।

ব্যাপার কি ? নূতন কোন অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল

না। তবে হয়তো রাগ নয়, অভিমান। স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়াছে কিনা, তাই। চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। অনেকদিন দা-কাটা কড়া তামাক খাইবার পর যেন অম্বুরীর সুমিষ্ট গন্ধ নাকে আসিল। তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছাড়িয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, রান্নাঘরে গিয়া দেখিলাম, স্ত্রী খাবার সাজাইতেছেন। সামনে বসিয়া সরস কণ্ঠে ডাকিলাম, হ্যাঁগো, শুনছ! স্ত্রী জবাব দিলেন না। কহিলাম, বেবির কি ব্যবস্থা হ'ল? ইহার পর জবাব মিলিল, জানি না। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, বেবির কোন কথাতেই নেই আমি, যা ইচ্ছে তুমি করগে।

রসের বদলে রোষ! ঘাবড়াইয়া গেলাম। আদিম দাম্পত্য-জীবনে অভিমান উপশম করিবার জন্য কয়েকটি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতাম। ভাগ্যে আজ তাহারই দুই-একটি প্রয়োগ করিয়া বসি নাই! তাহা হইলে অনর্থের আর সীমা থাকিত না। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কি হ'ল? ধমকের সুরে কহিলেন, জানি না কি হ'ল! জিজ্ঞাসা কর পাঁচুকে, ডাক্তারবাবু কি ব'লে পাঠিয়েছে!

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। সকালে ভুলো-ঘটিত ব্যাপারটা ফাঁস করিয়া দিয়াছে নাকি? ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলাম, কি?

সরোষে কহিলেন, জানি না কি।—বলিয়া ঠক করিয়া থালাটা সামনে নামাইয়া দিয়া দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

খাওয়ার পর পাঁচুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই সে কহিল, বলেছেন, আমরা নাকি ভুলোকে পুষেছি। ও-রকম দুষ্টু দিশী কুকুর যে বাড়িতে, সেখানে কুকুর তাঁরা পাঠাবেন না, সহবৎ খারাপ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন করিলাম, আমরা যে ভুলোকে পুষেছি, এ খবর কে দিয়েছে তাঁদের?

পাঁচু ঢোক গিলিয়া কহিল, ডাক্তারবাবু যে ভূলোকে নিজের চোখে আপনার সঙ্গে যেতে দেখেছেন।

শুষ্ক কণ্ঠে কহিলাম, এই কথা বলেছে? আচ্ছা মিথ্যেবাদী লোক তো! তুই তোর দিদিমণিকে এ কথাও জানিয়েছিস বুঝি?

পাঁচু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ।

ধমক দিয়া কহিলাম, ওসব কথা বলতে গেলি কেন?

পাঁচু গৃহিণীর পেয়ারের চাকর, বাপের বাড়ি হইতে আমদানি, ধমক সহ্য করিতে পারে না, কাঁদকাঁদ স্বরে কহিল, দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন যে।

মুখভঙ্গী করিয়া কহিলাম, জিজ্ঞেস করলেন যে! জিজ্ঞেস করলে ব'লেই বলতে হবে!

পাঁচু অনুযোগের স্বরে কহিল, জামাইবাবু! মিথ্যে বলব? আপনিই তো সেদিন বললেন, সাহেবরা মিথ্যে বলে না।

সত্যই। পাঁচু সেদিন বিড়ি খাইতে খাইতে ধরা পড়িয়াছিল। স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও কিছুতেই তাহাকে স্বীকার করাইতে পারি নাই। শেষে জর্জ ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতার গল্প বলিয়া তাহাকে সর্বদা সত্য কথা বলিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।

কড়া গলায় কহিলাম, খুব হয়েছে, যা, বেরো আমার সামনে থেকে।

পাঁচু চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিরক্তি সত্ত্বেও, বলিতে কি, একটু আনন্দ হইল। এই পনরো বছরের শিক্ষক-জীবনে বিস্তর সুশিক্ষার বীজ ছড়াইয়াছি; কিন্তু গাছ দূরে থাক্, একটিতেও অঙ্কুরোদ্গম পর্যন্ত হয় নাই। আজ কিনা পাঁচুর প্রস্তরাধিক কঠিন হৃদয়ক্ষেত্রে—

পত্নীর কঠোর কণ্ঠস্বর কানে আসিল, মিথ্যে বলে নি ব'লে মার!

এমন তো কোথাও শুনি নি! পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নিজের মত মিথ্যে বলতে হবে নাকি? বাইরে যা ইচ্ছে তাই ক'রে আসবে, আর ঘরে এসে পরের ছেলের ওপর অত্যাচার! পাঁচুর উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন, কালই বাড়ি চ'লে যা, অত মারধোর আমি দেখতে পারব না।

আকাশ হইতে পড়িলাম। পাঁচুকে মারিলাম কখন? তাহার পৃষ্ঠে দূরে থাক্, কর্ণে পর্যন্ত হাত দিই নাই। তবু পাঁচু মিথ্যা লাগাইল! এই তাহার সত্যনিষ্ঠা! আর আমি কিনা মিথ্যাবাদী! শিক্ষকের ইহার চেয়ে বেশি দুর্নাম আর কি হইতে পারে? আর তাহার প্রচারক যদি স্বয়ং স্ত্রী হন, তাহা হইলে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস লওয়াই ভাল।

মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। সংসার, সমাজ, সভ্যতা, এমন কি জীবনের উপরও বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলাম। শঙ্করাচার্য বহু তপস্যা দ্বারা যে মোহমুদ্গর লাভ করিয়াছিলেন, স্ত্রীর তাড়নায় অনায়াসে তাহা আমি করায়ত্ত করিলাম। জীবন যে পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ চঞ্চল, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেহ যে আমার আপন জন নহে, সংসার যে সকল দুঃখের আকর, সমাজ যে একটি নিরীহ নিষ্পেষণী-যন্ত্র, সভ্যতা যে মানুষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত দুষ্কৃতির কর্মফল—এই সব গাঢ় তত্ত্বগুলি এক মুহূর্তে জলের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারিলাম, এই সংসার সমাজ ও সভ্যতার বেড়াজাল ডিঙাইয়া না বাহির হইতে পারিলে শান্তি নাই। হঠাৎ গৌরদাস বাবাজীর কথা মনে পড়িল। বৎসর দুই পূর্বে আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। দীর্ঘ দোহারা গঠন, নধর নবজলধর কান্তি, দাড়ি ও গুম্ফ সমন্বিত মুখ, মাথায় মেয়েদের মত বড় বড় চুল, পরিপাটি ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। পৃথিবীতে একখানি কন্থা ও গুটি-পাঁচেক সেবাদাসী ছাড়া আর আপনার বলিতে কিছুই নাই। অথচ তাঁহার মত নিখাদ নির্লিপ্ততা ও নিখুঁত শান্তি আমি খুব কম দেখিয়াছি। আমাদের

মত সকাল হইলেই ধোপা ও নাপিতের নাম স্মরণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতে হয় না; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম ছুটোছুটি ও গুঁতোগুঁতি করিতে হয় না; ছেলেমেয়েদের ঝামেলা সহ্য করিতে হয় না; আপ-টু-ডেট বনিবার জন্ম খবরের কাগজ মুখস্থ করিতে হয় না; এবং সর্বোপরি উঠিতে বসিতে স্ত্রীর ধমক খাইতে হয় না। দিবারাত্র গাঁজা খাইয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকেন, সেবাদাসীগুলি পালা করিয়া ভিক্ষা করিয়া আনে, রান্না করে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাঁজা সাজিয়া দেয়, গা-হাত-পা টিপে, স্নান ও প্রসাধন করায়, জীর্ণ কন্থাটি সংস্কার করে এবং সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া খঞ্জনী ও মন্দিরা বাজাইয়া সুমিষ্টস্বরে কীর্তন গাহিয়া শোনায়। অথচ এই সেবাদাসীগুলির উপরেও বাবাজীর বিন্দুমাত্র অধিকার-বোধ নাই, আকর্ষণ নাই। নহিলে আমাদের নটবর যখন একটি নবীনা বৈষ্ণবীর উপর ভাগ বসাইতে চহিল, তখন প্রতিবাদ তো করিলেনই না, উলটা সোৎসাহে নিজে তাহাদের কণ্ঠিবদল করিয়া দিলেন। আর নটবরের কি পরিবর্তন! বৈষ্ণবীর হেফাজতে বৎসর দুইয়ের মধ্যেই দেহে মাংস ও মনে স্ফূর্তি গজাইয়াছে।

পাঁচু আসিয়া কহিল, জামাইবাবু! দিদিমণি ডাক্তারবাবুদের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছেন, ছেলেরা রইল, দেখবেন।—বলিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি দশটার পর পত্নী বাড়ি ফিরিলেন। কি ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন, নিজে বলিলেন না, আমিও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময়ে ভুলোকে এড়াইবার জন্ম অন্য পথ দিয়া গেলাম এবং ফিরিলামও সেই পথ দিয়া। ভয় হইয়াছিল, ভুলো হয়-তো ফিরিবার সময়ে সঙ্গ লইবে। কিন্তু না, কোথাও ভুলোর দেখা পাইলাম না। যাক, তাহা হইলে তাহার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। সত্যই তো, প্রাংশুলভ্য ফলের জন্ম লম্ফঝম্প করিয়া লাভ কি? তাহা ছাড়া

ভুলো কি বেবির উপযুক্ত? সে দিশী নেটিভ; ভূতের মত কালো চেহারা। বেবির মত সুন্দরী স্প্যানিয়েল-বংশীয়া সারমেয়নন্দিনী তাহাকে কৃপা-কটাক্ষ দান করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে দেহ দান করিবে—এ আশা তাহার পক্ষে দুরাশা। যাক, তাহার সুবুদ্ধির সুবৃদ্ধি হোক, হৃদয় যদি কিঞ্চিৎ জখম হইয়া থাকে তো তাহা সত্বর নিরাময় হইয়া উঠুক, এবং হে ভগবান! আমার উপর তাহার যেন বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ না থাকে।

বাড়ির কাছে আসিয়া দেখি, ভুলো বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া। আজ আর সাঙ্গোপাঙ্গগুলি সঙ্গে নাই, থাকিলেও সরজমিনে হাজির নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বেবিও বাগানের মধ্যে নাই। আজ তাহার উপর কড়া পাহারা পড়িয়াছে বোধ হয়। হয়তো বা শ্রীমান টমের শুভাগমন হইয়াছে। বেবি তাহাকে লইয়াই মত্ত হইয়া আছে। ভুলোর কথা খুব সম্ভব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাই নিয়ম। একটুখানি হাসি কাশি বা চাহনি নিছক দৈহিক ব্যাপার, ইহার সহিত অন্তরের যোগ থাকিতেই হইবে তাহার কোন মানে নাই। অথচ এই নকলকেই আসল ভাবিয়া পুরুষের নাকাল হওয়ার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু, ভুলোর এ কি চেহারা হইয়াছে! সারা গায়ে ধূলা মাখিয়াছে, চোখ দুইটা লাল; মুখের ভাব ভীষণ; নির্নিমেষে আমার বাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। আজ সারাদিন বেবিকে না দেখিতে পাইয়া ভুলো বোধ হয় বুদ্ধি-বিবেচনার শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহার পর যা-তা করিয়া বসা অসম্ভব নয়। অতএব—। হঠাৎ ভুলো আমার দিকে তাকাইল এবং নিমেষমধ্যে তিন লাফে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া লেজ খাড়া করিয়া দাঁত বাহির করিয়া গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, এ অবস্থায় ছুটিলেই বিপদ। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া যা হোক

একটা কিছু হাতে লইতে হয়। আমিও না পলাইয়া, কাছাকাছি যা হোক কিছুর অভাবে পকেট হইতে ফাউণ্টেন-পেনটি বাহির করিয়া বর্শা মারিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলাম, ও মুখে ধ্যেৎ-ধ্যেৎ শব্দ করিতে লাগিলাম। ভুলো ভয় পাইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া গর্জনধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়াইতে লাগিল। আমিও তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, মুখে তেমনই শব্দ করিতে করিতে এদিক ওদিক চাহিয়া কেহ কাছাকাছি আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কাহারও দেখা মিলিল না। এদিকে ভুলোর ক্রোধ ক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্য পাঁয়তারা শুরু করিল; অতএব বুদ্ধি করিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম, বেবি! বেবি! ফাউণ্টেন-পেনটাকে দিয়া বেড়াটাকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, ওই যে বেবি। ফুটন্ত উথলাইয়া-পড়া দুধে জল দিলে যেমন তাহা এক মুহূর্তে শান্ত হইয়া যায়, ভুলোও তেমনই শান্ত হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং বার দুই লেজটি এদিক ওদিক নাড়িয়া কি যেন দেখিতে পাইয়া বেড়ার দিকে ছুটিল, আমিও উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটিলাম।

বৈঠকখানার দাওয়ায় উঠিয়া এক হাতে একটা খুঁটি ও আর এক হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সামলাইতে লাগিলাম। নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, মাথাটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, এবং পা দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া কোনমতে বৈঠকখানায় ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু কি বিপদ দেখুন দেখি! পৃথিবীতে রামের অপরাধে নিরপরাধ শ্যামের নির্যাতনই কি একমাত্র নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল? ইউরোপে দেখুন, দুই-চারি জন রামের মতান্তরের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্যাম ধনে প্রাণে মরিতেছে; বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দুই-দশ জন রাম

রহিমের স্বার্থ-সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য শ্যাম ও সোভানর পরস্পরের টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতেছে। অথচ উপায় নাই। শ্যামদের দুঃখে রামের হৃদয় গলিবে না, তাহারা নিজ নিজ মত ও পথে অটল হইয়া থাকিবে; অতএব শ্যামদের শাস্তি অনিবার্য।

কিন্তু সম্প্রতি এই সর্বজনীন ও সনাতন সমস্যা আমার পক্ষে এমনই ব্যক্তিগত ও প্রাত্যহিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উপায় নাই বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মেয়েমানুষ নয় যে ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে। অথচ পথে বাহির হইলেই ভুলো যদি দেখিবামাত্র আস্ফালন শুরু করে, তবে? আর শুধু আস্ফালন? যদি কামড়াইয়া দেয়? তাহা হইলে কসৌলি না হোক, কলিকাতা ছুটাছুটি করিতে হইবে।

শ্রীমান পাঁচকড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করিয়া চা। নামাইয়া দিতেই তাড়াতাড়ি হাত দিয়া দেখি, আগুনের মত গরম। ছাড়িয়া দিয়া কহিলাম, 'গ্লাসে কেন? পেয়ালা কি হ'ল?

টয়কে চা দেওয়া হয়েছে।—বলিয়া পাঁচু প্রস্থান করিল।

খুব চমৎকার ব্যবস্থা! কিন্তু যাহার প্রতিকার নাই, তাহা নীরবে সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কার্য। অতএব গ্লাসটি কাপড় দিয়া ধরিয়া কোনমতে চা গিলিতে লাগিলাম, এবং এইভাবে নিত্য চা খাওয়ার চেয়ে চা ছাড়িয়া দিব কি না চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার বাড়িতে চায়ের বিশেষ চাহিদা নাই। শ্রীমতী নেহাত সর্দি-কাশিতে কাবু না হইলে চা স্পর্শ করেন না, ছেলেমেয়েদেরও স্পর্শ করিতে দেন না। আমি ছাত্র-জীবনে, যখন আই. সি. এস. হইবার স্বপ্ন দেখিতাম, তখন এই অভ্যাস করিয়াছিলাম। স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া

গিয়াছে, কিন্তু চা এখনও ঘাড়ে চাপিয়া আছে। কাজেই শহর হইতে এক জোড়া পেয়ালা-পিরিচ সংগ্রহ করিয়াছি; অবশ্য নিজেরই জন্য, কোন অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নহে, তা দেশীই হোক আর বিলাতী হোক। তাঁহাদের জন্য, বিশেষ করিয়া শ্বশুর ও শ্যালকদের জন্য পত্নী নিজের পছন্দমত দুই জোড়া শৌখিন পেয়ালা-পিরিচ বাপের বাড়ি হইতে কিনিয়া আনিয়াছেন। চা-ও মাঝে মাঝে শহর হইতে আনাইয়া লই, এবং সেই চা পত্নী প্রতিদিন স্বহস্তেই সিদ্ধ করিয়া দেন; অবশ্য প্রতিদিনই বলিয়া থাকেন, এত নবাবী আমার সহ্যি হয় না। জবাব দিই, কেন? তোমার বাবা, দাদা—। কথা শেষ করিতে না করিতে গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, ওঁদের সঙ্গে তোমার তুলনা? কত টাকা রোজগার? আর তোমার? চুপ করিয়া যাইতে হয়। সত্যই তো। গরিব মাস্টারের শৌখিনতা লোকে সহ্য করিবে কেন? হইলই বা স্ত্রী। কিন্তু আমার এই অদ্বিতীয় পেয়ালাটির এমন করিয়া জাতি মারা উচিত হইয়াছে কি? ওটিকে এর পর বিসর্জন দিতেই হইবে এবং নূতন একটি সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত এই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। শৌখিন পেয়ালা দুইটি দেওয়াল-আলমারিতে সাজানোই থাকিবে, কোন কাজে আসিবে না।

চা পান শেষ করিয়া টম বাবাজীর আদর-আপ্যায়ন কি রকম চলিতেছে, দেখিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলাম। উঠানের এক ধারে একটা মজবুত গোঁজে শিকল দিয়া টমকে বাঁধা হইয়াছে। কাছেই ছেলেমেয়েরা তাহাদের বন্ধুবান্ধবসহ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমার স্ত্রী শুচিতা-রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ—দুই কার্য একসঙ্গে চালাইতেছেন। টমের ঠিক সামনে উবু হইয়া বসিয়া পাঁচু খাওয়ার তদারক করিতেছে। এক পাশে, একটু দূরে বেবি শৃঙ্খলাবদ্ধ

অবস্থায় উৎসুক নয়নে টমের দিকে তাকাইয়া আছে। দেখিলাম, চা পান শেষ হইয়াছে, সম্প্রতি বিস্কুটচর্বণ চলিতেছে।

পাঁচুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, বিস্কুট কোথায় পেলি? পাঁচু আমার কথার কোন জবাব না দিয়া তাহার দিদিমণির দিকে তাকাইতেই তিনি আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিলেন, বিস্কুট বাড়িতে নেই নাকি? আছে, কিন্তু তাহার জন্য গৃহিণীর কোন কৃতিত্ব নাই। সম্প্রতি আমাদের স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য শহর হইতে এক টিন বিস্কুট আনাইয়াছিলাম এবং মাস্টার ও ছাত্রদের কবল হইতে কোনমতে বাঁচাইয়া কতকগুলি ঘরেও আনিয়াছিলাম। গৃহিণী কহিলেন, না থাকলেও কিনে আনতে হ'ত। বেবির মত যে-সে ঘরে প'ড়ে তো ব'য়ে যায় নি, বিস্কুট খাওয়া অভ্যেস। কহিলাম, বিস্কুট অভ্যেসটা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু চা-টা কি পেয়ালায় না খাইয়ে অন্য কোন, মানে, ধর—নারকেলের মালা কিংবা—

গৃহিণী এবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়াই খনখনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তা কি করব? ডাক্তার-গিন্নী পইপই ক'রে ব'লে দিয়েছে, পেয়ালা-পিরিচ না হ'লে চা খায় না।

পিরিচে ঢেলে বুঝি নিজেই খায়? সার্কাসে কুকুর দেখছি!

তা কেন খাবে? একজনকে ঢেলে দিতে হয়। বেবি সতৃষ্ণ নয়নে বিস্কুটের দিকে তাকাইয়া ছিল। পাঁচুকে কহিলাম, ওরে! বেবিকে দে না একটা বিস্কুট।

গৃহিণী নিষেধ করিলেন, না না, বেশি নেই, কুলোবে না।

বুঝিলাম, গৃহিণী বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়াছেন; তাই, কাউন্সিলে কংগ্রেসী সভ্যদের মত ভালমন্দ সকল বিষয়েই প্রতিবাদ করিতেছেন।

কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী পাঁচুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, যা যা করতে হবে নিজের কানেই তো শুনেছিস। যে কদিন থাকে, ঠিক ঠিক সেইগুলো ক'রে যাবি, কারও কথা শুনিস নি। তারপর খুব সম্ভব আমাকে শোনাইবার জন্যই কহিলেন, পাঠাতে কি চায়! কত তোষামোদ ক'রে যে এনেছি, তা আমিই জানি।

চলিয়া আসিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হাঙ্গামা না চুকিয়া যাওয়া পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিব। কিন্তু রাত্রি নয়টার সময়ে পাঁচকড়ি যখন কম্বল কাড়িয়া লইতে আসিল, তখন মৌনব্রত ভঙ্গ করিতেই হইল। কহিলাম, কম্বল নিয়ে কি করবি?

পাঁচু পেয়াদা-সুলভ প্রাধান্যের সহিত কহিল, টমকে শোয়াতে হবে, দিদিমণি ব'লে দিলেন। অসহায়ভাবে কহিলাম, চারটি খড়-টড় পেতে দিলে হয় না?

পাঁচু জবাব দিল, না জামাইবাবু, ওসব অভ্যেস নেই, ওনারা ব'লে দিয়েছেন। কহিলাম—প্রকাশ্যে নয়, স্বগত—ওনারা ব'লে দিয়েছেন! একেবারে লাট-গিন্নীর ল্যাপ ডগ কিনা!

অন্দর হইতে ডাক আসিল, পাঁচু! পাঁচু কহিল, দিদিমণি ডাকছেন যে। খাতাপত্র সরাইতে সরাইতে কহিলাম, সারারাত্রি নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় তো ও-রকম হতভাগা কুকুরের কি দরকার?

পাঁচু গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, কি ক'রে জানব, জামাইবাবু! ওনাদের জিজ্ঞেস করবেন।

বলিয়া কম্বল লইয়া চলিয়া গেল। আমি পাঁচুর পলায়মান পৃষ্ঠদেশের উপর বজ্র-কঠোর দৃষ্টি উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিন্তু কি অত্যাচার দেখুন দেখি! এই কম্বলটি আমি শহর হইতে নিজে পছন্দ করিয়া, ভেড়িওয়ালাদের কাছ হইতে বেশি দাম দিয়া কিনিয়া

আনিয়াছি। এইটিতে বসিয়া আমি লেখাপড়ি করি; কোন গ্রাম্য অতিথি-অভ্যাগত আসিলে বসিতে দিই। টমকে শোওয়াইবার জন্য এইটি ছাড়া আর কোন জিনিস বাড়িতে পাওয়া গেল না! বিলাতী হোক, চা-বিস্কুট খাক, কুকুর তো! ওই কম্বলের উপরই কত রকমের কুৎসিত কাণ্ড করিবে! কাচিয়া লইলেও ওই কম্বলে বসিয়া আর তৃপ্তি পাইব না। তা ছাড়া কম্বলটিও নষ্ট হইয়া যাইবে। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, ভগবান! এই শয্যাই যেন টমের শেষ শয্যা হয়। আমি কম্বলের বিরহ কোনমতে সহ্য করিব।

কিন্তু ইহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে? হইবে বইকি। না হইলে গৃহে শান্তি থাকিবে না। কাল যদি গৃহিণী বলেন, টমকে মাথায় করিয়া দিনে দশবার নাচাইতে হইবে—অভ্যাস, ডাক্তার-গিন্নী বলিয়া দিয়াছেন, গৃহের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাকে তাহাই করিতে হইবে। নিছক শান্তির জন্য প্রবল পক্ষের অত্যাচার দুর্বল পক্ষ তো চিরদিন এমনই নীরবে সহ্য করে। কয়েক বৎসর আগে আমাদের জেলায় লাটসাহেব আসিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদেশ দিয়াছিলেন, লাটসাহেবের যথোচিত সংবর্ধনার জন্য আমাদিগকে ইউনিয়ন-বোর্ড হইতে মোটা টাকা তুলিয়া দিতে হইবে। সেই সময়ে গরিব গৃহস্থের উপর, দুঃস্থ কৃষককের উপর আমরা কিরূপ উৎপীড়ন করিয়া চাঁদা আদায় করিয়াছিলাম, তাহা তো মনে আছে। কিন্তু কেহ কি প্রতিবাদ করিয়াছিল? গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া লোকে টাকা দিয়াছিল। শুনিয়াছি, কোন কোন জমিদারের জমিদারিতে প্রজাদের গৃহের লাউ, কুমড়া, বেগুন হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-বধূ পর্যন্ত জমিদারের ভোগের জন্য দিতে হয়; প্রতিবাদ করে না; চুপ করিয়া থাকে। এমনই করিয়া প্রজা রাজার অত্যাচার, শ্রমিক

মালিকের অত্যাচার, দরিদ্র ধনীর অত্যাচার, অভদ্র ভদ্রের অত্যাচার, অশিক্ষিত শিক্ষিতের অত্যাচার, নির্বোধ বুদ্ধিমানের অত্যাচার, শিষ্য গুরুর অত্যাচার, ভৃত্য প্রভুর অত্যাচার, কেরানী বড়বাবুর অত্যাচার, তীর্থযাত্রী পাণ্ডার অত্যাচার, দেশসেবক নেতার অত্যাচার, ভক্ত ভগবানের অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করে। মানবসৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এই অত্যাচার শুরু হইয়াছে; জাহ্নবীপ্রবাহের মত অবিশ্রান্ত গতিতে কখনও মন্দ কখনও মত্ত বেগে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কতবার প্রতিবাদ হইয়াছে, আঙুল গনিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু কেন এই নীরব সহিষ্ণুতা? শান্তির জন্য। আমরা শান্তির জন্য সব সহ্য করিতে পারি। দুর্বলের শান্তির প্রতি এই গভীর আসক্তি প্রবলের হাতে প্রধান পীড়নাস্ত্র।

সেইদিন রাত্রে শূন্য শয্যায় (গৃহিণী বয়কট করিয়াছেন) ছটফট করিয়া রাত্রি দুইটার সময়ে চোখ মুদিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময়ে ভুলো সঙ্গীত শুরু করিল; কি মর্মভেদী অথচ মারাত্মক সঙ্গীত! ঘুম দেশ ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু ভুলোর সঙ্গীতের শেষ নাই। মাঝে মাঝে চুপ করে; ভাবি, কালোয়াতির কসরৎ বুঝি বা থামিল। কিন্তু এদিকে বেবি ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে, অমনই ভুলো নবোদ্যমে আবার শুরু করিয়া দেয়। এমনই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাপান-উতোর চলিতে লাগিল, আমি ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। কিন্তু রাগ করিলে কি হইবে? ইহাই নাকি বিরহে বিধি। রোমিও জুলিয়েতের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগিয়া দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বিরহ্-সঙ্গীত গাহিত। আমাদের পাড়ার অপূর্ব বিবাহের পর প্রথম প্রথম বউ বাপের বাড়ি গেলে, রাত্রি দুইটা পর্যন্ত হারমোনিয়াম সহযোগে 'নিদ্ নাহি আঁখি-পাতে' গাহিয়া সমস্ত

পাড়াকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। অবশ্য ভুলো যদি দিনের পর দিন এই বিরহ-সঙ্গীত চালাইতে থাকে, তাহা হইলেই মুশকিলের কথা।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময়ে স্কুলের চাকরকে ডাকাইয়া খাতা-পত্র বহাইবার অছিলায় সঙ্গে লইলাম, এবং হাতে লইলাম একটা মোটা লাঠি। রাস্তায় রাধানাথের সহিত দেখা হইল। রাধানাথ আমাদের শত্রুপক্ষীয় লোক। দেখিবামাত্র দাঁত বাহির করিয়া কহিল, কি বাবাজী! আজকাল বেতে শানছে না বুঝি, লাঠি চালাতে শুরু করেছ? মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিলাম, আজ্ঞে না, হাঁটুতে একটা বেদনা উঠেছে এমনই যে, চলতে কষ্ট হচ্ছে।—বলিয়া লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। রাধানাথ আমার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া, সহানুভূতির ভান করিয়া কহিল, তাই নাকি! বউমাকে একটু সেক-টেক দিতে ব'লো। এই বয়সেই বাতে পঙ্গু হ'লে চলবে কেন? গাঁটার ভাল-মন্দ একটা কিছু হয়ে যাক। তারপর চোখ মটকাইয়া কহিল, তা এত খাতাপত্তর কিসের? ইউনিয়ন-বোর্ডের কাজ আপিসে ব'সেই সারছ নাকি আজকাল? প্রতিবাদ করিলাম, সে কি কথা! এসব স্কুলের খাতা। ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতা স্কুলে যাবে কেন? রাধানাথ হাসিয়া কহিল, তা হ'লেই বা বাবাজী, কাজ তো। যেখানে হোক করলেই হ'ল। তা বেশ, আসি বাবাজী।—বলিয়া প্রস্থান করিল। আমি রাধানাথ দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত খোঁড়াইতে লাগিলাম।

বাড়ি ফিরিবার সময়েও চাকরকে সঙ্গে লইলাম। কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। ভুলোকে কোথাও দেখা গেল না, না রাস্তায়, না [illegible]ড়ার ধারে। কাল সারারাত্রি সঙ্গীতোদ্গীরণ করিয়া ভুলোর [illegible]

সম্ভবত শান্ত হইয়াছে। আমাকে বোধ হয় আর বিরক্ত বা বিব্রত করিবে না। বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, টম ও বেবি পরম আনন্দে খেলা করিতেছে। ইহার মধ্যেই দুইজনে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে তো! ভালই হইয়াছে। এখন ভুলো আসিয়া একবার নিজের চক্ষে দেখিয়া গেলে আরও ভাল হইত, মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র মোহ অবশিষ্ট থাকিলে ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যাইত।

অন্দরে গিয়া দেখিলাম, পারিবারিক আবহাওয়ারও কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। গৃহিণীর গুমট ভাবটা একেবারে কাটিয়া না গেলেও কিঞ্চিৎ গা-সহা হইয়াছে। খাওয়ার সময়ে কাছেই বসিয়া রহিলেন, চোখোচোখি হইলে সবেগে মুখ ফিরাইয়া লইলেন না, এমন কি দুই-একবার কিঞ্চিৎ হাসির আভাসও যেন দেখিলাম বলিয়া মনে হইল। সক্রিয় সহযোগ না করিলেও আমি যে অসহযোগ করিতেছি না, গৃহিণী বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার মনের উপর এ কয়দিন যে ভারটা চাপিয়া ছিল, তাহা কখন নামিয়া গিয়া মনটা হালকা হইয়া উঠিল। দুই দিন আগে যে এই সংসার বিষবৎ পরিত্যাজ্য ও সন্ন্যাস একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া হাসি পাইতে লাগিল। কাল সারারাত্রি ঘুম হয় নাই। কাজেই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে গেলাম এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে কাঁদিতেছে নয়? ভাল করিয়া কিছুক্ষণ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কান্না নয়, গান। ভুলো আজও আবার গান শুরু করিয়া দিয়াছে, অত্যন্ত করুণ স্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া। তবে তো ভুলোর রোগ এখনও সারে নাই! কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হইয়াছিল মাত্র, আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আমিও উঠিয়া খাড়া হইয়া বসিলাম। গান করুণ হইতে করুণতর ও করুণতম হইয়া হঠাৎ

কঠোর, কঠোরতর ও কঠোরতম হইয়া উঠিল। আমি দুই কান হাত দিয়া চাপিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পত্নী ও ছেলেমেয়েরা নির্বিকারে ঘুমাইতে লাগিল।

ভুলো বুঝিতেছে না কেন? কেন সে মিথ্যার মোহে মাতামাতি করিতেছে? কিন্তু ভুলোর কি দোষ? বেবি পোড়ামুখী ভাবে বা ভঙ্গীতে কোন আশা না দিলে, সে নিশ্চয় এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় আনাগোনা শুরু করিত না। ওদিকে বেবি তো নূতন প্রণয়ী লইয়া মশগুল হইয়া আছে, এদিকে পুরাতন প্রণয়ীটির পাগলামির ধাক্কা যে একা আমারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা যে কি করিয়া সামলাইব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ভুলোর সঙ্গীত কখনও বেহাগে ও বাগেশ্রীতে, কখনও বা ধ্রুপদ ও ধামারে চলিতে লাগিল। বেবি জাগিয়া আছে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ভুলোর সঙ্গীতময় আহ্বানে আজ সে সাড়া দিল না। ভালই করিল। কারণ ঘণ্টা দুই পরে ভুলো ক্লান্ত হইয়া চুপ করিল। আমিও আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে পাঁচুর ডাকে ঘুম ভাঙিল, জামাইবাবু, উঠুন, বেলা হয়ে গেছে। চোখ বুজিয়া থাকিয়াই কহিলাম, কটা বেজেছে? পাঁচু জবাব দিল, ঢের। তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া হিসাব করিতে করিতে কহিল, আটটা এক দুই তিন চার—। নিখুঁত হিসাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিলাম, সে কি রে! এত বেলা হয়ে গেছে!

চোখ মুছিতে মুছিতে বারান্দায় আসিতেই গৃহিণী রান্নাঘর হইতে কহিলেন, আজ আর চা খেয়ে কি দরকার? একেবারে নেয়ে খেয়ে নিলেই হয়! মনে মনে জবাব দিলাম, রসিকতা করিবার ভাবনা কি!

সারারাত্রি কি ধকল গিয়াছে, তাহা তো কেহ জানে না। আর জানিবেই বা কি করিয়া? যা নিরেট ঘুম, ভুলোর গান দূরে থাক্, কামান দাগিলেও চিড় খাইবে না।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া কাজ লইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে অন্দরে কোলাহল উঠিল; বেবি, পাঁচু, অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এবং গৃহিণী নিজেও হৈ-হৈ শুরু করিয়া দিয়াছে। মনে মনে বিরক্ত হইলাম। হয়তো একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এমনই গোলমাল করিতে পারে সব! একটু নিরিবিলিতে যে কাজ করিব, তাহার উপায় নাই। কোলাহলটি আমার ঘরের দিকেই সরিয়া আসিতেছে মনে হইল। মিনিট কয়েক পরে, বাবা, দেখ কি করেছে!—বলিতে বলিতে ববি ঘরে ঢুকিল, সঙ্গে পাঁচু। মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখিলাম, পাঁচুর হাতে এক পাটি জুতা, এবং আমারই জুতা। বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, কি হ'ল রে? পাঁচু জুতাটি মুখের সামনে আগাইয়া দিল। দেখিলাম, জুতাটির সম্মুখ-ভাগের নরম অংশটি অন্তর্ধান করিয়াছে। বাকি যেটুকু আছে, তাহাও দাঁতের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ববি কহিল, টম করেছে, বাবা। বেবি কিছু জানে না, বেবির এসব রোগ নাই আমি জানি। ইহা নিশ্চয়ই হতভাগা টমের কাজ। পাঁচু কহিল, খাঁটি বিলেতী কিনা! না হ'লে এই লোহার পাতের মত শক্ত চামড়ায় দাঁত বসানো দিশীর সাধ্য নেই। বাহাদুর বটে!—বলিয়া মুখ ও চোখ বার কয়েক চরকার মত ঘুরাইয়া দিল। কটমট করিয়া তাকাইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম, বাহাদুর! বলতে লজ্জা করে না! তুইই তো যত নষ্টের গোড়া! গৃহিণী আসিয়া হাকিমী চালে কহিলেন, হচ্ছে কি? পাঁচুকে কহিলেন, জুতোটা ফেলে দিয়ে কাজ কর্‌গে যা। হাত-পা ধুবি কিন্তু। ওই কুকুর-খাওয়া জুতো ছুঁয়ে সব একশা ক'রে দিস নি। পাঁচু চোখ মুছিতে

মুছিতে প্রস্থান করিল, এবং ছেলেমেয়েরাও একে একে বাহির হইয়া গেল। রহিলাম আমি এবং তিনি। তিনি কহিলেন, কি করবে বল! বলিতী কুকুর, তার ওপর বড়লোকের কুকুর, রোজ মাংস খাওয়া অভ্যেস। আমাদের বাড়িতে তো ওসব পায় নি, তাই ওই শুকনো জুতোটা চিবিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে। তা তোমার তো পুরনো জুতা, কোন্ মান্ধাতার আমলে কেনা। ওগুলো তো কত বলা সত্ত্বেও বদলাও নি, আর এই অঘটন না ঘটলে বদলাতেও না। ভালই হয়েছে, এই রবিবার শহর থেকে এক জোড়া ভাল দেখে জুতো কিনে আনগে। চমৎকার যুক্তি! ইহার পরও যদি এই পরম উপকারের জন্য টমের প্রতি আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হইয়া না উঠে তো আমাকে অমানুষ বলিতে হইবে। কহিলাম, স্কুলে যাব কি ক'রে? গৃহিণী অবলীলাক্রমে জবাব দিলেন, কেন? চটিজুতো প'রে। পায়ে চটিজুতা, হাতে মোটা লাঠি, ইহারা আমাকে গদাই পণ্ডিত সাজাইবে নাকি? গদাইয়ের অবশ্য এক পায়ে গোদ; কিন্তু যে দুঃসময় পড়িয়াছে, আমারও গোদ গজাইতে কতক্ষণ! কহিলাম, জুতো কিনতে যে শহরে যেতে বলছ, তাও কি চটিজুতো প'রেই যাব? গৃহিণী বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন, ওমা! তাতে কি দোষ? কত লোক যে খালি পায়ে যাওয়া-আসা করে। তোমার আবার যত ঢঙ।—বলিয়া সমস্ত সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন সভৃত্য চটিজুতা ফটর ফটর করিতে করিতে হাঁটু পর্যন্ত ধূলা লইয়া স্কুলে গেলাম, স্কুল হইতে ফিরিলামও। ফিরিবার সময়ে বাড়ির কিছু দূরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। অদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া ভুলো না? তাহার সামনে দাঁড়াইয়া, বার কয়েক চোখ মুছিয়া দেখিলাম, বেবি। গৃহিণীর কড়া পাহারা এড়াইয়া, টমকে ফাঁকি দিয়া

বেবি একেবারে বেড়া ডিঙাইয়া বাহিরে আসিল কিরূপে? দুইজনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কি গভীর পরামর্শ! কি মতলব উহাদের? ধীরপদে নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম। বেবি হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র, বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া পলাইয়া, বেড়া ডিঙাইয়া, বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ভুলোও পিছন ফিরিয়া একবার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। ভুলো কি আমাকে চিনিতে পারিল না? খুব সম্ভব মর্ত্যমানবকে চিনিবার মত মনের অবস্থা এখনও তাহার হয় নাই। বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বেবি টমের সঙ্গে খেলা করিতেছে। সে যে এইমাত্র বাহিরে গিয়া কি কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বিন্দুমাত্র বুঝিবার জো নাই।

কিন্তু 'পরিস্থিতি' খুব জটিল হইয়া উঠিতেছে নাকি? বেবি টমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতেছে, অথচ ভুলোকেও হাতছাড়া করিতে চাহিতেছে না। অবশ্য, ইহার ফলে ভুলোর মেজাজের কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কত দিনের জন্য? আসল ব্যাপার কাহারও কাছে চাপা থাকিবে না। তখন বাহিরে ভুলো আবার মার-মূর্তি হইয়া উঠিবে, এবং ভিতরে টম বিলাতী মতে কি করিবে জানা নাই। শুনিয়াছি, বিলাতের সুসভ্য মানব-সমাজে একই নারী স্ত্রী ও বান্ধবী রূপে একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে পারে, তাহাতে কোন পক্ষে কোন আপত্তি উঠে না। হয়তো বিলাতী সারমেয়-সমাজেও ওই প্রথাই চলিয়া থাকে। (আমাদের দেশে প্রগতিশীল সমাজেও নাকি এই প্রথা শুনিতে পাই।) আর চাপা থাকিলেও, আমি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ হইয়া আমার গৃহের মধ্যে কিছুতেই এই অনাচার চলিতে দিব । কাজেই বেবি যে দুই পক্ষে ভর দিয়া প্রণয়-সরোবরে সুখে

সাঁতার দিতে থাকিবে, তাহা হইবে না। তাহাকে এক পক্ষ বর্জন করিতেই হইবে।

সেই রাত্রি শান্তিতেই কাটিল। কিন্তু সকাল হইতেই সোরগোল উঠিল। গৃহিণী ক্রন্দনের স্বরে চীৎকার করিতেছেন, কি কাণ্ড করেছিস বল্ দেখি? রাত্রে শোবার আগে ভাল ক'রে দেখলি না কেন? কাছে শুয়ে থেকেও ঘুম ভাঙল না? এমন ঘুম! তোর যে ঘরে ডাকাত পড়লেও ঘুম ভাঙবে না রে হতভাগা! হায় হায়! বেচারা কুকুরের পেটে গেল শেষে! পাঁচু উচ্চ কণ্ঠে আত্মদোষস্খালনের চেষ্টা করিতেছে, আমি কি করব? ভাল ক'রেই তো দরজা বন্ধ করেছিলাম। মুখ দিয়ে খুলেছে। ঘুম ভাঙবে কি ক'রে? চেঁচাতে কি সময় দিয়েছে? একেবারে খপ ক'রে ধ'রে ঘাড় মটকে দিয়েছে। বিলেতী কুকুর যে! কত বুদ্ধি! কত কায়দা! ছেলেমেয়েরাও চীৎকার করিয়া কেহ রোষ, কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

ব্যাপারটি এই—গৃহিণী মাস কয়েক আগে পিতৃগৃহ হইতে একটি ময়নাপাখি আনিয়াছিলেন। সেটিকে নিজহাতে খাওয়াইতেন, নাওয়াইতেন, এবং মাঝে মাঝে তাহাকে গালে ও বুকে চাপিয়া ধরিয়া এমনই আদর করিতেন যে, দেখিয়া আমারও হিংসা হইত। পাখিটি নানা রকম কথা বলিতে শিখিয়াছিল, যথা—ময়না কই? মাগো! ও বাবা! ববি! বেবি! পাঁচু রে! রাধাকৃষ্ণ। রামরাম। ইত্যাদি। অর্থাৎ পাখিটির সেবা-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন, শিক্ষা-দীক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতেছিল; কিন্তু একটি ত্রুটি ছিল, খাঁচাটি পোক্ত ছিল না, বিশেষ করিয়া খাঁচার দরজাটি; একটু নড়িলেই খুলিয়া যাইত। অবশ্য ইহাতে কোনও ভয়ের কারণ ছিল না। কারণ পাখিটি এমনই পোষ মানিয়াছিল যে, দরজা খোলা পাইলেও পলায়ন করিত না। কিন্তু বহিঃশত্রুর কথা

আমরা কেহ ভাবিয়া দেখি নাই। ভাবিবার কথাও নয়। কারণ আমাদের বাড়িতে বিড়ালের বালাই ছিল না। একমাত্র শত্রুজাতীয় বেবি, সেও অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। কাজেই ময়নাটির সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলাম।

সরজমিনে হাজির হইতেই পত্নী সজল চক্ষে কহিলেন, শুনেছ ?

শুনিয়াছি, তবু উৎকণ্ঠিত মুখে কহিলাম, কি ?

ময়নাটাকে মেরে দিয়েছে।

পাঁচকড়ির দিকে তাকাইয়া কড়া গলায় কহিলাম, পেঁচো বুঝি ?

পাঁচু প্রতিবাদ করিল, সে কি জামাইবাবু ? আমি—

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন, পাগল নাকি ! ও কেন হবে ?

কহিলাম, তবে ? বেবি নাকি ?

অদূরে ছেলেমেয়েদের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বেবি নিরীহের মত মিটমিট করিয়া আমাদের দিকে তাকাইতেছিল। পত্নী তাহার দিকে একবার তাকাইয়া কহিলেন, না, ওর এ কাজ নয়।

তবে ?

মুখ ও চক্ষুর ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন, ওই পোড়ারমুখো। অর্থাৎ টম, যে এসব হৈ-চৈয়ে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া দূরে দেওয়ালের ধারে লেজ নাড়িতে নাড়িতে ঘাসের উপর কি শুঁকিয়া বেড়াইতেছিল।

কহিলাম, বিলিতী কুকুর কিনা! তা ছাড়া বড়লোকের কুকুর, মাংস খাওয়া অভ্যেস।

গৃহিণী কটাক্ষক্ষেপ করিলেন। আমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলাম, পাখিটা কোথায় ? চল তো, দেখি একবার।

গৃহিণী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হায় হায়! তার কি কিছু আছে! পোড়ারমুখো ব'সে ব'সে সারারাত ধ'রে সব গিলেছে।

ছেলেপিলে সমভিব্যাহারে দারোগাবাবুর মত অকুস্থানে হাজির হইয়া দেখিলাম, গৃহিণী মিথ্যা বলেন নাই ; ঠোঁট, পায়ের পাতা, ডানা, পালক ও কয়েক খণ্ড অস্থি ছাড়া ময়নাটির পার্থিব দেহের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই।

গৃহিণী শোকার্ত কণ্ঠে পাঁচুকে কহিলেন, সবগুলো জড় ক'রে তুলসী-তলায় পুঁতে দে। এ জন্মটা তো আমাদের হাতে প'ড়ে এমনই ক'রে গেল, পরজন্মটাতে যেন একটা গতি হয়।

কহিলাম, কিছু করতে হবে না। মোক্ষলাভ হয়ে গেছে ওর, বিলিতীর পেটে গেছে যখন।

সেদিন পক্ষীবিরহে পত্নী রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন না। কাজেই যা হোক কিছু মুখে দিয়া স্কুলে গেলাম। ফিরিতেই দেখিলাম, বাগানের বেড়া হইতে কিছু দূরে ভুলো দাঁড়াইয়া ; বাগানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া টম ; আর বেবি বেড়া ডিঙাইয়া মাকুর মত দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইল, বেবি টমকে বেড়ার বাহিরে টানিয়া আনিয়া ভুলোর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু টম তাহা পছন্দ করিতেছে না। ভয়ে নয় নিশ্চয়ই, কারণ বিলাতী ভয় বলিয়া কোন বস্তু সংসারে আছে বলিয়া জানে না, খুব সম্ভব দেশীর প্রতি বিলাতীর স্বাভাবিক ঘৃণায়। যাই হোক, বেবির মতলব কি? সে কি দেশী ও বিলাতীর মিলন সাধন করিয়া অঘটন ঘটাইতে চায়, না, দুইজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কে ভাল, কে মন্দ যাচাই করিয়া লইতে চায়?

বাড়িতে ফিরিয়া পত্নীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁগো! টমকে খেতে-টেতে দিয়েছ?

পত্নী বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, ভালবাসা যে উথলে উঠছে দেখছি।

কহিলাম, ভালবাসা আবার কি? হবু কুটুম। তার ওপর বিলিতী। দিশী হ'লেও বা না খেলে চলত।

পত্নী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, বাবা রে বাবা! একদিন একটু ক্রটি হবার জো নেই! খোঁটা দিয়ে দিয়ে পোঁটা বের ক'রে দেয়! ঝাঁটা মার মেয়েমানুষের মুখে, কেন বেঁচে থাকা!

রাত্রে শুইবার আগে পাঁচুকে ডাকিয়া কহিলাম, আমার বাকি জুতোটা টমের কাছে দিয়ে আয়। না হ'লে রাত্রে আবার কোথায় কি অনর্থ বাধিয়ে বসবে।

শেষরাত্রে বেবির চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল; এমন কি গৃহিণীরও। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, শুনছ?

কহিলাম, কি?

বেবি এত চেঁচাচ্ছে কেন?

কি ক'রে জানব? ডেকে জিজ্ঞেস কর।

ঘরে চোর ঢোকে নি তো?

স্কুল-মাস্টারের ঘরে আবার চোর ঢোকে?

চোর জমা-খরচ খতিয়ে কারও বাড়ি ঢোকে নাকি?

বেবির চীৎকার চলিতেই লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে টমের আর্তনাদ।

গৃহিণী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, নিশ্চয় চোর, টমকে মারছে, এর পর বেবিকে মেরে সব চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে, তুমি ওঠ দেখি।

কহিলাম, পাঁচুকে ডাক দাও না।

গৃহিণী ধমক দিয়া কহিলেন, পাঁচু কি করবে? ছেলেমানুষ! ওঠ দেখি! বেরিয়ে দেখ, কি ব্যাপার! পুরুষমানুষ—শুয়ে থাকতে লজ্জা করছে না?

উঠিতে হইল। কিন্তু শুধু-হাতে বাহির হওয়া কি ঠিক? অস্ত্রের

মধ্যে তো আছে একটি ফাউণ্টেন-পেন ও একটি পেন্সিল-কাটা ছুরি। কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইবে কি? পত্নী তাড়া দিয়া কহিলেন, ভয় কি? বেরিয়ে পড়, তোমাকে দেখলেই চোর হয়তো পালাবে। মনে মনে কহিলাম, হয়তো। যদি না পালায়! বেবির চীৎকার ও টমের আর্তনাদ ক্রমে বাড়িতে লাগিল; গৃহিণী জোর তাড়া দিলেন, যাও না। দাঁড়িয়ে রইল কেন?

রাজপুত-রমণীরা স্বামীদের স্বহস্তে রণসজ্জায় সাজাইয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমরা গদগদ হইয়া উঠি। কিন্তু আমার পত্নীর বীরত্ব কম কিসে? যে রমণী একটিমাত্র স্বামীকে এমন অবিচলিত চিত্তে চোরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে, তাহার বীরত্ব-কাহিনী লিখিবার জন্য লেখক কোথায়?

সশব্দে কাশিলাম, গলা ঝাড়িলাম, খিল খুলিলাম, যে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেচক চোরের এই সব শব্দ শুনিয়া পলায়ন করা উচিত। গৃহিণীর তাড়া সত্ত্বেও একটু অপেক্ষা করিলাম; এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়া মনুষ্যদেহের পক্ষে সম্ভব নহে; এতখানি উঠান পার হইয়া দেওয়াল ডিঙাইতে হইবে, একটু সময় দেওয়াই উচিত। গৃহিণী আবার তাড়া দিলেন। হড়াস করিয়া দরজা খুলিয়া এক পা বারান্দায় বাড়াইয়া উঁকি মারিলাম। কৃষ্ণা-পঞ্চমীর শেষরাত্রি, চারিদিকে জ্যোৎস্না ফুটফুট করিতেছে। পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম, কেহ কোথাও নাই। অতএব, 'কে রে? কে রে?' শব্দ করিয়া বাহিরে আসিলাম। ভাঁড়ার-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বেবি চীৎকার করিতেছিল; আমাকে দেখিয়া দরজায় আঁচড় দিতে লাগিল। চোর কি ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া আছে নাকি? ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দেখিলাম, জানালার গরাদ অভগ্ন, দরজায় তালা ঝুলিতেছে।

তবে ? ভিতর হইতে টমের আর্তনাদ শোনা গেল। টম ভিতরে ঢুকিয়াছে নাকি ? নিশ্চয়। ভঁাড়ার-ঘরের জানালাটি মেঝের খুব কাছে এবং গরাদগুলির মধ্যে এত ফাঁক যে, জানালা খোলা থাকিলে কুকুর ও বিড়াল অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকিতে পারে। অন্য দিন গৃহিণী স্বহস্তে জানালা বন্ধ করেন, কাল বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাক, ভাড়ার-ঘর-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

পাঁচু ইতিমধ্যে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। গৃহিণীও আসিলেন এবং জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ও মাগো! আমার সর্বস্ব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছে। ও পাঁচু! দরজাটা খুলে হতভাগাকে বের কর্। আমার ঠাকুর কেমন আছেন আগে দেখি।

এই ঘরে কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি ও পট একটি ভাঙা জলচৌকির উপরে বহুদিন ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন। গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। এই পাইকারী প্রণাম ছাড়া ইঁহাদের জন্য আর কোন নিত্য-সেবার বন্দোবস্ত নাই। তবু হয়তো ভবিষ্যতে সেবিকার সুমতির উদয় হইয়া বরাদ্দ-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, এই আশায় দেবতাগুলি জীবন-বীমার দালালদিগকেও হার মানাইয়া অবিচলিত ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঁচু দরজা খুলিতেই দেখা গেল, চাল ডাল মসলা ইত্যাদির হাঁড়িগুলি মেঝেতে গড়াইতেছে; তেলের ও ঘিয়ের ভাঁড় উল্টাইয়া গিয়া কতকটা মেঝে পিছল হইয়া উঠিয়াছে; জলের কলসী ভাঙিয়া গিয়া সারা মেঝের উপর বান বহিতেছে; দেবতাবৃন্দ সিংহাসনচ্যুত হইয়া জলশায়ী হইয়াছেন; এবং এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রলয়ঙ্কর মহাকালের মত টম এক পা তুলিয়া আর্তনাদ করিতে

করিতে লাফাইতেছে। গৃহিণী দেবতাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হায় হায়! কি করেছে দেখ! আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, জলে ভিজিয়া পটগুলি ন্যাৎনেতে ও মূর্তিগুলি স্যাঁৎসেঁতে হইয়া উঠিয়াছে ; রঙ চটিয়াছে, এবং এ অনাচারী ম্লেচ্ছ ইহাদের সর্বাঙ্গে যা কাণ্ড করিয়াছে, তাহা দেখিলে হিন্দু-মহাসভার যে কোন সভ্যের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। গৃহিণী টমের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মর্ মর্, মরণ নেই তোর? জবাব না দিয়া টম চীৎকার করিতেই লাগিল্। গৃহিণী সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমি টমের অবিরাম তাণ্ডবনৃত্যের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কাছে যাইতেই দেখিতে পাইলাম, টম যে পাটি তুলিয়া আছে, সেই পায়ে একটি জাঁতিকল আটকাইয়া রহিয়াছে। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। গৃহিণী ইঁদুর ধরিবার জন্য ভাঁড়ার-ঘরের এক পাশে জাঁতিকল পাতিয়া রাখেন। জানালা খোলা থাকায় টম নিজেই অথবা কাহারও কুপরামর্শে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া জাঁতিকলে পা দিয়া এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে।

স্ত্রীকে বুঝাইলাম, বৃথা আক্ষেপে কালক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, উদ্ধারকার্য সত্বর আরম্ভ করা উচিত। গৃহিণী বুঝিলেন। দেবতাগুলিকে একে একে বাহিরে আনিয়া প্রথমে গোবরমিশ্রিত জলে, পরে কূপ হইতে সদ্যোত্তোলিত বিশুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া তুলসীতলায় নামাইয়া রাখা হইল। কাল গঙ্গাজল ছিটাইয়া আবার ঘরে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে। পাঁচু ভাঁড়ার-ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল। আমি টমের পাটিকে মুক্তিদান করিয়া চুন-হরিদ্রার প্রলেপের ব্যবস্থা করিলাম।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময়ে শুনিতে পাইলাম, গৃহিণী পাঁচুকে

হাঁক দিয়া কহিতেছেন, পোড়ারমুখোকে আজ আর ঘরে ঢুকতে দিস নি। বাগানেই থাক্। সন্ধ্যের পর আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব, আর সেই দেমাকী মাগীকে বেশ ক'রে দুকথা শুনিয়ে আসব।

বুঝিলাম, আজ টম-বিদায় ও বন্ধু-বিচ্ছেদ—দুইয়েরই ব্যবস্থা হইবে।

সেদিন শনিবার; বেলা দুইটার সময়ে বাড়ি ফিরিতেই দেখিলাম, বাড়ির কাছে একটা প'ড়ো জমিতে পাড়ার ছেলেদের ভিড় জমিয়াছে। বাজি হইতেছে নাকি? আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইলাম, বাজি যুদ্ধ। ভুলো ও টমের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে। ভুলোর চেহারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে; লেজ খাড়া, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুখ বীভৎস। টমও যথাসম্ভব লেজ খাড়া করিয়া, দাঁত বাহির করিয়া এবং হাঁকডাক করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মুখে ও চোখে ভীতি ও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘিরিয়া ভুলোর অর্ধ ডজন অনুচর ঊর্ধ্ব মুখে ও উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ভুলোকে উৎসাহদান করিতেছে। রণস্থলের ওপাশে কিছু দূরে একটা ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া বেবি উৎসুক নয়নে যুদ্ধের গতি ও ফলাফল নিরীক্ষণ করিতেছে; এপাশে দাঁড়াইয়া পাড়ার ছেলেরা নির্বিচারে ঢিল ছুঁড়িয়া দুই পক্ষকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

টমকে এই বিপদে ফেলিয়াছে কে? সে স্বেচ্ছায় ভুলোর সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গৃহিণী ও পাঁচুর অনবধানতার সুযোগ লইয়া বেবিই হয়তো তাহাকে ভুলাইয়া বাহিরে আনিয়াছে; তারপর দলবল সমেত ভুলোর সামনে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে। কিন্তু টমকে উদ্ধার করিব কি করিয়া? ভুলোর ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, সে যে কোন মুহূর্তে টমের উপর লাফাইয়া

পড়িয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। এখনও যে দেয় নাই, সে টম নেহাত বিলাতী বলিয়াই। এ অবস্থায় মধ্যস্থতা করিতে গেলে তাহার সমস্ত রাগটা হয়তো আমার ঘাড়েই পড়িয়া যাইবে। অতএব টমকে তাহার বিলাতী বুদ্ধি ও বাহুবলের উপর ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে দাঁড়াইলাম।

হঠাৎ ছেলেদের একটা ঢিল ভুলোর মুখে লাগিতেই সে চক্ষু বুজিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। এই সুযোগেই টম এক লম্ফে সারমেয়ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর শীর্ণ লেজটিকে পিছনের দুই পায়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া, সদ্য-আহত পায়ের যন্ত্রণাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভুলো পলকমাত্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল; তারপর একবার হুঙ্কার ছাড়িয়া, দ্রুতগতিতে টমের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ভুলোর অনুচরবর্গ ও পাড়ার ছেলেরা কলরব করিতে করিতে তাহাদের পাছু পাছু ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে টম ও ভুলো দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং ভুলো যে টমের নাগাল কিছুতেই পাইবে না, সে বিষয়ে আমার তিলমাত্র সংশয় রহিল না।

আমি অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেদের কলরব কানে আসিতে লাগিল। তাহারা টমকে দুয়ো দিতেছে। দেশী ছেলে কিনা! স্বল্পমাত্র সুযোগ ও সময় পাইয়া টম যেরূপ কৌশল ও নিপুণতার সহিত বিপদজাল কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে, বিলাত হইলে ধন্য-ধন্য পড়িয়া যাইত, খবরের কাগজে টমের ছবি বাহির হইত এবং বেতারবার্তায় টমের স্তুতিবাদ শুনিতে শুনিতে দেশ-বিদেশের লোক অস্থির হইয়া উঠিত। তবে কি পলায়ন-বিদ্যাদি আমাদের খাঁটি স্বদেশী

জিনিস নয়? বিলাতী সভ্যতা ও তাহার আনুষঙ্গিক বিদ্যা ও অপবিদ্যাগুলির সঙ্গে এটিরও এ দেশে আমদানি হইয়াছে? অসম্ভব নয়। কারণ পলায়ন-বিদ্যাটিকে মুরগী-ভক্ষণের মত আমরা সকলেই, কেহ গোপনে কেহ প্রকাশ্যে, অভ্যাস করিয়াছি ও করিতেছি বটে; কিন্তু এখনও নিজস্ব করিয়া তুলিতে পারি নাই। বেকায়দায় পড়িলেই পলায়ন করি, কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি না। কাহাকেও পলাইতে দেখিলে তো নিন্দায় রীতিমত পঞ্চমুখ হইয়া উঠি। কাজেই বিদেশীরা, বিশেষ করিয়া ইংরেজেরা নিতান্ত স্নেহবশে যখন আমাদিগকে পলায়নপটু বলিয়া বাহবা দেন, তখন আমরা ঘাড় হেঁট করিয়া তাহা মাথা পাতিয়া লই বটে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা এখনও এই প্রশংসা পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি নাই।

বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলাম, বেবি নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছে; টমের বিচ্ছেদ তাহাকে কিছুমাত্র কাবু করে নাই।

মাস দুই পরে একদিন সকালে ববি আসিয়া কহিল, বাবা, দেখবে এস।

প্রশ্ন করিলাম, কি?

তুমি এস. না!—বলিয়া হাত ধরিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। অচিরে দেখিতে পাইলাম, গোয়াল-ঘরের এক কোণে মাটিতে বিছানো খড়ের উপরে চারিটি কুকুরের ছানা,—দুটি ভুলোর মত কালো কুচকুচে, দুটি বেবির মত সাদা ধবধবে। সবগুলিরই বেবির মত লটকানো কান, গায়ে বড় বড় তুলোর মত নরম চুল।

আমাকে দেখিয়াই বেবি পায়ের কাছে আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, এবং আমার দুই পায়ের উপর মুখ ঘষিতে ঘষিতে মৃদু অস্ফুট শব্দ করিয়া ভক্তি, ভালবাসা ও বোধ করি কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। আমি সস্নেহে একবার তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলাম।

সান্ত্বনা

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিলাম। স্কুলের পর স্কুল-কমিটীর মীটিং ছিল। নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। তাহা ছাড়া, কমিটীর মেম্বাররা সকলেই বৈকালিক চা-পানপর্ব শেষ করিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই ঢিমা তালে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং কাজের বিষয় ছাড়াও অনেক বাজে বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। ফলে দেরি হইয়া গেল। সকাল দশটায় দুই মুঠা নাকে-মুখে গুঁজিয়া স্কুলে গিয়াছি, স্কুলে এক কাপ চা খাইয়াছি মাত্র; ক্ষুধায় পেটের নাড়ীগুলি পাক দিতেছিল। গৃহিণীর কাছে আজিকার খাটুনির ফিরিস্তি দিয়া, রুটি ও চিনির সঙ্গে কেমন করিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ করুণা ও এক কাপ চায়ের বদলে দুই কাপ চা আদায় করিয়া লইব, তাহাই মনে মনে জল্পনা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিলাম।

বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী কহিলেন, শুনছ, বাজারে নাকি অনেক ইলিশ নেমেছে, আট আনা দশ আনায় এক-একটা; পাড়ার সবাই এক-একটা এনেছে; রাস্তায় যে যাচ্ছে, তারই হাতে একটা ক'রে মাছ। ছেলে দুটিকে এত ক'রে বললাম, গেল না। আমার যেমন অদেষ্ট, তেমনই তো ছেলে! তা তুমি একবার যাও দেখি চট ক'রে। এই তো বাজার! যেতে আসতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। ততক্ষণ আমি খাবার চা গরম ক'রে রাখছি।—বলিয়া প্রতিবাদের অবসর না দিয়া বাজারের থলিটি আনিয়া হাতে তুলিয়া দিলেন। পরক্ষণেই মুখের দিকে তাকাইয়া রোষগূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, তুমিও যাবে না তো? গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইলাম,—থমথমে মুখ, চোখের কোণে বিদ্যুৎ জমিতে

শুরু করিয়াছে, বর্ষণের দেরি নাই। সোৎসাহে কহিলাম, যাব না! বল কি? এখনই যাচ্ছি। জামাকাপড়গুলো ঘামে ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে, বদলে নিয়েই যাচ্ছি।

আজ দুই মাস ধরিয়া বাজারে মাছ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাছ কণ্ট্রোল করিয়াছেন। ফলে, মেছুনীরা বাজারে মাছ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যাহাদের মাছ খাইবার বাসনা হয়, তাহাদের জেলেপাড়ায় গিয়া, মেছুনীদের সাধ্যসাধনা করিয়া, ন্যায্য দামের চারগুণ দাম দিয়া মাছ আনিতে হয়। কাজেই, গৃহিণীদের মেজাজ দিনরাত গনগন করিতেছে এবং গৃহকর্তারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

থলিটি হাতে ঝুলাইয়া বাহির হইলাম। অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। রাস্তায় আলোর বালাই নাই। রাস্তার ধারে ধারে সিকি মাইল অন্তর, এক-একটি করিয়া কাঠের ল্যাম্প-পোস্ট খাড়া করা আছে, প্রত্যেকটির মাথার কাচের আবরণীও আছে, কিন্তু কখনও নিয়মিতভাবে আলো জ্বালা হয় না। ইহাই এই শহরের—তথা এই জেলার ভাগ্যলিপি। শহরের বাহিরে দাঁড়াইয়া যেদিকে তাকাইবেন, দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ, কিন্তু শস্য জন্মায় না; যেখানে সেখানে বড় বড় ফলের বাগান, কিন্তু ফল ধরে না; শহরের দুই পাশে দুইটি নদী, কিন্তু বর্ষায় মাস দুই ছাড়া সারা বৎসর মরুভূমির মত ধুধু করে, মিউনিসিপ্যালিটি বা অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের যাহারা কর্ণধার, তাহারা দেখিতে শুনিতে মানুষ, কিন্তু তাহাদের বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই, এখানে আলোকস্তম্ভের মাথায় আলো জ্বলিবে না, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে?

বাড়ি হইতে বাজার প্রায় এক মাইল। রাস্তার ধার দিয়া চলিয়াছি। সামনে ও পিছন হইতে মাঝে মাঝে মিলিটারি লরি গর্জনে প্লীহা

চমকাইয়া দিয়া পার হইয়া যাইতেছে। রাস্তাটি পিচের তৈয়ারি, কিন্তু দুই পাশ ধূলায় ভর্তি। জুতা প্রায় সমস্তটা ধূলায় ঢুকিয়া যাইতেছে ও মধ্যে ধূলা ঢুকিতেছে। তাহার উপর, জুতা জোড়াটি পুরাতন; বহুদিনের পরিচয়-হেতু আচরণে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে পা হইতে খুলিয়া যাইবার চেষ্টা, জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিতেছি। এ যে কত কঠিন ধরনের কসরত, ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

রাস্তায় একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। বাম হাতে একটি সুঠাম চেহারার ইলিশমাছ ঝুলিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, কি মাস্টার মশায়, থলি হাতে কোথায়? কহিলাম, বাজারে। চমৎকার মাছটি তো! ভদ্রলোক মাছটি তুলিয়া, ঠিক আমার নাকের সামনে ঝুলাইয়া, গদগদকণ্ঠে কহিলেন, চমৎকার মাছ, না? পরম আত্মপ্রসাদের সহিত কহিলেন, সত্যি। মাছটি নামাইয়া লইয়া কহিলেন, অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি মশায়। পয়সা থাকলেই হয় না আজকাল, পায়া-বল চাই। মাছওয়ালার ভগ্নীপতি আমার মক্কেল। ভদ্রলোক মোক্তার। মাছটি আবার তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের আঙুলগুলি অতিশয় মমতার সহিত মাছটির পেটে বুলাইয়া কহিলেন, পেট দেখছেন, ডিমে টইটুম্বুর। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজারে আর আছে মাছ? ভদ্রলোক মাথাটি একবার এপাশে একবার ওপাশে নাড়িয়া কহিলেন, খুব সম্ভব নেই। ভুরু নাচাইয়া চোখ দুইটা চাড়াইয়া কহিলেন, থাকবে কি ক'রে মশায়! দুশো লোক মুখিয়ে ছিল, মাছের ঝাঁকা নামাতে না নামাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব সাবাড়। মাছ খেতে না পেয়ে সবাই যেন হন্যে হয়ে উঠেছে। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলাম, সত্যি বলছেন, একেবারে নেই!

ভদ্রলোক ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, মিথ্যে ব'লে লাভ? বিশ্বেস না হয়, গিয়ে দেখুন। চলিবার উপক্রম করিতেই ভদ্রলোক হাত ধরিয়া থামাইয়া কহিলেন, দেখুন বাজারে পাবেন না নিশ্চয়। তবে এক কাজ করতে পারেন। মাছ বাজারে আসতে না আসতেই জেলেরা আদ্ধেক সরিয়ে নেয়। যদি জেলেপাড়া যেতে পারেন, তা হ'লে একটা-আধটা পেতেও পারেন। তবে দর সুবিধে পাবেন না। তা না হোক, মাছ তো পাবেন।

তাই করিগে।—বলিয়া আবার চলিবার উপক্রম করিতেই ভদ্রলোক কাঁধে হাত দিয়া থামাইয়া কহিলেন, কিসের দরই বা সুবিধে মশায়? আলু আড়াই টাকা সের; বেগুনের সের বারো আনা; ঝিঙের মত জিনিস, তাও এক সের কিনতে যান, আটটি গণ্ডা পয়সা গুনে দিতে হবে। বাঁচবেন কি খেয়ে বলুন? আর বেঁচে আছি ব'লেও তো বিশ্বাস হয় না; মাঝে মাঝে নিজেকে চিমটি কেটে দেখি।—বলিয়া আমাকে একটি চিমটি কাটিবার উপক্রম করিতেই সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, সত্যি, যা বলেছেন। আচ্ছা, চলি, দেখি একটু চেষ্টা ক'রে। ভদ্রলোক কহিলেন, আচ্ছা, আসুন। যা বললাম, তাই করুন গিয়ে।

মাছের বাজারে গিয়া দেখিলাম, ভিড় একেবারে নাই। জনকয়েক লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খুব সম্ভব মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে; একটু দূরে কতকগুলো লোক জড়ো হইয়া কি কিনিতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাছ কি পাওয়া যাবে না? লোকটা কহিল, কোথায় পাবেন মাছ? সে আসতে না আসতেই সাবাড়, তবে আঁশ পোটা কিনতে চান তো যান ওখানে।—বলিয়া নাক উঠাইয়া অদূরবর্তী জনতাকে নির্দেশ করিল। একজন কহিল, আপিসে যদি চাকরি-বাকরি করেন তো মাছের আশা ছেড়ে দিন। বেলা তিনটে থেকে

যদি এখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে থাকতে পারেন, তবেই মাছ পাবেন, না হ'লে—। বলিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া বক্তব্য শেষ করিল। আর একজন কহিল, আর যদি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হন, ছোটখাটো হাকিমও হন, নেহাতপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হন, তা হ'লে আর বাজারে আসতে হবে না কষ্ট ক'রে, বাড়িতে ব'সেই মাছ পাবেন। আর একজন কহিল, সত্যি। ওদের বোধ হয় কোন অসুবিধেই নেই; না হ'লে লোকের এত কষ্ট দেখেও তো গা-গোছ নেই কারও! ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব'সে ব'সে মজা দেখছে সব। একজন উপদেশ দিল, হাতে পয়সা যদি বেশি থাকে তো জেলেপাড়ায় গিয়ে দেখতে পারেন।

ইহাই চিন্তা করিতে কারিতে চলিয়া আসিলাম। জেলেপাড়া অনেক দূর। এমন সময়ে সেখানে যাওয়া ঠিক হইবে কি? অথচ খালি হাতে বাড়ি ফিরিতেও সাহস হইতেছে না। গৃহিণীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? এত আশা করিয়া পাঠাইয়াছেন। একে তো মেজাজ এমনিই আগুন হইয়া আছে, তাহাতে ইন্ধন যোগানো নিরাপদ হইবে না।

পায়ে পায়ে কতকটা আগাইয়া আসিতেই একটা গলির মুখে দেখিলাম, একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সামনের দোকানে ডে-লাইট জ্বলিতেছে, তাহারই আলো মেয়েটির মুখে গায়ে পড়িয়াছে। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হইবে না; ঈষৎ স্থূলাঙ্গী; মোটামুটি সুন্দরী; চোখ দুইটি ডাগর, কথা বলিবার সময়ে ঢুলাইবার চেষ্টা করিতেছে; পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, সামনে পাতা-কাটা, মাথায় উবুঝুঁটি; দুই কানে সোনার টোপ; হাতে একহাত করিয়া ঝলমলে সোনার (আসল, না, কেমিক্যাল, কে জানে!) চুড়ি। এই কণ্ট্রোলের দিনেও পরনে পুরা মাপের মিহি শাড়ি।

মেয়েটির হাবভাব ভাল নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি কহিল, কি গো বাবু, কি চান? চমকিয়া উঠিলাম। মেয়েটি কি ভাবিয়াছে আমাকে? আমি একজন ভদ্রলোক, বিশেষ করিয়া শিক্ষক, গৃহিণীর কৃপায় হাতে থলি উঠিয়াছে বলিয়া আমার চালচলন এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাকে এই ধরনের সন্দেহ! মুখ ফিরাইয়া ভারী গলায় কহিলাম, কিছু না। মেয়েটি একগাল হাসিয়া কহিল, আমাদের বাবু যে! দুই পা আগাইয়া আসিয়া মুখ-চোখ ঘুরাইয়া আবদারের সুরে কহিল, আমাকে চিনছেন না বাবু? আমি আপনাদের গুরুদাসীর মেয়ে হরিদাসী। পুরনো খদ্দের আপনি আমার; আগে এলে আমার কাছ ছাড়া কোথাও দাঁড়াতেন না পর্যন্ত। অনেক দিন আসেন নি কিনা, তাই ভুলে গেছেন।

সামনের লোকটা মুখের চেহারা গম্ভীর করিয়া তুলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল। ভয় পাইয়া কহিলাম, আমি তো—আমি তো আসি না কখনও, আজই এসেছি মাছ কেনবার জন্যে। মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, মাছের কথাই তো বলছি বাবু। আপনি আবার কি কেনবার কথা ভাবছেন?—বলিয়া লোকটার দিকে কটাক্ষ করিতেই লোকটা হাসিয়া কহিল, তাই বলুন। মেয়েটি কহিল, মাছ চাই নাকি আপনার? তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে। ঘরে মাছ আছে আমার, টাটকা মাছ, এখনও ধড়ফড় করছে।

মেয়েটির পিছনে পিছনে চলিলাম। লম্বা সরু গলি, অন্ধকার। মেয়েটি হনহন করিয়া চলিল, আমিও যথাসাধ্য তাহার পাছু পাছু চলিলাম।

মনে হইতে লাগিল, কাজটা ভাল হইতেছে কি? মেয়েটির হাবভাব ভাল নয়; কোথায় লইয়া যাইতে কোথায় লইয়া গিয়া

উঠাইবে! সঙ্গে অবশ্য টাকাকড়ি বেশি নাই, কিন্তু লোকে দেখিলে কি বলিবে? আমি যে মাছের জন্যই উহার পাছু পাছু ধাওয়া করিতেছি, তাহা কি কেহ বিশ্বাস করিবে?

একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম, মেয়েটি মুখ ফিরাইয়া কহিল, আসুন, আর একটু গেলেই আমাদের পাড়া। একটু থামিয়া দাঁড়াইতেই সঙ্গ লইলাম। মেয়েটি ঢিমা তালে চলিতে লাগিল, কহিল, কি ভাবছেন অত? সঙ্গে যেতে ভয় করছে বুঝি? ভয় কিসের? অতবড় জোয়ান লোক আপনি। মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, তা ছাড়া কতদিনের চেনা, আপনি 'চিনি না' বললে আমি শুনব কেন? মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, নীরস কণ্ঠে কহিলাম, ভয় কিসের? তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিনা! মেয়েটি কহিল, আমার তো আর দোষ নেই, নিজেই দেরি ক'রে এসেছেন; গিন্নী রাগ করেন তো বুঝিয়ে বলবেন।

বড় রাস্তা পার হইয়া আর একটা গলিতে ঢুকিলাম, এবং আরও কতকটা গিয়া জেলেপাড়ায় পৌঁছিলাম। একটা পুকুরের চারিপাশে জেলেদের বস্তি। পুকুরের পাড়ে কয়েকটা জাল শুকাইতেছে। একটা ঘরের বাহিরের দাওয়ায় জনকয়েক লোক গোল হইয়া মুখোমুখি বসিয়া খুব সম্ভব গাঁজা খাইতেছে। মেয়েটির সঙ্গে আমাকে যাইতে দেখিয়া একজন হাঁক দিয়া কহিল, কে র্যা হরিদাসী? মেয়েটা খনখন করিয়া জবাব দিল, কে আবার? আমাদের এক বাবু, পুরনো খদ্দের, মাছ কিনতে এসেছে। লোকটা কড়া গলায় কহিল, দর কম করিস না ব'লে দিচ্ছি, যে বাবুই হোক, ভারি তে পেয়ারের বাবু! আর একজন লোক শ্লেষের স্বরে কহিল, রাতের বেলায় মাছ কিনতে এসেছে! আর একজন এতক্ষণ কাশিতেছিল

কাশির টানেই কহিল, মাছ কিনতে এসেছেন, না, আর কিছু! বজ্জাত মাগীগুলো যা-তা শুরু করেছে পাড়ায়।

মাথা নীচু করিয়া পার হইয়া গেলাম। অপমানে সারা মন জ্বলিতে লাগিল। গৃহিণীর যেমন কাণ্ড! দিন কয়েক মাছ খাইতে না পাইয়া একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবিতেছেন, আয়তির আয়ুটুকু ফুরাইয়া আসিল বলিয়া! তবু পাড়ার অন্য মেয়েদেরও একই অবস্থা বুঝিয়া এতদিন কোনমতে সহ্য করিতেছিলেন; আজ অন্য সকলের মৎস্যপ্রাপ্তির সংবাদ শোনা অবধি আর ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না।

মেয়েটি হাসিয়া কহিল, কি সন্দেহ করছে দেখছেন? রাত ক'রে এসেছেন কিনা! এত রাত্রে মাছ কিনতে কেউ আসে না এ পাড়ায়। কহিলাম, আর কত দূর তোমাদের বাড়ি, বল দেখি? মেয়েটি মুখের ইঙ্গিতে কহিল, ওই যে।

বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মেয়েটি কহিল, ভেতরে আসুন না। আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, হরিদাসী গরিব হ'লেও শহরের অনেক বড় বড় লোকের পায়ের ধুলো পড়ে তার ঘরে, আপনার লজ্জা কিসের? কথার ধরন দেখিয়া গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল; কিন্তু কথা-কাটাকাটি করিতে ইচ্ছা হইল । নীরবে তাহার পাছু পাছু গিয়া উঠানে দাঁড়াইলাম।

বাড়িটি নেহাত ছোট, পাশাপাশি দুইটি কুঠুরি, সামনে এক টুকরা উঠান। উঠানে পা দিতেই ঘরের ভিতর হইতে একটা বুড়ী কাঁপা গলায় ডাক দিল, কে র‍্যা? দাসী? এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি লা?—বলিয়া টানিয়া টানিয়া কাশিতে লাগিল! হরিদাসী ফিসফিস করিয়া কহিল, মা, কেশো রুগী, সারারাত জেগে ব'সে থাকে আর

কাশে, আর কেউ এলেই হাঁক পাড়ে—কে এল লা। কারও ঘরে আসবার যো নেই বুড়ীর জ্বালায়। তা আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, আমি মাছ আনছি।—বলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আমি একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। অন্ধকার ইহার মধ্যে বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের পিছনে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ। গাছের মাথায় অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। একটা বাদুড় সোঁ-সোঁ শব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া সশব্দে গাছের ডালে ঝুলিয়া পড়িল। ইহার মধ্যে আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছে নিশ্চয়ই। তাহাদের ফল খাওয়ার শব্দ, ডানা ঝাপটানোর শব্দ ও মাঝে মাঝে পরস্পর কলহের শব্দ শোনা যাইতেছে। পাড়ার কয়েকটা কুকুর একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া সুরের কারিগরি করিয়া চুপ করিল। হরিদাসী এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? মাছ তো বাড়িতে মজুত আছে, এত দেরি হইবার কারণ কি? মনে মনে ভয় হইতে লাগিল। হরিদাসী বলিয়াছে, শহরের অনেক বিশিষ্ট লোকের আনাগোনা আছে তাহার বাড়িতে। এ সময়ে কেহ আসিয়া পড়িয়া আমাকে এ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর যাহাই করুক, প্রশংসা করিবে না।

হরিদাসী ফিরিয়া আসিল। ডান হাতে একটি ডিবরি, বাম হাতে পাতায় সযত্নে মোড়া একটি মাছ। কাছে আসিয়া কহিল, থলির মুখটা একটু খুলুন, আমি রেখে দিই। আপনি আবার হাত দেবেন কেন? থলির মুখটা খুলিয়া হরিদাসীর সামনে ধরিতেই, সে থলির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া মাছটি রাখিল। এই সময়ে তাহার হাতের সঙ্গে আমার হাত ঠেকিল। হাতটি বাহির করিয়া লইয়া হরিদাসী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

সেই স্পর্শে, সেই হাসিতে বুকের ভিতরটায় দাপাদাপি শুরু হইল। কণ্ঠে স্বর ফুটিতে চাহিল না; গলা ঝাড়িয়া কোন মতে কহিলাম, দাম? হরিদাসী মিষ্ট হাসিয়া কহিল, দাম তো জানেন, গোটা সাত সিকে সের, কাটা দু টাকা। বুকের দাপাদাপি এক মুহূর্তে বন্ধ হইয়া গেল; বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি! শুনেছি সস্তা। হরিদাসী গম্ভীর হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ মৃদু কণ্ঠে কহিল, ভুল শুনেছেন, মাছ বোধ হয় অনেক দিন কেনেন নি। অপ্রতিভভাবে কহিলাম, বেশ, কত দাম হবে বল? হরিদাসী কহিল, মাছটা এক সেরের চেয়ে কিছু বেশি, তা পুরনো খদ্দের আপনি; আপনার সঙ্গে চুল-চেরা হিসেব করা কি চলে, আপনি সাত সিকেই দিন।—বলিয়া বাম হাতটি পাতিল।

আমি টাকা দুইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে টাকা-সুদ্ধ হাতটি সরাইয়া লইয়া কহিল, খুচরো পয়সা তো আমার কাছে নেই। আপনি যেদিন ইচ্ছে বাজারে এসে নিয়ে যাবেন। তারপর চোখ ঘুরাইয়া, মনোমোহিনী হাসি হাসিয়া, আবদারের সুরে কহিল, আর যদি বলি, এমন অসময়ে টাটকা মাছ দিলাম, বাকি পয়সাটা বকশিশ দিয়ে যান, আপনি কি না দিয়ে পারবেন?

পয়সা ফেরত পাইবার আশা ত্যাগ করিলাম। বুঝিলাম, হাসি চাহনি ও স্পর্শের ফাউ দিয়া হরিদাসী মাছের ন্যায্য দামের দ্বিগুণ এবং তদুপরি বাকি পয়সাগুলি আত্মসাৎ করিয়া লইল। তবু বদান্যতা দেখাইবার জন্য কহিলাম, বেশ তো, দিলাম বকশিশ। হরিদাসী এক গাল হাসিয়া কহিল, আপনাদের মত বাবু সহজে জোটে! আমার কত ভাগ্যি!

বুড়ী হাঁক দিল, এতক্ষণ কার সঙ্গে গ্যাজর-গ্যাজর করছিস লা?

হরিদাসী খনখন করিয়া কহিল, কার সঙ্গে আবার? মাছ কিনতে

এসেছে, আমাদের সেই—(আমাদের পাড়ার নাম করিয়া) —পাড়ার বাবু ; তোর মনে নেই ?

বুড়ী কহিল, তা দিয়ে দে মাছ ; এত গল্প কিসের ? হরিদাসী চোখ-মুখ কুঁচকাইয়া রাগের ভঙ্গীতে কহিল, অ্যাঁ মরণ ! আমার দিকে তাকাইয়া নাকী সুরে কহিল, দেখুন না ! তারপর কণ্ঠস্বর তুলিয়া কহিল, গপ্প কে করছে ? দাম নোব না ? বুড়ী বলিতে লাগিল, দাম নিবি বইকি। আজকালকার মাছ, হীরে-জহরতের চেয়েও বেশি, দাম নিবি না কেন ?

চলিয়া আসিবার সময়ে হরিদাসী দরজা পর্যন্ত পাছু পাছু আসিল, এবং রাস্তায় নামিতেই কহিল, দরকার হ'লেই আসবেন বাবু। ভুলবেন না।

২

বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী কহিলেন, হ্যাঁ গা, এত দেরি হ'ল ? তিনবার চায়ের জল চড়ালাম, নামালাম ; রুটি ঠাণ্ডা কাঠ হয়ে গেল ? কোথায় গিয়েছিলে ? মাছ পেয়েছ ? জবাব দিলাম না। এমন একটা দুরূহ কার্য-সিদ্ধির জমাট গাম্ভীর্যকে দুই-চারিটা ফাঁকা কথায় হালকা করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল না। গৃহিণী রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া পরদিন সকালের জন্ত তরকারি কুটিয়া রাখিতেছিলেন ; তাঁহার সামনে থলিটা নামাইয়া দিয়া মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে জানাইলাম, আনিয়াছি, খুলিয়া দেখিতে পার। গৃহিণী কহিলেন, দেখে শুনে এনেছ তো ? মেছুনীরা যে চোরনী, দরে বা ওজনে ঠকায় নি তো ? অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলাম, আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ নাকি ? বাজার যাই

না তাই, না হ'লে বাজার যা করতে পারি, তোমাদের গজুবাবুও (গজুবাবু একজন প্রতিবেশী, ভাল বাজার করার জন্য পাড়ায় অত্যন্ত সুনাম) তা পারবেন না, কলেজের মেসে থাকতে আমার নাম ছিল। গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, ও তো অনেক বার শুনেছি, দেখে যাওয়া আর ভাগ্যে ঘটল না।

গৃহিণীর কথায় ও হাসিতে পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। মেয়েদের কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। ভাবিতেছে, বাজারে পা দিবামাত্র মাছ আপনা হইতে লাফাইয়া আসিয়া থলির মধ্যে ঢুকিয়াছে। এই অন্ধকার রাত্রে কেমন করিয়া যে মাছটি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, ফলাও করিয়া বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; কহিলাম, বাজারে যা ভিড়, সেখানে নাক গলাবারও কারও সাধ্য নেই। এই প্রসঙ্গে মোক্তারবাবুর বর্ণনাটি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলিয়া চালাইয়া দিয়া কহিলাম, বাজারে মাছ পাওয়া যায় নি; জেলেপাড়ায় গিয়ে আনতে হয়েছে। গৃহিণী কৃত্রিম বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, ওমা! তাই নাকি? মনে মনে কহিলাম, হাঁ, তাই। বাড়িতে বসিয়া বসিয়া হুকুম করিয়া দিলেই হয় না, হুকুম তামিল করা বড় শক্ত। তারপর জেলেপাড়ায় অভিযান সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। বলা বাহুল্য, হরিদাসীর কথাটা গোপন করিলাম। শেষে মোক্ষম মার দিয়া কহিলাম, তুমি যখন খেতে চেয়েছ, তখন মাছ যেমন ক'রে হোক আনবই ঠিক করেছিলাম। গৃহিণীর মুখে সন্তোষের হাসি ফুটিয়া উঠিল, আমার মুখের দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া কহিলেন, বল কি? শুনেও সুখ! তা মাছটা বার কর না, দেখি। কহিলাম, রেণুকে (বড় মেয়ে) ডাক, ও-ই বার করুক, আমি আর হাত দেব না, মানে—হাত ধুয়েছি

কিনা! জেলেটি লোক ভাল; হাত ধুতে জল পর্যন্ত দিলে, ওর ছেলে আবার আমার স্কুলের ছাত্র।

গৃহিণী রেণুকে ডাক দিলেন। আমিও ডাক দিলাম এবং কহিলাম, মাছটা বার ক'রে দিয়ে যা তো। বাসনা—শুধু রেণু নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাই দুইটিও আসুক এবং সকলে তাহাদের বাবার কৃতিত্ব দেখিয়া পিতৃভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠুক।

রেণু আসিল, ছেলে দুইটিও লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া হাজির হইল; মুখে হাসি আর ধরিতেছে না। মাছ, বিশেষ করিয়া ইলিশমাছ, বাঙালীর বড় লোভের বস্তু। এ লোভ বাঙালীর মজ্জায় মজ্জায় জমিয়া আছে। বাঙালী সব ছাড়িবে, কিন্তু মাছ খাওয়া কখনও ছাড়িতে পারিবে না, তা যাহার নাসিকা যতই কুঞ্চিত হইয়া উঠুক। তাহা ছাড়া মাছের সঙ্গে বাঙালীর বাঙালীয়ানা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যে বাঙালী মাছ খায় না, সে মহাপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী নয়। যাহাদের কারসাজিতে এই মাছ বাংলা দেশে দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বাঙালীর শত্রু।

রেণু থলি হইতে মাছ বাহির করিতে লাগিল, ছেলে দুইটি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাঁটুর উপরে হাত রাখিয়া একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল। ছোট ছেলেটি কহিল, বাবা, ডিম আছে? মোক্তারবাবুর কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম, হ্যাঁ, একেবারে টইটুম্বুর।

রেণু পাতায় মোড়া মাছটি থলি হইতে বাহির করিতেই গৃহিণী আগাইয়া আসিলেন। পাতার মোড়ক খুলিয়া ফেলিয়া রেণু মাছটি হাত দিয়া টিপিয়া কহিল, মাছটা তো ভাল নয় বাবা। গৃহিণী আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, তাই নাকি? আমার দিকে জলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তা আমি আগেই জানি। ছেলে দুইটিও

মুখ শুকনা করিয়া আমার দিকে তাকাইল, দৃষ্টিতে ক্ষোভ ও ভৎর্সনা। বলিয়া উঠিলাম, পাগল! টাটকা মাছ। রেণুর উদ্দেশে কহিলাম, কিচ্ছু জানে না। যা-তা ব'লে দিলেই হ'ল! রেণু মাছটি দুই হাতে তুলিয়া নাকের কাছে আনিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, অ্যাঁ, একেবারে পচা। ভাইদের কহিল, তোরা শুঁকে দেখ্। ছেলে দুইটি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া শুঁকিয়াই ছিটকাইয়া পড়িয়া কহিল, ওরে ব্বাবা! যা গন্ধ!

গৃহিণীর মুখে কালবৈশাখীর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। চাপা গর্জন করিয়া কহিলেন, কত দাম দিয়েছ, শুনি? ভয়ে ভয়ে কহিলাম, দু টাকা; অনেক দূর থেকে আমদানি কিনা, একটু গন্ধ হয়তো হতে পারে; পচা নয়, তুমি দেখ। গৃহিণী দুই ঠোঁট চাপিয়া, আর একটু আগাইয়া আসিয়া মাছটির গায়ে আঙুল দিয়া টিপিতেই আঙুল বসিয়া গেল। গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, একেবারে পচা থসথসে হয়ে গেছে। কতদিনের পচা মাছ, কে জানে! আমার দিকে তাকাইয়া ভৎর্সনার সুরে কহিলেন, ছিঃ ছিঃ, দু টাকা খরচ ক'রে এই মাছ তুমি ঘরে নিয়ে এলে! মেয়েকে কহিলেন, একটু সর্। মেয়ে সরিয়া দাঁড়াইতেই মাছটি তুলিয়া উঠানে ফেলিয়া দিলেন।

আমার দেশী কুকুরটি সকলের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হইয়া, অদূরে পিছনের পা দুইটির উপর ভর দিয়া বসিয়া, সোৎসুক নয়নে তাকাইয়া থাকিয়া এতক্ষণ লেজ নাড়িতেছিল। মাছটি তাহার সামনে পড়িতেই লাফাইয়া আসিয়া, মাছে দাঁত বসাইয়াই শশব্যস্তে ফেলিয়া দিল এবং দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া অপ্রতিভ মুখে আবার লেজ নাড়িতে শুরু করিল। গৃহিণী কহিলেন, কুকুরেও খাবে না ও-মাছ। তারপর তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত কহিলেন, ছিঃ ছিঃ, মানুষ, না, কি!

বড ছেলেটি মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিল, বাবার কাণ্ড তো! যা দিয়েছে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। একটু দেখতে শুনতে গেলেই তো ও-গন্ধ নাকে ঢুকত। গৃহিণী নাকী সুরে কহিলেন, তোরা দেখ্, বলিস যে সব! রেণুকে কহিলেন, সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেল্‌গে যা। কিন্তু মাছটা উঠোনে প'ড়ে থাকলে দুর্গন্ধে ঘরে টেকা যাবে না যে! ওটা ফেলবে কে? ছোট ছেলেটি কহিল, বাবাই ফেলুন, উনি এনেছেন।

রেণু কহিল, আমিই ফেলে দিচ্ছি মা। গৃহিণী কহিলেন, তাই দে, ওঁকে আর কিছু করতে ব'লে কাজ নেই। আমারই ঘাট হয়েছে, ছিঃ ছিঃ, পুরুষমানুষ যে এমন অপদার্থ হয়, জানতাম না! ছেলেদের কহিলেন, যা পড়্‌গে যা। কি করবি? তোদের অদেষ্ট। যেমন লোকের ঘরে জন্মেছিস! ছেলেগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিতে লাগিলেন, আর এখনই হয়েছে কি? আমি যদি চোখ বুজি, হাড়ীর হাল হবে তোদের, আমি ব'লে দিচ্ছি। তারপর, সেই পুরাতন খেদ—পূর্বজন্মের বহু দুষ্কৃতির ফলে, আমার মত অকৃতীর হাতে পড়িয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; না মরিলে নিষ্কৃতি নাই, অথচ ছেলেমেয়েদের জন্যই মরিবারও উপায় নাই।

আমি প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনে মনে হরিদাসীর মুণ্ডপাত করিতে লাগিলাম। গৃহিণী কহিলেন, আর দাঁড়িয়ে থেকে কি কেতাথ করবে? হাত-পা ধুয়ে ফেলে চা-খাবার খাও। ঘাট হয়েছে আমার, আর কখনও কিছু আনতে বলব না।—বলিয়া হাত ধুইবার জন্য জলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমি সরিয়া আসিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম, তারপর সন্তর্পণে বাড়ির বাহির হইয়া গেলাম।

৩

মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিবাহের পর সংসার-আশ্রমের শুরু হইতেই গৃহিণীকে কোনদিন কোনও কাজে প্রসন্ন করিতে পারি নাই। যাহাই করিয়াছি, তাহাতেই ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া টাকা রোজগার করিয়াছি, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছি, কিন্তু প্রশংসাবাদ কোনদিন পাই নাই। চিরদিন একই কথা শুনিয়া আসিয়াছি—অপদার্থ, অকর্মা। ছেলেমেয়েগুলিও মায়ের সুর ধরিয়াছে। উহারা কি আমাকে কোনদিন শ্রদ্ধা করিতে পারিবে? পৃথিবীতে সকলেই বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছে, আমার মত নিত্য অপমান ও গঞ্জনা কয়জনকে সহ্য করিতে হয়?

অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, তৃষ্ণাও। হাতে পয়সা নাই যে, কোন দোকানে গিয়া চা-খাবার খাইয়া আসিব। একমাত্র ভরসা আছে, সুরেশের বাড়ি। সেখানে গেলেই সুরেশের স্ত্রী এক কাপ চা তো দেয়ই, সঙ্গে খাবারও থাকে।

সুরেশ আমার ছাত্রাবস্থার বন্ধু; একসঙ্গে বরাবর কলেজে পড়িয়াছি। এখন সে এই শহরে চাকুরি করিতেছে; একটি নামজাদা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তাহার শ্বশুর কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। কাজেই তাহার বেতন মাসে তিন শো টাকা, তদুপরি বাড়িভাড়া। সুরেশের স্ত্রী সুন্দরী ও শিক্ষিতা; বি. এ. পাস, সুশীলাও বটে। সুরেশ স্ত্রীর প্রশংসায় অহরহ পঞ্চমুখ। প্রশংসার যোগ্য বটে। মহিলাটির যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনই সুমিষ্ট ব্যবহার। হাব-ভাবে, কথা-বার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, সাজ-সজ্জায়,

একটি উঁচু ধরনের সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। যাহার সহিত সংস্পর্শে আসে, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রভায় তাহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তুলে। স্বামী-স্ত্রীর মিলও খুব গভীর, দুইজন দুইজনকে দেখিতে দেখিতে গলিয়া যায়। দেখিয়া আনন্দ হয়, নিজেদের কথা ভাবিয়া ঈর্ষাও হয়।

সুরেশের বাড়ির সামনে আসিয়া হাজির হইলাম। বাড়িটি দোতলা; উপরে নীচে দুইটি করিয়া ঘর। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বাহিরের রোয়াকে ভৃত্য ভূতনাথ দাঁড়াইয়া। আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, নমস্কার বাবু, এমন সময়ে? কহিলাম, সাহেব বাড়িতে আছেন নাকি?

ভূতনাথ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওপরে আছেন।

সহসা তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলার ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনিতে পাইলাম, শাট আপ। একটি কথা বলবে না; তা হ'লে এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের কর্কশ কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জন, আই কেয়ার দিস মাচ। যেখানে ইচ্ছে যাও।

মেয়েলী কণ্ঠ তারার পর্দায় উঠিয়া কহিল, কি? তা বলবে বইকি! ভ্যাগাবণ্ড থেকে ভদ্রলোক বনেছ কিনা, তাই এত মেজাজ। আন্‌গ্রেট্‌ফুল ডগ!

পুরুষ-কণ্ঠ প্রচণ্ড রোষে ফাটিয়া পড়িল, শাট আপ। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! মেয়েমানুষের আবার মেজাজ! ভিক্সেন, ভ্যাম্পায়ার, বিচ!

নারীকণ্ঠ সমান পর্দায় প্রত্যুত্তর দিল, সাস্‌পিসাস সোয়াইন! ভিলিফাইং ভিলেন!

পুরুষ-কণ্ঠ সগর্জনে কহিল, ক্যাট! ভাইপার!

দুই ঘরে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করার শব্দ। এক ঘরে ঝনঝন

শব্দে কাচের গ্লাস ভাঙিল, আর এক ঘরে সশব্দে চেয়ার উল্টাইল। এক ঘরে মেয়েলী কণ্ঠের চাপা ক্রন্দনধ্বনি, আর এক ঘরে পুরুষ-কণ্ঠের চাপা তর্জন।

আকাশ হইতে পড়িলাম। সুরেশ পুরুষমানুষ, ঝগড়া করা তাহার পক্ষে আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, অশোভনও নয়। কিন্তু সুরেশের স্ত্রীর মত মহিলা, যাহাকে দেখিলে মূর্তিমতী ছন্দোময়ী কবিতা বলিয়া মনে হয়, আলাপে আলোচনায় যাহার মৃদু মোলায়েম কণ্ঠস্বর হইতে মধু চোয়াইয়া পড়ে, যাহার হাসি হইতে মুক্তা ঝরে, যাহার গান শুনিলে ক্ষণিকের জন্য হৃদয় অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়, সেও ঝগড়া করে, এবং তূণ হইতে এমন বাছা বাছা চোখা চোখা শর বাহির করিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতে পারে, নিজের কানে না শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। ফিসফিস করিয়া ভূতনাথকে কহিলাম, কি ব্যাপার? ভূতনাথ চাপাগলায় কহিল, ঝগড়া হচ্ছে দুজনে। আশ্বাসের সুরে কহিল, ও সব বাড়িতেই হয় বাবু। অনেক বাড়িতে চাকরি করলাম, কোথাও না-হওয়া দেখলাম না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, তা ঝগড়াটা মিটবে কখন? ভূতনাথ কহিল, আজ তো নয়ই, কালও সারা দিনরাত থমথমে থাকবে, পরশুদিন পরিষ্কার হবে।

তা ভাল। তা হ'লে চলি।—বলিয়া রোয়াক হইতে নামিয়া আসিলাম। ভূতনাথ আমার পাছু পাছু নামিয়া আসিয়া কহিল, নমস্কার বাবু, আসুন তা হ'লে। আলো-টালো আনেন নি, দোব একটা? বাধা দিয়া কহিলাম, না না, থাক্।—বলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াই, পরের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তথ্য জানিবার জন্য মানুষের চিরন্তন দুষ্প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আবার থামিয়া কহিলাম, হ্যাঁ.

হে, ঝগড়ার কারণটা কিছু জান? ভূতনাথ এতক্ষণ এই কথা বলিবার জন্যই উসখুস করিতেছিল, সাগ্রহে কহিল, জানি বাবু। শুনুন তবে। সাহেব তো ঘোষ সাহেবের বাড়ি রোজ বিকেলে টেনিস খেলতে যান, মেমসাহেবের তাতে আপত্তি, ঘোষ সাহেবের মেমসাহেব নাকি লোক ভাল নন। আর ইদিকে আমাদের মেমসাহেব রোজ হালদার সাহেবের বাড়ি বেড়াতে যান, হালদার সাহেবের বোন তাঁর বন্ধু। হালদার সাহেব তো বিয়ে-টিয়ে করেন নি, বাজারে সুনামও বেশ নেই। আমাদের সাহেবের তাতেই আপত্তি। দুজন দুজনকে মানা করেন, কেউ কারও কথা শোনেন না। আজ আমাদের মেমসাহেব বাড়িতে ছিলেন, সাহেব গিয়েছিলেন খেলতে। কোন্ এক হাকিম সাহেবের মেমসাহেব এসে আমাদের সাহেবের সম্বন্ধে কি সব ব'লে গেছেন। সাহেব ফিরে আসবার পর, খাবার টেবিলে মেমসাহেব কথাটা পাড়লেন, সাহেবও কি বললেন, দু-চার কথার পরই তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। তারপর পরম পরিতোষের সহিত কহিল, অনেক বাড়িতে অনেক রকমের ঝগড়া দেখেছি বাবু, কিন্তু এমন কখনও দেখি নি।

বাড়ির দিকে চলিলাম। মনের জ্বালা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে। কেমন করিয়া, কোথা হইতে মন যেন সান্ত্বনা পাইয়াছে।

নব-পরিচয়

যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সামাজিক পরিচয়টা নেহাত মন্দ ছিল না। বেসরকারী স্কুলের হেডমাস্টার। মাসিক আয় 'আহা' 'উহু' করিবার মত না হইলেও সাধারণ বাঙালীর তুলনায় কম নয়। গাড়ি-বাড়ি করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সস্তা-গণ্ডার বাজারে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া সংসার চালাইয়া আসিয়াছি। বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তার-দোকানদার, ধোপা-নাপিত, ঝি-চাকর ইত্যাদি সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে যাহাদের সম্পর্ক ও সংসর্গ অপরিহার্য, সকলেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত। কারণ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সামাজিক স্তর-বিন্যাসের এখানে-সেখানে একটু-আধটু ভাঙা-চোরা ঘটিলেও আসল কাঠামোটা ঠিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রবল আলোড়নে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। আমরা, মধ্যবিত্তেরা, যাহারা এতদিন সমাজদেহের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিলাম, ছিটকাইয়া পড়িলাম। যাহারা উপরে ছিল, তাহারা আরও উপরে উঠিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। যাহারা নীচে ছিল, তাহারা উপরে উঠিল। আমরা ক্রমে দুঃখ-দৈন্যের ভারে নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। ফলে যাহাদের সঙ্গে প্রতিদিনের পরিচয় ছিল, তাহারা একে একে ছাড়িয়া গেল।

পাড়ার রাঘব সরকার সরকারী কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। এঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, সরকার ও অফিসের কেরানী, সকলের ক্ষুধা মিটাইয়া বৎসরে যাহা ঘরে তুলিতেন, তাহাতেই শহরে দোতলা বাড়ি তুলিয়াছিলেন এবং মফস্বলে ছোট-খাটো জমিদারি কিনিয়াছিলেন। পুরাতন একখানি ফোর্ড গাড়িও ছিল তাঁহার। তাহাতে চড়িয়া

তাঁহার সালঙ্কারা গৃহিণী ও পুত্র-কন্যারা দামি কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইত। মোট কথা, পাড়াতে একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাহা হইলেও রাঘববাবু লোক মন্দ ছিলেন না। সকলের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁহার। বিশেষ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মান করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় বসিতেন। আমি নিয়মিতভাবে সেখানে হাজিরা দিতাম ও চা-সিগারেট খাইতাম। ক্রমে এমনই একটি সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল আমাদের মধ্যে যে, কোনদিন না গেলে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার অসুখ-বিসুখ হইলে নিজে আসিয়া আমার শয়নকক্ষে আড্ডা জমাইতেন। সময়ে অসময়ে সাহায্যও করিতেন। গৃহিণী স-পুত্র-কন্যা সিনেমা যাইবার বায়না ধরিয়াছেন; টিকিটের মূল্য ও গাড়ি-ভাড়া একত্রে খরচটা মারাত্মক; রাঘববাবুকে ঠারে-ঠোরে ব্যাপারটা জানাইতেই তিনি নিজের গাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। রাতদুপুরে গৃহিণীর কলিক-পেন চাড়া দিয়া উঠিয়াছে; রাঘববাবুর দ্বারস্থ হইলাম; তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের সরকারকে ডাক্তার ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শোবার ঘরের কড়িকাঠে ঘুন ধরিয়াছে; অবিলম্বে মেরামত না করাইলে গৃহিণী পুত্রকন্যাসমেত বাপের বাড়ি যাইবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছেন; হাতে পয়সার অভাব, অথবা হাঙ্গামা পোহাইবার ইচ্ছার অভাব; রাঘববাবুর শুধু একবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছি; রাঘববাবু তৎক্ষণাৎ অভয়দান করিয়াছেন ও লোকজন পাঠাইয়া মেরামত করাইয়া দিয়াছেন; আমি পরে সুবিধামত খরচ-পত্র দিয়াছি। এমনই ভাবে নানা সময়ে নানা রকমে তাঁহার কাছ হইতে উপকার পাইয়াছি। হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাঘববাবু মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট

লইলেন। বৎসর দুইয়ের মধ্যে ফাঁপিয়া ফুলিয়া তরতর করিয়া উপরে উঠিয়া ক্রমে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া গেলেন। আমাদের শহর আর তাঁহার পছন্দ হইল না। কলিকাতায় বিরাট অট্টালিকা বানাইয়া বসবাস শুরু করিলেন। বৎসরখানেক আগে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। বাড়ির ফটকে সঙ্গিনধারী দরোয়ান। বুঝাইয়া-শুঝাইয়া, তোষামোদ করিয়া, অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকিলাম। রাঘববাবুর ড্রয়িং-রূমেও ঢুকিবার অনুমতি পাইলাম। সুপরিসর ও সুপরিচ্ছন্ন কক্ষ; কৌচ, কেদারা, সোফা এবং আরও হরেক রকমের আসবাবপত্রে সজ্জিত। রাঘববাবুকে ঘিরিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া; তাঁহাদের বেশ-ভূষা, হাবভাব দেখিয়া মনে হইল, তাঁহারা কেউ-কেটা নন। রাঘববাবু অনেকটা বদলাইয়াছেন—আরও মোটা হইয়াছেন, কালো রঙ অনেকটা ফিকা হইয়াছে, মাথার সামনে টাক পড়িয়াছে। তবু রাঘববাবু আমাকে চিনিলেন। ফিকা হাসি হাসিয়া কহিলেন, মাস্টার মশায় যে! কখন এলেন? বসুন, সব ভাল তো? আমি জবাব না দিয়া বসিলাম। রাঘববাবু ভদ্রলোকগুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে শুরু করিলেন। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমি এখন উঠি, পরে দেখা করব। রাঘববাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, যাবেন? আচ্ছা, আসুন। বাহিরে আসিতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বুঝিলাম, রাঘববাবু শুধু উঠেন নাই, আমিও নামিয়াছি। আমাদের মধ্যে এতটা ব্যবধান যে, রাঘববাবুর সমাজে আমার পরিচয় পর্যন্ত অচল।

অভয় ডাক্তার বহুদিন ধরিয়া আমার বাড়ির ডাক্তার। চাকরি-সূত্রে এখানে আসা অবধি তাঁহার সঙ্গে পরিচয়। তখন তাঁহার তত নামডাক ছিল না। রোজগারও ছিল কম। আমাদের পাড়াতেই

একটি ছোট ডিস্পেন্সারি ছিল তাঁহার। সেইখানেই বসিতেন। আমাদের পাড়াতে নামমাত্র ফীতে সকলের চিকিৎসা করিতেন। আমার সঙ্গে ক্রমে তাঁহার বন্ধুত্ব গজাইয়া উঠে। শেষের দিকে আমার বাড়িতে ফী লইতেন না। কিন্তু যে কোন প্রয়োজনে, যে কোন সময়ে ডাকিবামাত্র আসিতেন। এমন কি, অনেক সময়ে বিনা প্রয়োজনেও আমার বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া যাইতেন। এই সময়ে শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার করালী কর হঠাৎ মারা গেলেন। অভয় ডাক্তারের কর্মক্ষেত্র প্রসার-লাভ করিতে শুরু করিল। শহরের অন্যান্য পাড়া হইতে রোগী আসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রাম হইতেও ডাক আসিতে লাগিল। ব্যবসা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য অভয় ডাক্তার শহরের মধ্যে ডিস্পেন্সারি তুলিয়া লইয়া গেলেন। তখন আর হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হইত না; অবসর হইলে ডিস্পেন্সারিতে গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম। তবে কোন প্রয়োজনে ডাক দিলে ডাক্তার নিশ্চয়ই আসিতেন। তারপর যুদ্ধ বাধিল। ঔষধ দুষ্প্রাপ্য হইল। এক টাকা মূল্যের ঔষধ দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। তা ছাড়া জমিদার, ব্যবসাদার ও চাষীদের হাতে পয়সা জমিল। ডাক্তাররা মরসুম দেখিয়া তাহাদের ফী চারগুণ বাড়াইয়া দিল। অভয় ডাক্তার বৎসরখানেকের মধ্যেই বাড়ি ও গাড়ি করিলেন। রোগীও জুটিল বিস্তর। ঝকঝকে নূতন গাড়িতে চড়িয়া অভয় ডাক্তার শহর ও মফস্বল চষিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার গৃহিণী হঠাৎ রোগে পড়িলেন। পেটে ও পিঠে বেদনা। ঔষধ-পথ্যের দাম ও ডাক্তারদের হাল-চালের কথা ভাবিয়া প্রথমে ডাক্তার ডাকিলাম না। বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শানুসারে মালিশ ও সেক চালাইলাম; কিন্তু কোন কাজ হইল না। শেষে

অভয় ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই স্থির করিলাম। এক রবিবার সকালে ডাক্তারের বাড়ি গেলাম। নূতন তৈয়ারি দোতলা বাড়ি; সামনে অনেকখানি জায়গা রেলিং দিয়া ঘেরা। দুই পাশে দুইটি গেট। বাড়ির সামনে রাস্তায় মোটর, ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্‌শার ভিড়। বাড়ির বারান্দায় অনেক লোক এলোমেলোভাবে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। কোনমতে পথ করিয়া ডাক্তারের বসিবার ঘরে ঢুকিলাম। সেখানেও বিস্তর লোক। যাহারা সুবিধা করিতে পারিয়াছে, বেঞ্চি বা চেয়ারে বসিয়াছে; যাহারা পারে নাই, দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তারের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। এক-একজন রোগী সামনে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র ডাক্তার তাহার বুকে-পিঠে এখানে-সেখানে বারকয়েক স্টেথিস্কোপ বসাইতেছেন, পেটের এপাশ-ওপাশ টিপিতেছেন, জিবটা একবার দেখিতেছেন, দরকার হইলে চোখের নীচে আঙুলের চাড় দিয়া একচোখ দেখিয়া লইতেছেন, সবসুদ্ধ পাচ-সাত মিনিটের বেশি সময় লাগিতেছে না, তারপর খচখচ করিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া টেবিলের উপরেই ছুঁড়িয়া দিতেছেন। রোগী প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটি ভক্তিভরে তুলিয়া লইয়া, ফী চার টাকা গনিয়া দিয়া, কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থম্মন্যতার হাসি হাসিয়া বিদায় লইতেছে। টেবিলে একটা ট্রের উপর টাকা জমিয়া উঠিতেছে।

এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভিড় একটু পাতলা হইলে সহসা ডাক্তারবাবুর চোখ আমার উপরে পড়িল। হাসিয়া কহিলেন, কি খবর? কতক্ষণ এসেছেন? বসুন।

একটু আগাইয়া গিয়া গৃহিণীর রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলাম। ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ শুনিয়াই কহিলেন, বুঝেছি, এক কাজ করুন, ব্লাড আর ইউরিনটা একবার দেখিয়ে রিপোর্টটা কাল আনবেন। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান ক'রে দেব।

কহিলাম, একবার গিয়ে দেখবেন না ?

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, আজকালের মধ্যে যেতে পারব ব'লে মনে হয় না, তবে—। চোখ বুজিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া, কিছুক্ষণ ভাবিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, নাঃ, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সময় হবে না ; তবে দেখুন, যাবার দরকার হবে না ; রিপোর্টটা দেখলেই সব বুঝতে পারব। ওষুধটা ব্যবহার ক'রেও যদি কোন ফল না হয় তো পরে একবার দেখে এলেই হবে। চুপ করিয়া রহিলাম। ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। ব্লাড আর ইউরিনটা আজই দেখিয়ে ফেলুনগে। নমস্কার।—বলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান একজন রোগীর প্রতি দৃষ্টিসংযোগ করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

বারান্দায় রোগীর ভিড়ের মধ্যে কোনমতে পথ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গেটের পাশেই গ্যারেজ। ডাক্তারের নূতন-কেনা ঝকঝকে মোটর গ্যারেজ হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লোক —ডাক্তারের কোন চাকর বোধ হয়—কড়া গলায় হাঁক দিয়া কহিল, দাঁড়ান, যাবেন না, গাড়ি বার হচ্ছে। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। পিছন ফিরিয়া ডাক্তারের বাড়ির দিকে তাকাইলাম। দোতলার বারান্দায় ডাক্তারের ছেলেমেয়েরা প্রভাতী আড্ডা জমাইয়াছে। পরিপুষ্ট চেহারা, পরিচ্ছন্ন পরিপাটী পরিচ্ছদ। নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বুঝিলাম, ডাক্তারও নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

বাড়িতে আসিয়া গৃহিণীকে সব পরিচয় দিলাম। গৃহিণী কহিলেন, দরকার নেই ওতে ; দশ-বারো টাকার কমে তো ওসব হবে না, কোথায় পাবে এত টাকা ? তার চেয়ে বরং সদয়বাবুকে ডাক ;

পরেশবাবুর গিন্নী বলছিল, বেশ চিকিচ্ছে করে। রামসদয়বাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। কেরানীগিরি করেন। যুদ্ধের বাজারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করিয়াছেন। ফী লাগে না ; ঔষধের দামও কম। পাড়ার গরিব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা করায়। কেহ বাঁচে, কেহ মরে। কিন্তু বাঁচা-মরা তো ভগবানের হাত, ডাক্তার নিমিত্ত মাত্র। আধ্যাত্মিকতায় আপ্লুত হইয়া উঠিলাম। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রামসদয়কে ডাকিবার জন্য বাহির হইলাম। ভগবানের কৃপাতেই হোক, বা রামসদয়ের চিকিৎসার গুণেই হোক, গৃহিণী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারপর হইতে রামসদয়ই আমার বাড়ির চিকিৎসা করিতেছেন। অভয় ডাক্তারকে ডাকিবার স্পর্ধা আর করি নাই।

পরান দে আমার অনেক দিনের পরিচিত দোকানদার। চাল ডাল নুন তেল মসলাপাতি ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় দরকারী জিনিস বরাবর সে-ই সরবরাহ করিত। বাজারের অন্যান্য দোকানের তুলনায় তাহার দোকানটি ছোটই ছিল। তবে সে নিজেই দোকান চালাইত ; এবং লাভের লোভ তাহার বেশি ছিল না। কাজেই জিনিসপত্রের দাম অন্য দোকানের তুলনায় কম হইত। তা ছাড়া খাতির করিত খুব। দোকানে গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিত, টিনের চেয়ারটি ঝাড়িয়া বসিতে দিত এবং পান ও সিগারেট আনাইয়া খাওয়াইত। কোন জিনিস তাহার দোকানে না থাকিলেও অন্য দোকান হইতে আনাইয়া বিনা লাভে সরবরাহ করিত। যুদ্ধের বাজারে চালের কারবারে মোটা লাভ করিয়া পরানের মেজাজ গেল বিগড়াইয়া। দোকানে গেলে আর নমস্কার করিত না, বসিতেও বলিত না, জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া বলিত এবং দর-কষাকষি

করিলে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া শুনাইয়া দিত জজ-ম্যাজিষ্টরের বাড়িতে এই জিনিস যাচ্ছে, এই দামই দিচ্ছেন তাঁরা ; আপনার সুবিধে না হয় তো অন্য দোকানে দেখুন।—বলিয়া অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করিত। পরানের হাব-ভাব দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতাম কিছুক্ষণ ; তারপর সুবিধামত দরের আশায় অন্য দোকানে ছুটিতাম। পরানের মতি-গতি দেখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার দোকান ছাড়িয়া দিলাম এবং অন্য একটি নেহাত ছোট দোকান হইতে জিনিসপত্র লইতে শুরু করিলাম।

শুধু পরানের নয়, কাপড়ের দোকানদার ভব দত্ত ও স্টেশনারি দোকানদার নিতাই কুণ্ডু, ইহাদের মেজাজও একদম বিগড়াইয়া গেল। আমি যে তাহাদের একদিন বাঁধা খরিদ্দার ছিলাম, সে কথাটা তাহারা যেন ভুলিয়া গেল। দোকানে গিয়া দাঁড়াইলে বসিতে বলা দূরে থাক্, মুখ ফিরাইয়া তাকাইতও না। অনেক ডাকাডাকি করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের পর কোন জিনিস চাহিলে, হয় 'নাই' বলিয়া বিদায় করিয়া দিত, কিংবা এমন দাম হাঁকিয়া বসিত যে, আর দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইত না। অথচ খাতির করার প্রক্রিয়াটা যে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। একদিন নিতাই কুণ্ডুর দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া এক শিশি হবুলিক্সের জন্য তাহাকে অনুনয়বিনয় করিলাম। নিতাই সেই যে প্রথম হইতেই 'এক ফোঁটা নাই' বলিয়া ঘাড় নাড়িতে শুরু করিল, আধ ঘণ্টা পরেও তার রকমফের হইল না। হঠাৎ একটা জীপ আসিয়া দোকানের নামনে দাঁড়াইল। নিতাই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক লাফে নীচে নামিল এবং ছুটিয়া জীপের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, গাড়িতে এক

ব্যক্তি বসিয়া আছে—শক্ত-পোক্ত চেহারা, ভারী মুখ, মাথায় চকচকে টাক, পরিধানে খাকী প্যাণ্ট ও মিলিটারি কোট। দোকানের একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি সাপ্লাই-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ভদ্রলোক নিতাইকে কি বলিতেই সে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দোকানে উঠিয়া একেবারে দোকানের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং মিনিট কয়েক পরে দুই হাতে দুইটা শিশি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ির দিকে ছুটিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হরলিক্সের শিশি। অফিসারকে শিশি দুইটি দিয়া নিতাই চরিতার্থতার হাসি হাসিতে লাগিল। অফিসার আরও দুই-চার কথা নিতাইকে বলিয়া চলিয়া গেলেন; নিতাই ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে ধাবমান গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিল। আসিতেই কহিলাম, ওঁকে হরলিক্স দিলে, অথচ আমাকে—। নিতাইয়ের ভাবাবেশ তখনও কাটে নাই। গম্ভীর মুখে, ভারী গলায় কহিল, ওই দুটি শিশিই ছিল, কোনমতে ওঁর জন্যে রেখেছিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত কহিল, উনি কে জানেন? সাপ্লাইয়ের বড় সাহেব। ওঁর সঙ্গে—। কি যে বলেন তার ঠিক নেই! জবাব না দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে নিতাইয়ের দোকান হইতেই অন্য লোক দিয়া চড়া দামে এক শিশি হরলিক্স আনাইয়াছিলাম। নিজে আর তাহার দোকানে যাই নাই।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে কাপড়ের দাম চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভব দত্তর মেজাজও কড়া হইয়া উঠিল। দোকানে গেলে পাত্তা দিত না। তারপর শুরু হইল কণ্ট্রোল। কেমন করিয়া জানি না, ভব দত্ত কাপড়ের বড় সাহেবের পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। কাপড়ের বড়

সাহেব ভাল ভাল ধুতি শাড়ি বিক্রয়ের অধিকার তাহাকেই দিলেন। ফলে হাকিম-সম্প্রদায়, শহরের ধনী কণ্ট্রাক্টর, ডাক্তার, উকিল ও ব্যবসায়ীরা তাহার খরিদ্দার হইল। কারণ ভাল ধুতি ও শাড়ির 'পারমিট' দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বড় সাহেবেরই। কিন্তু তাঁহার সম্মুখীন হওয়া আমাদের মত ক্ষীণজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্য নয়। কাজেই ভব দত্তর দোকানের পাশ মাড়াইবারও উপায় রহিল না আমাদের। ইহা সত্ত্বেও একবার একজন হাকিম-ঘেঁষা বন্ধুর সাহায্যে বড় সাহেবের কাছ হইতে খানকয়েক ভাল ধুতি ও শাড়ির পারমিট সংগ্রহ করিলাম। পারমিটটি পকেটে লইয়া ভব দত্তর দোকানে গেলাম। দোকানে অনেকগুলি সরকারী কর্মচারী বসিয়া ছিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া পুলিস-কর্মচারী বলিয়া মনে হইল। ভব তাহাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল। আমার দিকে দৃকপাতও করিল না। এক পাশে একটা রঙ-চটা টিনের চেয়ার পড়িয়া ছিল, তাহাই টানিয়া লইয়া বসিলাম। দোকানের কর্মচারী অফিসারদের ধুতি শাড়ি বাঁধাছাঁদা করিতে ব্যস্ত দেখিলাম। অফিসারগুলিকে বিদায় দিয়া ভব দত্ত আমার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কহিল, আপনি ? হাসিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, আমিই। তা ভাল ধুতি ভাল শাড়ি দোকানে অনেক আছে শুনলাম, আর শুধু শুনলামই বা কেন, চোখেও দেখলাম, ওই ভদ্রলোকগুলি নিয়ে গেলেন এক-একজন অনেকগুলি ক'রে; আমারও কিছু দরকার; খান কয়েক যদি—। ভব দত্ত বাধা দিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, এমনই তো হবে না, পারমিট চাই, বড় সাহেবের পারমিট। মৃদু হাসিয়া কহিলাম, আছে পারমিট, এই যে। বলিয়া পকেট হইতে পারমিটটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে পারমিটটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া,

মুখ হাঁড়ি করিয়া, ভারী গলায় কহিল, হুঁ, বড় সাহেবেরই বটে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ওঁদের কি! যাকে-তাকে পারমিট ঝেড়ে দিচ্ছেন! এদিকে আমি যে কোথা থেকে কাপড় দিই—! কহিলাম, তোমার দোকানে শুনলাম যথেষ্ট কাপড় এসেছে। মুখ ভেংচাইয়া ভবতোষ কহিল, যথেষ্ট কাপড় এসেছে! আপনারা তো সবই শুনছেন! সত্যি কথা ব'লে দিচ্ছি আপনাকে, বিশ্বেস করুন আর নাই করুন, ভাল কাপড আর একখানিও নেই। যা ছিল সব দিয়ে দিলাম আপনার চোখের সামনে। ঢোক গিলিয়া কহিল, তবে এমনই সাধারণ কাপড় চান তো দিতে পারি এই পারমিটের ওপরেই। কহিলাম, থাক্, দরকার নেই। তা তুমি এক কাজ কর, এই পারমিটের ওপর লিখে দাও যে, কাপড় নেই। ভাবিয়াছিলাম ভবতোষ ইহাতে কাবু হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাহা হইল না। বরং সোৎসাহে কহিল, বেশ তো, লিখে দিচ্ছি।—বলিয়া খচখচ করিয়া 'কাপড় আর নাই' লিখিয়া দিল। পারমিটটি আবার পকেটে পুরিয়া দোকানের বাহির হইতেই দেখি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাপরাসী বাইক হইতে নামিতেছে। ভবতোষ এক গাল হাসিয়া আপ্যায়ন করিয়া কহিল, এই যে ভাই খলিল, এস, ব'স, কি খবর? চাপরাসী দোকানে উঠিয়া গেল। আমি ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিলাম।

বাজারের শেষাশেষি আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাপরাসী বাইকে চড়িয়া পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। পিছনে ক্যারিয়ারে বাঁধা এক মোট কাপড়।

পারমিটটি লইয়া বড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, কাপড় আছে জানিয়াই

তিনি পারমিট দিয়াছিলেন, কিন্তু কাপড় যদি ফুরাইয়া গিয়া থাকে তো তাঁহার করিবার কিছুই নাই।

সেই দিন হইতে কণ্ট্রোলের বাজারে মিহি কাপড় পরিবার ও গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের পরাইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

কয়লার আড়তদার বগলা নন্দীর ব্যবহারেই বিগলিত হইলাম বেশি। বগলা আমার ভূতপূর্ব ছাত্র। যখন কয়লার ব্যবসা শুরু করে, তখন আমার কাছ হইতে আশ্বাস ও আশীর্বাদ যথেষ্ট পাইয়াছিল। প্রথম হইতেই আমাকে মাসে মাসে আমার আবশ্যকমত কয়লা বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিত। যুদ্ধের সময়ে গাড়ির অভাবে আমদানি কম হইতেই কয়লার দাম চড়িয়া গেল। বগলা নিয়মিতভাবে কয়লা পাঠানো বন্ধ করিল। বারংবার চিঠি লিখিয়া পাঠাইলে বা নিজে গিয়া দেখা করিলে তবে দিত, তাও পুরোপুরি নয়। অন্য আড়তদারদের ধরিয়া ন্যায্য মূল্যের দুই-তিন গুণ বেশি দাম দিয়া বাকি কয়লা সংগ্রহ করিতে হইত। হঠাৎ কয়লাখাদে কুলি-ধর্মঘটের জন্য কয়লার আমদানি দিন কয়েকের জন্য একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। আড়তদাররা রাতারাতি কয়লা আড়ত হইতে সরাইয়া ফেলিল। কয়লার গুঁড়া গোটার চেয়েও বেশি দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। আমি বগলার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া ছিলাম—সবটা না দিক, কিছু তো দিবেই। গৃহিণীর তাড়নায় একদিন বগলার কাছে ছুটিলাম। রেল-স্টেশনের কাছেই কয়লার আড়ত। একটা খড়ের চালার নীচে একটা তক্তাপোশের উপরে উবু হইয়া বসিয়া মুদ্রিত চক্ষে সিগারেট টানিতেছিল বগলা। আশেপাশে কয়লার গুঁড়ার স্তূপ। একটা লোক তাহাই বস্তায় বাঁধিয়া রাখিতেছিল এবং তাহাই লইবার জন্য জনকয়েক লোক

অনুনয়-বিনয় করিতেছিল। বগলা কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে সিগারেট টানিতেছিল।

ডাক দিতেই বগলা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িল, এবং ধূম্রজালের ভিতর দিয়া আমাকে দেখিয়া ধীরে সুস্থে সিগারেটটি নিবাইয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, কি বলছেন?

সোদ্বেগে কহিলাম, আমার কয়লা?

বগলা ধূলিরাশির দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই তো দেখছেন, ইচ্ছে হয় তো নিয়ে যান।

ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, ও যে ধুলো! ওতে রান্না হবে কি ক'রে?

বগলা বেপরোয়াভাবে কহিল, তা আমি কি করব? ও ছাড়া আর নেই। প্রার্থী লোকগুলাকে কহিল, দু টাকা ক'রে মণ, পারবে তো নিয়ে যাও।

তা হ'লে রিক্‌শা ডেকে নিয়ে আসি বাবু।—বলিয়া লোকগুলা শহরের দিকে ছুটিল।

বগলাকে কহিলাম, সত্যি কি কয়লা নেই?

বগলা গম্ভীর মুখে কহিল, না।

কহিলাম, কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?

উত্তরে বগলা ডান হাতের পাতা চিত করিয়া দিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?

বগলা কহিল, যা আছে তা নিজের জন্যে, আর কিছু এস. ডি. ও. সাহেবের জন্যে; ওঁর কয়লা কিছু বেশি লাগে। সাম্নুনয়ে কহিলাম, আমাকে যদি এক মণ অন্তত—। বগলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মাস্টার মশায়, পারব না, অনুরোধ করবেন না আমাকে।

চলিয়া আসিলাম। সেই দিন হইতে বগলার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সম্ভব হইলে একে তাকে ধরিয়া ন্যায্য মূল্যের বেশি দাম দিয়া কয়লা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম, না হইলে কাঠ। গৃহিণী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রান্না করিতে লাগিলেন।

শুধু ব্যবসাদারদের কাছে নয়, নাপিত ধোপা চাকর ও ঝিদের কাছেও আমার পরিচয় মর্যাদাহীন হইয়া পড়িল।

চারু নাপিত শহরের সেরা নাপিত। হাকিম ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার একচেটিয়া ব্যবসা। তাহার ছেলে আমার স্কুলের ছাত্র ছিল বলিয়া আমার বাড়িতেও আসিত। তাহার রেট ছিল সাধারণ নাপিতদের চেয়ে বেশি—বড়দের ছয় আনা, ছোটদের চার আনা। গৃহিণী এই নবাবিয়ানার জন্য গঞ্জনা দিতেন। তবু চারুর হাতে ক্ষৌরীকৃত হওয়ার আভিজাত্যের লোভ সামলাইতে পারিতাম না। পাড়ার কালী নাপিত রাস্তার ধারে বসিয়া পাড়ার সাধারণ লোকদের চুল কাটিত। আমাকে দেখিলেই সে আমার মাথার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইত। কিন্তু তাহার হাতে কোনদিন মাথা ছাড়িয়া দিব, এ আমার উৎকট কল্পনারও অগোচর ছিল। যুদ্ধের বাজারে চারু রেট দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। গৃহিণী বাঁকিয়া বসিলেন—মাসে মাসে শুধু চুল কাটার জন্য দুই টাকা খরচ করা চলিবে না। শেষে একদিন নিজে কালীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছেলেদের চুল ছাঁটাইয়া দিলেন। আমি কিন্তু চারুর কাছেই চালাইতে লাগিলাম। দিন কয়েক পরে চারু নিজেই আসা বন্ধ করিল। যুদ্ধের মরসুমে শহরে অনেক হালি বড়লোক গজাইয়া উঠিয়াছে; অনেক নূতন নূতন হাকিমেরও আমদানি হইয়াছে। সকলেই চারুকে চায়। এই নূতন মক্কেলদের ভিড়, তা ছাড়া আমার কাছে পাওনাও নেহাত কম; কাজেই চারু বোধ হয় আসিবার সময়

করিতে পারিল না। আমি অগত্যা একদিন কালীকে ডাকিয়া তাহার কবলেই মাথা সঁপিয়া দিলাম।

ধোপার অবস্থা তথৈবচ। শহরের সেরা ধোপা উপেন বরাবর কাপড় কাচিত। দুধের মত সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিয়া উড়ানি উড়াইয়া স্কুলে যাইতাম। সহকর্মীরা ঈর্ষাকুটিল চক্ষে আমার দিকে তাকাইতেন। পয়সা কিছু বেশি খরচ হইত বটে, তবু এই সামান্য বিলাসটুকু বর্জন করিতে পারিতাম না। যুদ্ধ বাধিতেই ধুতি-শাড়ি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল; বিশেষ করিয়া মিলের ধুতি-শাড়ি। সরকার বাহাদুর আপামরসাধারণের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন—মোটা, খাটো, একই রকমের পাড়। ফুড-কমিটীর কর্তাদের ধরিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। মনিব-চাকর, গিন্নী-ঝি কোন তফাত রহিল না। তবু উপেনের হাতে ধুইয়া আসিলে ওই কাপড়েরই বাহার খুলিত। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। শহরের কাছে মিলিটারি ক্যাম্প বসিল। উপেন সেখানকার কাজে নিযুক্ত হইল। হাকিম বা বড়লোকদের কাপড় না কাচিলেই নয়, তাই কোনমতে কাচিয়া দিত। কিন্তু আমাদের মত লোকদের কাপড়গুলির উপরে তাহার শিক্ষানবিস ছেলেরা হাত পাকাইত। ফলে কাপড় তেমন পরিষ্কার হইত না, ছিঁড়িতও বেশি। গৃহিণী অনুযোগ করিলে উপেনের ছেলেরা স্পষ্ট বলিয়া দিত, স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় এর বেশি সাদা হবে না। গৃহিণী একদিন বলিলেন, সাদা না হোক, ছিঁড়ছে কেন? ভাড়া খাটাস নাকি? উপেনের ছেলেরা তারপর হইতে কাপড় কাচা বন্ধ করিল। পাড়ায় একজন ধোপা ছিল—কানাই। পাড়ার সাধারণ গৃহস্থদের কাপড় সে-ই কাচিত। কানাইয়ের কাচা কাপড়ের একটি বিশেষত্ব ছিল। এমন একটি পাকা ফিকা নীল রঙ ধরিত যে, শত চেষ্টাতেও ছাড়িত না। কাজেই ময়লা

হইত কম। এত সুবিধা সত্ত্বেও কানাইকে কোনদিন ডাকি নাই। এইবার তাহাকে ডাকিতে হইল। নীলরঙ জামা ও কাপড় পরিয়া সাধারণের সামতল্যে নামিয়া আসিয়াছি—ইহা বিজ্ঞাপিত করিতে করিতে সর্বসমক্ষে চলা-ফিরা করিতে লাগিলাম।

চাকর ও ঝিদের কাছেও মনিবত্বের মাপকাঠিতে অনেক ছোট হইয়া গেলাম। সংসার-পাতার শুরু হইতেই একজন চাকর ও একজন ঝি বরাবর ছিল। ঝি-চাকরের মাহিনা বেশি ছিল না, কাজেই আয় খুব বেশি না হইলেও কুলাইয়া যাইত। যুদ্ধ শুরু হইতেই ঝি ও চাকর দুইজনেই মাহিনা বাড়াইবার বাহানা ধরিল। আমার মাহিনা না বাড়িলেও তাহাদের দুই-এক টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিলাম। দিন কয়েক ঠাণ্ডা রহিল; তারপর আবার টালমাটাল ভাব,—বিশেষ করিয়া চাকরটির। কাজে মন নাই; যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারিয়া দেয়; দুপুরে আড্ডা দিতে বাহির হইলে চারিটার আগে বাড়ি ফিরে না; গৃহিণী ধমক দিলে মুখের উপর জবাব দেয়। উত্তরদায়ক ভৃত্য না রাখাই শাস্ত্রীয় বিধি। গোপনে চাকর খোঁজ করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, চাকর দুষ্প্রাপ্য। কেহ আর সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে চাকরি করিতে প্রস্তুত নয়। সরকার বাহাদুর পাঁচ-সাত রকমের নূতন আপিস খুলিয়াছেন। সকলেই সরকারী আপিসে পিয়নের কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত। দোষও তাহাদের দেওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসই এত দুর্মূল্য যে, পূর্বের আয়ে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সবারই। সরকারী আপিসের পিয়নদের মাহিনা বেশি না হইলেও মাগগি ভাতা আছে—বকশিশ আছে। সব মিলাইয়া এক-একজন প্রায় চল্লিশ টাকা রোজগার করে। অবস্থা দেখিয়া গৃহিণীকেই মেজাজের রাশ টানিবার জন্য

উপদেশ দিলাম। চাকরটি নিজের মর্জিমত কাজ করিতে লাগিল, গৃহিণী আমার উপদেশমত মুখ বুজিয়া রহিলেন। এমনই করিয়া দিন কয়েক চলিল। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, চাকরটা মাটিতে লুটাইয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে, এবং গৃহিণী তাহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেই চাকরটা উঠিয়া বসিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।

চিঠি আসিয়াছে কি না প্রশ্ন করিতেই, চাকরটা কান্না থামাইয়া কহিল, চিঠি কে লিখবে বাবু? নেকাপড়া জানে কি কেউ?

তবে খবর পেলি কি ক'রে?

বাজারে আমাদের গাঁয়ের একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, তার মুখেই শুনলুম। আবার হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল, কি করব বাবু? বাড়িতে আর মরদ বলতে কেউ নাই। এখুনি যেতে হবেক আমাকে। ছাদ্দ-ছান্তি সেরে, ঘরের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে আবার আসব।

সাবেক বাকি-বকেয়া সমেত সব মাহিনা উশুল করিয়া লইয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য দশ টাকা অগ্রিম লইয়া এবং যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া চাকরটি বিদায় লইল। আমরা তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গনিতে লাগিলাম।

দিন কয়েক পরে বাজারের মধ্যে হঠাৎ চাকরটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। পরিধানে সরকারী আপিসের চাপরাসীর পোশাক, বুকের উপর তকমা। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া চট করিয়া পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর, চাকর আর জুটাইতে পারিলাম না।

নিজে ও গৃহিণী মিলিয়া, অর্থাৎ গৃহিণীই প্রায় সবটা, আমি সময়ে অসময়ে কতকটা, সংসারের কাজ চালাইতে লাগিলাম।

ঝিটাকে ভাঙাইল সরকার নহে, সরকারের শত্রু জাপান। কলিকাতায় হঠাৎ গোটাকয়েক বোমা ফেলিয়া দিল। কলিকাতাবাসীরা ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলাইল। প্রত্যেক শহরে কলিকাতাবাসীদের জোয়ার আসিল। বাড়িভাড়া চড়চড় করিয়া বাড়িয়া গেল। ভাঙা প'ড়ো ঘরেও লোকে মোটা ভাড়া দিয়া মাথা গুজিয়া থাকিতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের পাড়াতে এক ভদ্রলোক আসিলেন। মস্ত বড়লোক। কলিকাতায় বিরাট ব্যবসা। পাড়ায় সোরগোল পড়িয়া গেল। কলিকাতাবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, হাব-ভাব দেখিয়া তাক লাগিয়া গেল সবার। ভদ্রলোকের মস্তবড় পরিবার। ঝি বেশি সঙ্গে আনিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া ঝিয়ের খোঁজ করিতে লাগিলেন। এক যা মাহিনা দিতে চাহিলেন, তাহাতে সকল বাড়ির ঝিরাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঝিয়ের বয়স কিছু কাঁচা ছিল, চেহারাও নেহাত মন্দ ছিল না; তাহাকেই পছন্দ হইল ভদ্রলোকের। ঝিটি বিনা নোটিসে কাজ ছাড়িয়া দিল। তখন হইতে ঝিয়ের কাজও গৃহিণীর ঘাড়ে পড়িল। আর ঝি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কারণ চাকরের মত ঝিও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহাদের বয়স অল্প, তাহাদের কাজ করিবার দরকার নাই; জানি, বড়লোকদের কৃপায় তাহাদের মাসিক বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। পড়তি বয়সের মেয়েদের অবশ্য কাজ করা ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু এমন বেতন হাঁকে যে, আমার মত লোকের ছেলেমেয়ের পেট না কাটিয়া দেওয়া চলে না।

এমনই করিয়া দিন দিন ক্রমে ক্রমে সমাজ-সোপানের নীচের ধাপে নামিয়া আসিলাম। আহার-বিহারে, বেশ-ভূষায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীতে সাধারণের সমপংক্তি হইয়া উঠিলাম। অর্থ ও পদমর্যাদার সামনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা বাতিল হইয়া গেল। চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চাকা ঘুরিয়া গেল। আমার এক শ্যালক শহরের সাপ্লাই-অফিসের বড় সাহেব হইয়া আসিল। আসিবার আগে আমাকে একটি বাড়ির জন্য লিখিল। আমাদের পাড়ায় একটি ভাল বাড়ি খালি হইয়াছিল; সেইটি ঠিক করিয়া দিলাম। যথাসময়ে শ্যালক সপরিবারে আসিল ও ওই বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইল। আমি ও আমার গৃহিণী দুইজনে সব গুছাইয়া দিলাম।

রাঘববাবুর চিঠি আসিল। অতি সৌহার্দ্রপূর্ণ চিঠি। সপরিবারে কেমন আছি—জানিবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরিশেষে জানাইয়াছেন, ব্যবসা সম্পর্কে সাপ্লাই-অফিসারের সঙ্গে দেখা করা তাঁহার বিশেষ দরকার। ইহার জন্য তাঁহাকে নিজেই আসিতে হইত। কিন্তু আমি যেহেতু এখানে রহিয়াছি এবং সাপ্লাই-অফিসার যেহেতু আমার শ্যালক, সেইজন্য আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমি যেন তাঁহার হইয়া সাপ্লাই-অফিসারকে বলিয়া কাজটি করিয়া দিই।

অভয় ডাক্তারের মেয়ের বিবাহ। কাপড়, চিনি ও আটা চাই। একদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে পদার্পণ করিলেন। গৃহিণী কেমন আছেন জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল বলিয়া বোধ হইল তাঁহাকে।

আমি যে তাঁহার কাছে যাই নাই, সেইজন্য অভিমান ও অনুযোগ করিলেন, সর্বশেষে আসল কথাটি প্রকাশ করিলেন।

শ্যালকের জীপে চড়িয়া নিতাই ও ভবর দোকানে একদিন গেলাম। আমাকে সাপ্লাই-অফিসারের গাড়িতে দেখিয়া দুইজনেই কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর সাপ্লাই-অফিসারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পরিচয় পাইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া নমস্কার করিল। নিতাই নিজে হইতে কহিল, হর্‌লিক্স কয়েক বোতল এসেছে, চাই নাকি? আমি মনে মনে হাসিয়া কহিলাম, দরকার হ'লে নেব।

অনেক দিন দোকানে পায়ের ধূলো দেন নি।—বলিয়া নিতাই আকুল চক্ষে আমার দিকে চাহিল। নিয়মিতভাবে পায়ের ধূলা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত করিলাম।

ভব দত্ত আমাকে আড়ালে ডাকিয়া আন্তরিক অন্তরঙ্গতার সহিত কহিল, অনেক ভাল ভাল ধুতি-শাড়ি এসেছে দোকানে, চাই তো একটা পারমিট—। বলিয়া কথাটা শেষ করিল না, শ্যালকের দিকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিল।

আচ্ছা, হবে এখন।—বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

হঠাৎ একদিন সকালে কয়লার আড়তদার বগলা নন্দী বাড়িতে আসিয়া হাজির। একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। কহিলাম, কি খবর বগলা? কয়লা এসেছে নাকি? বগলা সাগ্রহে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ক মণ চাই বলুন, কালই পাঠিয়ে দেব। কহিলাম, বেশ, টাকাটা দিয়ে দিই তা হ'লে, কেমন? বগলা শশব্যস্তে কহিল, টাকার জন্যে তাড়া কি? আগে পাঠিয়ে দিই, পরে দেবেন এখন।

বগলা বিপদে পড়িয়াছে। কাহাকে কালো দরে কয়লা বিক্রয়

করিয়াছে। কালো কয়লার অবশ্য কালো দরেই বিক্রয় হওয়া উচিত। কিন্তু সাপ্লাই-অফিসার অত্যন্ত বেয়াড়া-বুদ্ধির লোক; যুক্তিটা মাথায় ঢুকে নাই। ফলে, বগলার লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়াছে। বগলা যুক্তহস্তে অশ্রুপূরিত নয়নে কহিল, দয়া ক'রে একটা ব্যবস্থা করুন মাস্টার মশায়। এ বাজারে ব্যবসাটি গেলে ছেলেপিলে নিয়ে পথে দাঁড়াব।

চুপ করিয়া সব শুনিয়া যথাবিধি ব্যবস্থা করিবার আশা ও আশ্বাস দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। যাইবার সময়ে আর একবার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গেল বগলা।

উপেন ধোপা তো সাপ্লাই-অফিসারের বাড়িতে আমাকে দেখিয়া অবাক। কোন রকমে সামলাইয়া কহিল, হুজুর, আপনি এখানে? হাসিয়া কহিলাম, সাহেব যে আমার শালা। তা তোমার মিলিটারির কাজ কেমন চলছে? উপেন হাত জোড় করিয়া কহিল. সে গেছে আজ্ঞে। তা আপনকার কাপড়চোপড় এখন যাচ্ছে কোথা? কহিলাম, পাড়ার ধোপার কাছেই দিচ্ছি। কি আর করব বল? তুমি তো আর কাচলে না। উপেন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, ও-কথা যেতে দেন আজ্ঞে। নেহাত বেজে প'ড়ে গিছলাম, না হ'লে আপনাদের মত খদ্দের আবার ছাড়ি! তা গিন্নীমা কি এখানে, না, বাড়িতে? কাপড়গুলো তা হ'লে আজকেই—। কহিলাম, এবার থাক্। কাপড় ফিরে আসুক। পরের বার নেবে এখন।

চারু নাপিতও আবার আসিতে শুরু করিয়াছে।

আমার পুরাতন চাকরটি একদিন আসিয়া আমাকে ও গৃহিণীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জুট-আপিসে

চাকরি করিতেছিল, মাস কয়েক আগে চাকরিটি গিয়াছে। কহিলাম, চাকরি-বাকরি করবি? সে দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, গেরস্থ-বাড়িতে চাকরি করতে আর মন সরছে নাই বাবু। শুনলম, মামাবাবুর আপিসে পিয়নের চাকরি খালি আছে। আপনি একটু ব'লে দিলেই হয়ে যায়। কিবৃপা ক'রে এইটি ক'রে দেন এজ্ঞে। ছেলে-পিলে নিয়ে বড় কষ্ট। আপনার চাকরের ভাবনা হবেক নাই যতদিন আমি আছি। আমার ছোট ভাইটা বেশ বড়সড় হইছে, তাকেই গতিয়ে দিব আপনকার কাছে।

তাহার চাকরি করিয়া দিলাম। পরিবর্তে সে আমার ভৃত্যসমস্যা সমাধান করিয়া দিল।

ঝিয়ের সমস্যা সমাধান করিল পরান। আবার অত্যন্ত ভক্তি করিতে শুরু করিয়াছে। শ্যালকের ও আমার—এই দুই বাড়িতেই ডাল তেল নুন ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছে। আমার পুরাতন ঝিটির কলিকাতার বাবু কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর, ভরণপোষণের ভার পরানই লইয়াছিল। শ্যালকের বাড়িতে ঝিয়ের প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকেই সেখানে বহাল করিয়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও একটি ঝি সংগ্রহ করিয়া দিল।

সমাজ-সোপানের আগেকার ধাপ ছাড়াইয়াও উপরে উঠিয়া আসিয়াছি। সংসারযাত্রা অনেকটা সুগম হইয়াছে। তবে পরিচয় বদলাইয়াছে। আগে সকলে বলিত, 'মাস্টার মশায়'; এখন বলে, 'জামাইবাবু'। এমন কি, আমার সহকর্মীরাও নাকি আমার পিছনে আমাকে জামাইবাবু বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। তবে এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যাহারা আমার পূর্ব-পরিচয়ের মূল্য দিতে একদিন কার্পণ্য করিয়াছিল, তাহারাই আমার নব-পরিচয়ের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিতেছে।

নিষ্কৃতি

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। সকালবেলায় বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। রাশিয়া ও জার্মানির বিপুল সৈন্য-সমাবেশ, আমেরিকায় চার্চিল ও রুজভেল্টের মোলাকাত, চীনে চীনা সৈন্যের জয়লাভ ও জাপানী সৈন্যের পশ্চাদপসরণ, বর্মাতে ব্রিটিশ বিমান-বহরের বোমা-নিক্ষেপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা কর্তৃক কালাদের কর্ণমর্দন, ভারতে গান্ধীজীর জিন্নার সহিত বদ রসিকতা, বাংলায় নিদারুণ খাদ্যাভাব, চট্টগ্রামে চল্লিশ টাকা চালের মণ—

চমকিয়া উঠিলাম, চেতাবনির ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি! কলিযুগের আয়ুষ্কাল তাহা হইবে শেষ হইল বলিয়া! পনরোই শ্রাবণ মহাপ্রলয়, এবং আমরা যে কয়জন ধর্মাত্মা ব্যক্তি 'নোয়া'র নৌকায় চড়িয়া প্রলয়সমুদ্রের ঢেউ কাটাইয়া সত্যযুগে উত্তীর্ণ হইব, তাহাদের জন্য প্রচুর সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্যের ব্যবস্থা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, এখনও দুই মাস বাকি। কিন্তু চারিদিকেই অবস্থা এমন সঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই কয়টা দিনই পুণ্যের পুঁজির জোরে কোনমতে কাটাইয়া উঠিতে পারিব কি না কে জানে!

দরজার সামনে রাস্তা দিয়া সকাল আটটা হইতেই ভিখারীদের সারি শুরু হইয়াছে। এক-একটা যেন কোনমতে চামড়া দিয়া ঢাকা কঙ্কাল, দেহে মাংস নাই, দেহ ঢাকিবার জন্য পরিধেয় [illegible] পরিধেয়ের প্রয়োজনবোধও নাই। মৃত্যুর সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়া একমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার প্রাণী-সুলভ বৃত্তি ছাড়া মনের অন্য সব বৃত্তি যেন মরিয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, তিরিশ টাকায় চাল কিনে আর ভিক্ষে দিতে পারব না, যা। একমুষ্টি ভিক্ষা দিয়া বলিতেছেন, আজকের মত দিলাম, কাল থেকে আসিস না। একটা বুড়ীর স্খলিত কম্পিত কণ্ঠের করুণ মিনতি, যে কদিন বাঁচি দুটি ক'রে দিবে মা, মরণ যে হচ্ছে না কিছুতেই, কি করব বল? একটি কচি কোমল শিশুকণ্ঠের প্রার্থনা, একটু মাড় দাও মা। স্ত্রীর উত্তর, এত সকালে কোথায় পাবি? আসবি বেলা হ'লে।

এখন তবে দুটি মুড়ি দাও।

স্ত্রীর হয়তো দয়া হইয়াছে, মুড়ি আনিতে ভাঁড়ারঘরে গিয়াছেন। ভালই হয়তো করিয়াছেন, দয়া হৃদয়ের অত্যন্ত মহৎ বৃত্তি। কিন্তু মুড়ি জিনিসটিও বিশেষ সুলভ নয়; আজকাল টাকায় তিন পাই মুড়ির জন্য মুড়িওয়ালীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে হয়,—অবশ্য আমাকে নয়, স্ত্রীকে।

তাহা ছাড়া, চালের মণ ত্রিশ টাকা, ধুতির জোড়া দশ টাকা, শাড়ির জোড়া পনরো টাকা, আটা চিনি কেরোসিন ও অন্যান্য জিনিসও অগ্নিমূল্য। আমরা, নীতিপাঠ-পড়া ভদ্র গৃহস্থেরা, কি করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব, ভাবিয়া চোখে সরিষাফুল দেখিতেছি।

ম্যাস্টরবাবু রইছেন?—চৌকিদার গোষ্ঠ ডোমের গলা। হ্যাঁ।—জানাইলাম। গোষ্ঠ কহিল, আপনকাকে একবার গাঙুলী মশয় ডাকছন। কহিলাম, কেন রে? সাহেব এসেছেন নাকি?

আজ্ঞে হাঁ।—বলিয়া গোষ্ঠ চলিয়া গেল।

স্কুলে যাইয়া দেখিলাম, আপিসে ছোট সাহেব বসিয়া আছেন, পাশে দাঁড়াইয়া গাঙুলী ও রাধানাথ। আমাকে দেখিবামাত্র সাহেব মুচকি

হাসিয়া কহিলেন, আসুন। চোখের ইঙ্গিতে কহিলেন, বসুন। একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিলাম। রাধানাথ চোখ পাকাইয়া তাকাইল, ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

সাহেব কহিলেন, হাকিম হচ্ছেন যে। বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলাম, মানে? সাহেব সোজা হইয়া বসিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন, খুব গোপন খবর, কাউকে বলবেন না এখন, একটা অ্যান্টি-হোর্ডিং ড্রাইভ হবে শিগগির। কহিলাম, তাই নাকি? গাঙ্গুলী মশায় হাতজোড় করিয়াই ছিলেন, সানুনয়ে প্রশ্ন করিলেন, হুজুর, এর অর্থ? হুজুর কহিলেন, এর অর্থ সঞ্চয়বিরোধী অভিযান, সারা বাংলা দেশে গ্রামে গ্রামে সরকার নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের পাঠাবেন; তাঁরা প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে কার কি সঞ্চয় আছে, খুঁজে বের করবেন। গাঙ্গুলী ও রাধানাথ উভয়েই আঁতকাইয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কি হুজুর? সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে যাবে? হুজুর প্রায় চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া হাকিমী হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আপনার যদি প্রয়োজনমত জিনিস থাকে তো নেবে না, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি থাকে, তা হ'লে নিয়ে যাবে।

রাধানাথ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, আমার কত প্রয়োজন, তা তারা জানবে কি ক'রে হুজুর? গাঙ্গুলী মশায়ও ঘাড় নাড়িয়া রাধানাথকে সমর্থন করিলেন। হুজুর কহিলেন, পুরুষ স্ত্রী ছেলে মেয়ে মাথা-পিছু গড় কত খাদ্য প্রয়োজন, সরকার তার একটা হিসেব ঠিক করেছেন; সেই অনুসারে আপনার পরিবারের ছ মাসের জন্যে যত খাদ্য প্রয়োজন, তা আপনাকে রাখতে দেওয়া হবে, বাড়তিটা আপনাদের গ্রামের যাদের খাবার নেই, তাদের দেওয়া হবে। আপনাদের গ্রাম থেকে এক কণা ধানও বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না, ভয় নেই আপনাদের।

রাধানাথ শুষ্কমুখে কহিল, হুজুর, শুধু খাবার খরচই দেবে? অন্য খরচ—তেল, নুন, কাপড়, ডাক্তার, ওষুধ—? গাঙুলী মশায় কহিলেন, গৃহদেবতার নিত্যসেবা, কুটুম-কুটুম্বিতে, আসা-যাওয়া, মুষ্টিভিক্ষা—হুজুর, ভিক্ষে দিতেই দিন তিন সের ক'রে চাল লাগে যে! হুজুর হাসিয়া কহিলেন, কি ব্যবস্থা আছে, আমি সব জানি না। মাস্টার মশায়ের কাছে জেনে নেবেন। ওঁকে একটা দলের কর্তা করা হবে ঠিক হয়েছে কিনা। রাধানাথ মুখ কালো করিয়া কহিল, তাই নাকি হুজুর? গাঙুলী মশায় পুলকিত হইয়া কহিলেন, হুজুর, আমাদের গাঁয়ের?

হুজুর কহিলেন, তা কি ক'রে হবে? নিজের গ্রামে আইনমত কাজ করতে চক্ষুলজ্জায় ওঁর বাধতে পারে। রাধানাথ ঠোঁট ও ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িল, অর্থ—উহার চক্ষুলজ্জা থাকিলে তো! অন্য কেহ বুঝিলেন কি না জানি না, আমি বুঝিলাম; কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া কহিলাম, কত দিনের জন্যে যেতে হবে?

সাহেব কহিলেন, তা সপ্তাহ দুই তো বটেই।

সভয়ে কহিলাম, এতদিন বাইরে থাকতে হবে? সাহেব আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তা হ'লেই বা। সরকারের সাহায্য তো প্রত্যেকেরই করা উচিত। তা ছাড়া একেবারে অনাহারী নয়, পারিশ্রমিক কিছু পাবেন। যাওয়া-আসা, খাওয়া-থাকার খরচের জন্যে দু-তিন সপ্তাহে শ খানেক টাকা পেয়ে যেতে পারেন। রাধানাথ আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, বলেন কি হুজুর? হুজুর কহিলেন, নিশ্চয়। যাকে-তাকে তো এ কাজের ভার দেওয়া হবে না। যাঁরা শিক্ষিত পদস্থ লোক, তাঁদেরই দেওয়া হবে, যেমন, সরকারী কর্মচারী, স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের অধ্যাপক—এঁদের। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তা রাধানাথবাবু, ক গোলা ধান আছে আপনার বাড়িতে? রাধানাথ হাসিবার চেষ্টা করিয়া

কহিল, কোথায় পাবেন হুজুর? সব বিক্রি হয়ে গেছে, এত বড় সংসারের খরচ, বাইরে থেকে এক পয়সা আয় নেই। কহিলাম, কেন কাপড়ের দোকানে তো বেশ লাভ করেছ এ বছর। রাধানাথ আমার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া, হুজুরের দিকে চাহিয়া কহিল, তা লাভ কিছু হয়েছে হুজুর, কিন্তু এক পয়সা ঘরে আসে নি, মহাজনের সিন্দুকেই সব পৌঁছে দিতে হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের কাপড়ের দোকান, হুজুর, লোকসান দিয়ে চালানো—শুধু গাঁয়ের লোকের সুবিধের জন্যে।

বাড়ি ফিরিবার সময়ে রাধানাথ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কারও বা পোষ মাস, কারও বা সর্বনাশ।

কহিলাম, কি হ'ল রাধানাথদা?

রাধানাথ তিক্তকণ্ঠে কহিল, আমাদের সব কেড়ে-কুড়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে যাবে, আর তোমার পকেট ভর্তি হবে। কহিলাম, ওই টাকাতেই পকেট ভর্তি হয়ে যাবে? রাধানাথ বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, আর ঘুষ? আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, ঘুষে যে লাল হয়ে যাবে বাবা। প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি? রাধানাথ চোখ পাকাইয়া কহিল, পাগল! কি বোঝাতে চাও বল দেখি? ঘুষ নেবে না তুমি? সরকারী চাকরি করতে গিয়ে ঘুষ নেয় না, এমন লোক এখনও জন্মায় নি ভূভারতে। ব্যঙ্গের স্বরে কহিলাম, রাতদিন সরকারী চাকরেদের সঙ্গে মিশছ যে! ওদের নাড়ীনক্ষত্র সব তোমার মুখস্থ, গণ্যমান্য ব্যক্তি কিনা। রাধানাথ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, মুখ সামলে কথা কও বলছি মাস্টার। আমিও কড়া গলায় কহিলাম, আমার সামলাবার দরকার হবে না, তুমি নিজেই সামলাও দেখি। রাধানাথ কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ভারী গলায় বলিতে লাগিলাম, দেখ রাধানাথদাদা, ভুলে যেও না, আমি

একজন শিক্ষক, তোমার মত ব্যবসাদার নই। তোমার মত দু বছর আগে কেনা দু টাকার জিনিস দশ টাকায় বিক্রি করি না আমি, গাঁয়ের লোকের মুখের দিকে না তাকিয়ে ঘরের ধান মাড়োয়ারীর হাতে তুলে দিই না আমি, টাকায় দু পাই ক'রে ধান বিক্রি ক'রেও মাপে চুরি করি না আমি। রাধানাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, বেশ করেছি, নিজের জিনিস যেমন ইচ্ছে, যাকে ইচ্ছে বিক্রি করব। তা ছাড়া কে করে নি গাঁয়ে? গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, গাঙ্গুলী-দাদাও তো বিক্রি করেছেন।

গাঙ্গুলী মশায় নীরবে শুনিতেছিলেন, কহিলেন, রাস্তার মাঝে চেঁচামেচি ক'রো না রাধানাথ, আমি বিক্রি করেছি বটে, কিন্তু মাড়োয়ারীকে দিই নি। গাঁয়ের লোককেই দিয়েছি, আর বাজার-দরের চেয়ে সুবিধে ক'রেই দিয়েছি। তা ছাড়া মাস্টার কিছু অন্যায় বলে নি। এই যে বাড়িতে এখনও দু গোলা ধান পুরে রেখেছ; বললাম তখন, চার পাই দরে বিক্রি ক'রে দাও গাঁয়ের লোককে, খেয়ে বাঁচুক সব, টাকা তো যথেষ্ট কামিয়েছ যুদ্ধের বাজারে। তা তখন কানে তুললে না, এখন তো সব কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দেবে সবাইকে।

রাধানাথ জবাব না দিয়া হাঁড়ির মত মুখ করিয়া রাস্তা চলিতে লাগিল।

বাড়িতে আসিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলে এত বেলা পর্যন্ত? রোদে রোদে ঘুরতে এত ভালও লাগে! জামা খুলিতে খুলিতে কহিলাম, সার্কল-অফিসারের কাছে। তারপর একটা মোড়া টানিয়া বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলাম, রোদ! রোদে রোদেই দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করতে হবে বোধ হয়। গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, মানে? কহিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম।

গৃহিণী অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, গাঁয়ে এত লোক থাকতে শুধু তোমার ওপর এই হুকুম ? গম্ভীর বদনে কহিলাম, গাঁয়ের হারু-তারু রাধু-সাধুর সঙ্গে সমান ভাবো নাকি আমাকে ? গৃহিণী দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, পাগল ! তা আবার ভাবতে পারি আমি ! মস্ত বড়লোক তুমি। রাগত স্বরে কহিলাম, মস্ত বড়লোক না হতে পারি, তা ব'লে তারু-হারুদের পর্যায়ের নই আমি। গৃহিণী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, গালে হাত দিয়া কহিলেন, বাবা ! কি অহঙ্কার ! কহিলাম, হবে না ? ধন নেই, সম্পত্তি নেই, এই অহঙ্কার-টুকুও থাকবে না আমাদের ? এর জোরেই পৃথিবীতে কারও কাছে মাথা না নুইয়ে জীবন কাটিয়ে দোব আমরা। গৃহিণী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, জানি গো জানি, আমাকে আর শোনাতে হবে না। কিন্তু আসল কথাটা কি বল দেখি ? সরকার কেন ডেকেছে তোমাকে ? সার্কল-অফিসারের কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, খুলিয়া বলিলাম। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, লোকে কত দুঃখ কত পরিশ্রমে ছেলেমেয়েদের জন্যে ভবিষ্যতের আহার সঞ্চয় ক'রে রেখেছে, তাই কেড়ে নিতে যাবে তুমি ? তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কিছুতেই যেতে পাবে না, ছেলে-পিলের মা হয়ে যেতে দিতে পারব না আমি। বুঝাইয়া বলিলাম, দুঃখের সঞ্চয় কাড়তে কে যাচ্ছে ? যারা তেজারতি মহাজনি ক'রে প্রজা ও খাতকদের পথে বসিয়ে গোলা ভর্তি ক'রে রেখেছে, চোখের সামনে লোককে অনাহারে মরতে দেখেও যারা এক ছটাক ধান বার করতে চাচ্ছে না, ন্যায্য দামের দশ গুণ দাম পেয়েও যাদের লাভের লোভ মিটছে না, তাদেরই রাশীকৃত সঞ্চয়কে কেড়ে নিতে যেতে হবে আমাদের। গৃহিণী চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন ; ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাও যেতে পাবে না তুমি। যাদের সরকার আজীবন মোটা মাইনে দিয়ে পুষছে,

এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে যাদের সস্তা চাল-আটা খাওয়াচ্ছে, তাদের দিয়ে এ কাজ করাকগে। তোমাদের মত নিরীহ মাস্টারদের দিয়ে কেন? কণ্ঠস্বর ধারালো করিয়া কহিলেন, কি সম্পর্ক সরকারের সঙ্গে তোমাদের? কোন্ ভালটা তোমাদের দেখেছে সরকার? আমরা পাঁড়াগাঁয়ের ভদ্র গৃহস্থরা যে কি ক'রে দিন চালাচ্ছি, কোনদিন খবর নিয়েছে তোমাদের সরকার? দম লইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত স্বরে কহিলেন, তা ছাড়া এই চুরি-ডাকাতির দিনে এতদিন তোমাকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে দিতে পারব না আমি। কহিলাম, সরকার তো বিনা পয়সায় করাবে না, টাকা দেবে। গৃহিণীর মেজাজের মাত্রা এক মুহূর্তে নামিয়া আসিল, নিরুদ্ধ ঔৎসুক্যের সহিত কহিলেন, কত? কহিলাম, শ খানেক বোধ হয়। গৃহিণী একেবারে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, তাই নাকি? কহিলাম, হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম সার্কল-অফিসারের কাছে। দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ তো, এ একটা দলের কর্তা, হাকিম ছাড়া কাউকে বিশ্বাস ক'রে এ কাজ দিচ্ছে না। গৃহিণী চুপ করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া, হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, তা হ'লে তুমি হাকিম হতে চলেছ বল? কিন্তু ওই পোশাকে লোকে তোমাকে মানবে?—বলিয়া আলনায় টাঙানো আমার জামা-কাপড় ও বিশেষ করিয়া খাটের নীচে রক্ষিত আমার জুতা জোড়াটির দিকে দৃষ্টি চালনা করিলেন। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে লোকে কত বড় কাজ করছে আজকাল। তা ছাড়া এক জোড়া জুতো কিনে নোব শহরে গিয়ে। গৃহিণী নাক ও ঠোঁট কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তোমাদের মত ধুতিচাদরওলাদের কেউ মানবে না, আমি ব'লে দিলাম তোমাকে। মনে হইল, গৃহিণী সত্য কথাই বলিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশের লোক, বিশেষ করিয়া পাড়া-গাঁয়ের লোক ধুতিচাদরধারীদের খাতির করিতেই চাহে না। আমাদের

গ্রামের ফটিক ধানবাদে মোটর-ড্রাইভারি করে। সে একবার খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও হাফ-হাতা শার্ট, মোজা ও বুটজুতা পরিয়া বাড়ি আসিল। তাহাকে লইয়া গাঁয়ের লোক যা হৈ-হৈ করিল, স্বয়ং লাটবাহাদুর ধুতি-চাদর পরিয়া আসিলে তেমনটি হইত না। ফটিকের বৃদ্ধা ঠাকুরমা রাস্তায়-ঘাটে যাহারই সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারই কাছে ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, ভাগ্যে বেঁচে ছিলাম, তাই দেখতে পেলাম। তারপর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিয়াছিল, অনেক কষ্টে বাপ-মা-মরা ছেলেটাকে মানুষ করেছিলাম, সাথক হ'ল আজ। আশীর্বাদ কর সব, বেঁচে থাকুক। কিন্তু পোশাক সংগ্রহ করিব কি প্রকারে? আমাদের সরকারী ডাক্তারবাবুটির সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে, নেহাত দরকার হইলে তাঁহার কাছে পোশাক ধার করাও চলে। কিন্তু যে রকম প্যাকাটির মত দেহ তাঁহার, আমার গায়ে সে পোশাক আঁটিবে না। মনে পড়িল আমাদের নকুড়ের কথা, কালেক্টরিতে কাজ করে; সিভিক-গার্ড হওয়ার দরুন এই সব পোশাক তাহাকে পরিতে হয়। কিন্তু যে রকম বেঁটে-খাটো মানুষ সে, তাহার পোশাকও গায়ে লাগিবে না বোধ হয়। কহিলাম, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে লোকে খাতির করে না, যাদের হাতে সত্যিকার ক্ষমতা আছে, তাদেরই লোকে খাতির করে। দেখ নি, সেবার সুভাষ বোস এসেছিলেন খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি প'রে; কিন্তু কি সম্মানটা পেলেন বল দেখি? সরকারী রাস্তার ধারে বাড়ির বউ-ঝিরা কলসী কাঁখে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমন খাতির হ্যাট-কোট-পাংলুন-পরা কজন হাকিম পেয়েছে? গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, ওঁদের যা কাজ, তার ওই পোশাক। যাত্রার দলে দেখ নি, ভিন্ন ভিন্ন পার্টে ভিন্ন ভিন্ন পোশাক? ভীম নামে মালসাট মেরে কাপড় প'রে, হাতে গদা নিয়ে; কৃষ্ণ নামে ধড়াচুড়ো

প'রে, হাতে বাঁশী। কৃষ্ণের পোশাক ভীমের চলে না। বাম চোখ ছোট করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, কিছু ভেবো না তুমি। শুধু তোমাকেই তো ডাকে নি, তোমার মত আরও অনেককে ডেকেছে। শহরে হাকিমী পোশাক ভাড়া দেবার দোকান ব'সে গেছে হয়তো, সস্তা পাও তো তাই ভাড়া ক'রে নিও। মোটের উপর বুঝিলাম, গৃহিণীর অনুমতি হইয়াছে; কাজেই আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

খাইতে বসিয়াছি, এমন সময়ে আমাদের যুগলকাকা দরজায় হাঁক দিলেন, 'ও বউমা, বউমা!'—বলিতে বলিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী কাছে বসিয়া পাখা করিতেছিলেন, ত্বরিত হস্তে ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গিয়া বলিলেন, আসুন কাকা। কাকা আমার নাম করিয়া কহিলেন, ও বাড়িতে রয়েছে নাকি? গৃহিণী মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, খাচ্ছেন।

ও নাকি হাকিমী চাকরি পেয়েছে, পরানের কাছে শুনলাম। আমি জানতাম, পাবে। দু-দশ দিনের জন্যে হ'লেও করতে করতে হাত আসবে, তারপর হয়তো পাকা চাকরি পেয়ে যেতে পারে একদিন।— বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

যুগলকাকা আমার একজন শুভানুধ্যায়ী। যখন স্কুল-কলেজে পড়িতাম, কাকা বরাবর আমার পরীক্ষার ফলের তদারক করিতেন। ভাল হইলে অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করিয়া আসিতেন, এবং ভবিষ্যতে জেলার জজ অথবা ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন পদ যে আমার জন্য সরকার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন অন্তরঙ্গদের কানে কানে বলিয়া আসিতেন। আমি হাকিম হইতে না পারায় তাঁহার মত মনঃক্ষোভ বোধ করি আর কাহারও হয় নাই।

কাকা বসিয়া কহিলেন, কবে যেতে হচ্ছে বাবাজী? কহিলাম, ঠিক

জানি না। কাকা কহিলেন, ভারি আনন্দ হ'ল এ কথা শুনে। আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ভারি শক্ত কাজ বউমা। বিশ-ত্রিশটা গাঁয়ের ডাল-ভাতের মালিক। কার বাড়িতে কত ধান-চাল থাকবে, শুধু ওর হুকুমের ওপর নির্ভর করবে। ও যদি ইচ্ছে করে, আমাদের রাধানাথের মত পেট-মোটা মহাজনের কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি চড়িয়ে দিয়ে আসতে পারে। গৃহিণীর দিকে তাকাইলাম, চোখোচোখি হইতেই মৃদু হাসিলেন। কাকা কহিলেন, তুমি দুর্গা-নাম ক'রে বেড়িয়ে পড় বাবা। বাড়ির জন্যে ভাবনা নেই। বল তো আমি এসে থাকব রাত্রে। আমার স্ত্রীকে কহিলেন, আর দেখ বউমা, এক কাজ করতে হবে, আমি রামদাস-(পুরোহিত)-কে ব'লে আসব এখন রোজ ওর নামে জনার্দনের কাছে তুলসী দিতে। যেন ভালয় ভালয় কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।

সারা গাঁয়ে রাধানাথ ঢাক পিটাইয়া দিয়াছে, আমি হাকিম বনিয়া গিয়াছি। বৈকালে বৈঠকখানা হইতে পদিপিসীর গলা শুনিতে পাইলাম গৃহিণীকে বলিতেছেন, ভারি আনন্দ হ'ল শুনে বউমা। আমি জানি এ হবে। লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যার ঘরে, তার আবার না হয়! জন্ম জন্ম মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া নিয়ে বেঁচে থাক মা, ছেলেমেয়েগুলো বেঁচে থাকুক—দিনরাত ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি আমি। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল? কণ্ঠস্বর মৃদু ও যথামাত্রায় মিনতি-মিশ্রিত করিয়া কহিলেন, আমার জন্যে একটি নামাবলী কিনে আনতে ব'লে দিও মা ছেলেকে, যেটা ছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে একেবারে; আর, এক ভরি আফিং,—পাওয়া যাচ্ছে না বড়জুড়িতে, অনেকবার লোক পাঠিয়েছি।

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় আমাদের গ্রামের

তারক মণ্ডলের সহিত দেখা হইল তারক সম্পন্ন চাষী, চালের কারবার করে। দেখিলে কিন্তু বুঝিবারও জো নাই। পরিধানে গাঁয়ের তাঁতিদের বোনা সাত-হাতি মোটা ও খাটো কাপড়, কাঁধে একটা গামছা, গা খালি। দুই হাত জোড় করিয়া, কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত দেহের উর্ধ্বভাগ মাটির সহিত প্রায় সমান্তরাল করিয়া তারক পরম ভক্তিভরে আমাকে নমস্কার করিল। প্রশ্ন করিলাম, কি খবর হে মোড়ল? তারক যুক্ত হস্ত বুকে রাখিয়া, বার দুই জিব দিয়া ঠোঁট চাটিয়া সবিনয়ে কহিল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কি হবে আমাদের বলতে পারেন? আপনিও তো ওই কাজেরই কর্তা হয়ে যাচ্ছেন শুনলাম। ভারী গলায় কহিলাম, কি হবে তা তো জানি না এখনও, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা না হ'লে কিছু জানতেও পারব না। তারক সানুনয়ে কহিল, আপনি যদি আসতেন আমাদের গাঁয়ে সাহেবকে ব'লে-ক'য়ে। কহিলাম, তা কি দেবে আমাকে নিজের গাঁয়ে? তারক কহিল, যিনি আসবেন আমাদের এখানে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে নিশ্চয়, যদি আমার হয়ে তাঁকে একটু ব'লে-ক'য়ে দেন।

তারককে নিরাশ করিতে ইচ্ছা হইল না; কহিলাম, নিশ্চয় দেখা হবে, তোমার কথা ব'লে দোব, ভেবো না তুমি।

বাড়ি ফিরিবার পথে রাধানাথের দোকানে সোরগোল শুনিতে পাইলাম। থামিয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, আমার সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছে। রাধানাথ জোর গলায় বলিতেছে, হাকিমি বেরিয়ে যাবে বাছাধনের, ভাঙা হাত-পা-মাথা নিয়ে বাড়ি না ফেরে তো আমাকে 'রেধো' ব'লে ডেকো সব তখন থেকে।

পরদিন বিকালে দারোগাবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুলিসে চাকরি করিলেও বেশ ভদ্রলোক, সদাচারী ব্রাহ্মণ, মাথায় টেরির সঙ্গে

একটি ছোট টিকি, সাধারণত গম্ভীরপ্রকৃতি, কিন্তু মেজাজ ভাল থাকিলে রসিকতাও করেন। আপ্যায়নসহকারে বসাইয়া এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া হাতে দিলেন। দেখিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশ-পত্র, আমাকে একজন দলপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে; একদিন পরেই সকাল দশটায় জেলা শহরের এস. ডি. ও. সাহেবের সমক্ষে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য হাজির হইতে হইবে। নীচে এক পাশে স্থানের নাম দেওয়া আছে।

দারোগাবাবু কহিলেন, আমাদের এখানেও আসছে এক দল; তাদের থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্যে হুকুম হয়েছে।

প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যবস্থা করলেন?

দারোগাবাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিলেন, কিছুই করি নি এখনও, গাঙ্গুলী মশায়কে ব'লে পাঠাব, যা পারেন করবেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সারওয়ার্দি সাহেব মস্ত বড় একজন যোগী পুরুষ মশায়। কহিলাম, তাই নাকি? দারোগা-বাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের বড় বড় সোহং স্বামীরাও ওঁর কাছে নগণ্য। নির্বাকভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি হাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন, মন্ত্রিত্ব পেয়েই সাহেব একবার যোগাসনে ব'সে ধ্যানস্থ হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যোগদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, বাংলা দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে গোলায় গোলায় ধান-চাল ঠাসাই হয়ে রয়েছে। তা টেনে বের ক'রে সবাইকে বিলিয়ে দিতে পারলেই দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি আশ্চর্য রকমের সহজ সরল সমাধান বলুন দেখি! চারিদিক ভেবে-চিন্তে, বুদ্ধি খরচ ক'রে আর কেউ কি কোনদিন করতে পারত? ভ্রূ দুইটি উপরে তুলিয়া, মাথায় মৃদু ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, অসম্ভব। নেহাত

যোগবল ছাড়া অতবড় একটা জটিল সমস্যার এ রকম একটা মিরাকুলাস মীমাংসা করা কারও সাধ্য ছিল না। হাসিয়া কহিলাম, সত্যি! আমরা যারা গ্রামে বাস করি, তারা তো দেখেছি—। দারোগা বাধা দিয়া কহিলেন, কি দেখেছেন? কহিলাম, গ্রামে কারও ধান নেই, যা ছিল মাড়োয়ারীর হাত দিয়ে দেশের বাইরে চ'লে গেছে। দারোগা চোখ বড় করিয়া নাক উঁচাইয়া ধমকের সুরে কহিলেন, আপনাদের দেখার মূল্য কি মশায়? কটা চোখ আপনাদের? দুটো তো? মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওতে হবে না, তিনটে চাই—ত্রিনয়ন, শিবের ছিল আর যোগী পুরুষদের আছে। কহিলাম, আর আপনাদের—মানে, হাকিমদেরও। দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, পুরোপুরি তিনটে নেই ছোটদের, সওয়া দুটো; বড়-বড়দের আড়াইটে। তা আমরাও তো টের পাই নি কিছুই।

কহিলাম, পেয়েছিলেন বইকি মশায়। না হ'লে আমাদের জেলার একজন জাঁদরেল হাকিম কি ক'রে বলেছিলেন, এ জেলায় প্রচুর ধান মজুত আছে, বাইরে থেকে আমদানি করবার তো প্রয়োজন নেইই, বরং এখান থেকে বাইরে চালান দেওয়া উচিত। তাই মাস কয়েক আগে আমরা যখন চাষী ও মহাজনদের মধ্যে ধান বাইরে বিক্রি না করবার জন্যে আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করেছিলাম, আপনারা সবাই বাধা দিয়েছিলেন। দারোগাবাবু এক মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিয়া ভারী গলায় কহিলেন, সেটা সরকার ভালই করেছিলেন। যারা আপনাদের জন্যে যুদ্ধ করছে, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা উচিত। কিন্তু ও কথা যাক, ব্যাপারটা হচ্ছে এই, পাড়াগাঁয়ে যে ধান একেবারেই নেই তা নয়, এক-একটা গ্রামে হয়তো দু-চারজনের আছে এবং থাকাটা অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। শহরের বড়লোকেরা টাকা

জমায় ব্যাঙ্কে, পাড়াগাঁয়ের বড়লোকেরা ধান জমায় গোলায়, দুটোতে কোন তফাত নেই। এখন ওই ধান বের ক'রে যাদের অভাব আছে, তাদের দিতে হবে—অবশ্য একেবারে নয়, সুরাহা হ'লে সুদ সমেত তারা শোধ ক'রে দেবে। আচ্ছা, সরকার যদি এমন আদেশ দিতেন যে, যেহেতু খাদ্যের মূল্য খুব বেশি এবং দেশের অধিকাংশ লোকের আয় সামান্য, কাজেই দেশের লোক খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারছে না, অতএব বড়লোকদের ব্যাঙ্কে জমানো টাকা সব বের ক'রে সবাইকে ধার দিয়ে দেওয়া হবে, শহরে শহরে কি রকম একটা তুমুল আন্দোলন চলত বলুন দেখি! অবশ্য এ ব্যাপারটা টাকা নিয়ে নয়, ধান নিয়ে, সঞ্চয়ীদের বাড়ি শহরে নয় গ্রামে; কাজেই হৈ-চৈ যা হচ্ছে কাগজে কলমে, গলার জোর কারও শোনা যাচ্ছে না।

কহিলাম, একটা কথা নিবেদন করি, এক-একটা গাঁয়ে যে ধান আছে, তা সবাইকে ভাগ ক'রে দিলে কি সবাইকার অভাব মিটবে? দারোগাবাবু কহিলেন, কিছুতেই না, আর যদি মেটেই, তবু ওই ধান বের করবে কারা এবং কেমন ক'রে? যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা অধিকাংশই কেরানী অথবা মাস্টার, জাঁদরেল হাকিমরা কেউ যাচ্ছেন না, ম্যাজিস্ট্রেট ও এস. ডি. ও. অবশ্য মোটর-যোগে তদারক করতে পারেন ইচ্ছে হ'লে, কিন্তু আসল কাজটা করবে এই নিরীহ মাস্টার আর কেরানীর দল। সঙ্গে চৌকিদার থাকবে বটে, কিন্তু তারাও গ্রামের লোক। তা ছাড়া, গ্রামের যাদের বাড়িতে কিছু সঞ্চয় আছে, তাদের অনেকেই হয় ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অথবা জবরদস্ত মেম্বার, কেউ কেউ আবার হাকিমদের অনুগৃহীত ব্যক্তি, কাজেই চৌকিদারই বলুন, দফাদারই বলুন, কারও কাছ থেকে বিশেষ কিছুই সাহায্য পাওয়া যাবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, সরকার ফতোয়া জারি

করছেন বটে, কিন্তু গা বাঁচিয়ে চলছেন, ভাবটা এই—বাপু হে, তোমাদের অভাব কিছু নেই, সব আছে তোমাদের, খুঁজে-পেতে নাও। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, একেবারে উঁচু সাধনমার্গের কথা, বড় বড় মুনি-ঋষিরাও তো ওই কথাই আমাদের ব'লে গেছেন—ওহে অমৃতের পুত্রগণ! সব ঐশ্বর্য তোমাদের নিজেদের মধ্যেই নিহিত আছে, সাধনার দ্বারা তাকে করায়ত্ত কর।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করিয়া উঠিলাম। আসিবার আগে দারোগাবাবু কহিলেন, নানা কথা বললাম, বন্ধুর মত মনে করি আপনাকে, কারও কাছে বলবেন না। কহিলাম, আমাকে কি সেই রকমই মনে করেন না।ক? দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, মনে করি না ব'লেই দু-চারটে মনের কথা বলি; সরকারী চাকরি করলেও আমরা তো আপনাদেরই।

জবাব দিলাম না। মনে হইল, আপনাদের বড় ছোট সব প্রভুদেরই শৃগালত্বের কথা আমরা ভাল করিয়াই জানি। কিন্তু আপনারা নীলবর্ণের মহিমায় সে কথা ভুলিয়া যান, এই আমাদের দুঃখ।

গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ি গেলাম। দেখিলাম, বৈঠকখানায় বসিয়া জমা-খরচ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভায়া, ব'স। বসিয়া কহিলাম, কি হচ্ছে? গাঙ্গুলী মশায় মুখ তুলিয়া কহিলেন, প্রজাদের চাষের ধান, যাকে যা দেবার দিয়ে দিলাম। কহিলাম, এত তাড়াতাড়ি? সব যদি দুদিনে খরচ ক'রে বসে? গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তা তো করবেই, ঠিক চাষের সময় আবার হাত পাতবে এসে। কিন্তু কি করব বল? সরকার যে কি ব্যবস্থা করবে তা তো বলা যায় না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, আরও দিয়ে দিলাম কতক, বাকি দু-চারটি যা রইল তারও ব্যবস্থা করেছি এক রকম। কহিলাম, কি? গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, দেখাচ্ছি, এস।

গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেলাম। বিস্তৃত উঠানের এক পাশে লম্বালম্বি গোয়াল-ঘর। তাহারই একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড খড়ের পালুই। তাহার পাশে কতকটা জায়গা শাক-সব্জির ক্ষেত, এ বৎসর এখনও কিছুই ব্যবস্থা হয় নাই, তবে সম্প্রতি কতকটা জায়গা লইয়া শাকের ক্ষেত তৈয়ারি করা হইয়াছে।

সেখানে লইয়া গিয়া গাঙ্গুলী মশায় চোখের ইঙ্গিতে কহিলেন, ওইখানে। বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি! বৃষ্টি হ'লে সব নষ্ট হয়ে যাবে যে! গাঙ্গুলী মশায় করুণ কণ্ঠে কহিলেন, কি করব বল? হয়তো নষ্ট হবে কিছু, কিন্তু নিয়ে যেতে তো পারবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ব্যবস্থা করেছি যতদূর সম্ভব, নীচে পাশে তালাই পেতে দিয়েছি, ওপরেও দু-তিনখানা তালাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, কটা দিন তো।

প্রশ্ন করিলাম, গর্ত খুঁড়ে এসব ব্যবস্থা করলে কে? কহিলেন, আমি আর তোমার দিদিমা, আর কাকে বিশ্বাস করা যাবে বল? কাল সারা রাত ধ'রে ওই কর্ম করা গেছে। একটু হাসিয়া কহিলেন, ভায়া, একটা হাত কেটে দেওয়া যায়, কিন্তু সঞ্চয় পরের হাতে তুলে দেওয়া ভারি শক্ত। তা ছাড়া সরকার মাথা গুনতি হিসেব ক'রে খাবার রেখে যাবে বলছে। হাতে হাতে পূজো আসছে, মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনীরা সব আসবে; সরকার তাদের তো কোন ব্যবস্থা ক'রে রেখে যাবে না! আর চাল বাড়ন্ত ব'লে তাদের আসতে নিষেধ করতে পারব না। শেষে বস্তা কাঁধে ক'রে ধান ধার করতে বেরুব নাকি?

কহিলাম, দিদিমা কোথায়?

সারাদিন প'ড়ে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, আবার বিকেলে বলছে, গা-হাত-পা কনকন করছে, বেতো রুগী তো।

আপনার শরীর-খারাপ হয় নি?

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া মুখ কুঁচকাইয়া কহিলেন, খুব। কিন্তু উপায় কি বল? সব ব্যবস্থা তো আমাকেই করতে হবে।

বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথ কি করলে? গাঙুলী মশায় কহিলেন, চালাক ছেলে। অনেক লোক তাঁবেদারে, চার হাজার টাকার ধান আজ বিক্রি করেছে মাড়োয়ারীকে, টাকায় পাঁচ পাই দরে, তখন গাঁয়ের লোককে চার পাই দরে বিক্রি করতে রাজি হ'ল না। বাকি ধান সব চালান ক'রে দিয়েছে খাতকদের ঘরে ঘরে। কহিলাম, যদি ফেরত না দেয়? গাঙুলী মশায় ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, ওর ধান কেউ মারবে না ভায়া। জানে তো সব জাল-জোচ্চুরি—কিছুতেই পিছ-পা নয় ও।

কহিলাম, আমাকে তো কাল যেতে হবে, কালই দশটার সময়ে মীটিং, এস. ডি. ও. সাহেব সব বুঝিয়ে দেবেন সবাইকে। গাঙুলী মশায় কহিলেন, কোথায় দিয়েছে? স্থানের নাম বলিলাম। গাঙুলী মশায় কপাল কুঁচকাইয়া কহিলেন, জেলার ওদিকে কোন জায়গা হবে বোধ হয়, ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া দুর্গা-নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। গ্রাম হইতে কতকটা হাঁটিয়া আসিয়া বাস ধরিতে হয়। রাধানাথের দল ছাড়া পাড়ার সবাই প্রোসেশন করিয়া বিদায় দিতে আসিল।

বাসে আরও জনকয়েক ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা ওই কাজেই চলিয়াছেন। জোড়দা মাইনর-স্কুলের হেডমাস্টার ও হেড-পণ্ডিত, রোনেড়া হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ও জনকয়েক সহকারী শিক্ষক, পিয়ালডাঙা হাই-স্কুলের হেডমাস্টার হেমন্তবাবু, অন্যান্য আরও দুই-

চারিটা স্কুলের শিক্ষক, সকলেরই খুব উৎসাহ দেখিলাম। হেমন্তবাবু তো সস্ত্রীক চলিয়াছেন; বছর খানেক হইল দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন, এই সুযোগে হানিমুনটা সারিয়া আসিবেন বোধ হয়। আগেই আলাপ ছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, সস্ত্রীক যে? উঠবেন কোথায়? উত্তর দিলেন, আমার শ্বশুর থাকেন শহরে, উকিল। উঠব তাঁরই বাড়িতে। আমাকে যেখানটায় দিয়েছে, সেখানে শুনলাম ভাল ডাক-বাংলা আছে একটা, কাছেই পাহাড়-জঙ্গল, দেখবার মত জায়গা, শুনে উনিও যেতে চাইলেন। মনে একটু হিংসা হইল, ভাবিলাম, আছেন বেশ! প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েগুলি বড় হইয়া খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে, দ্বিতীয় পক্ষটি এখনও শুরু করেন নাই, কাজেই ঝাড়া-হাত-পা লইয়া দুই সপ্তাহের হাকিমিটা পুরাপুরি ভোগ করিয়া আসিবেন। আর আমাদের থাঁটি নন্দনকাননে পাঠাইলেও, এক পাল ছেলে-মেয়ে সমেত গৃহিণীকে লইয়া টানা-পোড়েন করার মজুরি পোষাইত না।

নকুড়ের বাসাতেই উঠিলাম। নকুড় বাড়িতে ছিল না, সকালে কাছারি। বউমা আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিলেন, উনি বলছিলেন কাল, আপনি আসবেন। পুলকিত হইয়া কহিলাম, কি ক'রে জানলে? বউমা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানতে পেরেছিলেন কি ক'রে। ছোট-খাটো শ্যামবর্ণের মেয়েটি, ভারি মৃদু স্বভাব ও সকলের সঙ্গে ভারি মিষ্ট ব্যবহার, যে-ই বাসায় আসে তাহাকেই অত্যন্ত আদর ও আপ্যায়ন করে। ফলে, নকুড়কে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হয়। গ্রামের লোক শহরে আসিলে নকুড়ের বাসাতেই আহার ও শয়ন করে; অনেককে মকদ্দমা-খরচ গাড়ি-ভাড়া পর্যন্ত ধার দিতে হয় এবং তাহা কখনও আদায় হয় না।

বউমা কহিলেন, আপনি মুখ-হাত ধোন। কহিলাম, মুখ-হাত ধোবার সময় নেই বউমা, আমার এখনই মীটিং। বউমা দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, তা হোক, আমার সব তৈরি আছে, আপনি মুখ-হাত ধুয়ে নিন, কিছু দেরি হবে না। মেয়েদের স্নেহ ও শ্রদ্ধার অনুরোধ আদেশেরই সামিল, তামিল করিতে চলিলাম।

খাবার খাইতে খাইতে সংসারের খবর লইতে লাগিলাম। বউমা সামনে বসিয়া পাখা করিতেছিলেন; হাতে এক-হাত ঝকঝকে সোনার চুড়ি, নূতন গড়ানো বোধ হইল। এই যুদ্ধের বাজারে আমরা স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতেছি, আর নকুড় নূতন গহনা গড়াইতেছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, নকুড়ের মাইনে এখন কত?

ষাট।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, আর কোন রোজগার নেই?

বউমা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, উপরি পান।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত?

উত্তর আসিল, প্রায় দুশো, অনেক ব্যবসাদারকে নাকি ওঁর কাছে কাজের জন্তে আসতে হয়। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, জিনিসপত্তরও খুব সুবিধে দরে পাওয়া যায়।

দু সপ্তাহের হাকিমির আনন্দটা নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। তারপর আবার সেই মাস্টারি, সেই নিত্য অভাব ও অনটন, সেই স্বল্প আয়ে বৃহৎ পরিবারের বিবিধ প্রয়োজন মিটাইবার প্রাণপণ চেষ্টা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িবার উপক্রম হইলে অতি কষ্টে সামলাইলাম।

আদালতের কাছে একটি নাতি-বৃহৎ বাড়িতে সভার আয়োজন করা হইয়াছে। বাড়িটি দেখিতে সুন্দর, বড় বড় জানালা-দরজা, নানা-রঙের কাচওয়ালা সার্সি; বাড়িটির মাথায় সিমেন্টের তৈয়ারি

দুইটি মুখামুখি-শায়িত সিংহের মূর্তি, তাঁহাদের ঠিক মাঝখানে একটা নাতি-দীর্ঘ লৌহ-শলাকায় ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছে। বাড়িটি নাকি জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থেই প্রস্তুত, কিন্তু প্রধানত হাকিমদের ভোগের জন্যই উৎসর্গীকৃত। দুই-একটা জনসভা (অবশ্য যথাসময়ে উপর-ওয়ালাদের হুকুম লইতে পারিলে) এখানে অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু প্রধানত হাকিমদের সান্ধ্য আড্ডার জন্যই বাড়িটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাড়িটির সামনে অত্যন্ত ভিড় দেখিলাম। দেখিলাম, সারা জেলার মাস্টার, পণ্ডিত, পাঠশালার গুরু-মহাশয়েরা পর্যন্ত, কেহ বাদ পড়ে নাই। সমবেত আলোচনার ফলে যে কোলাহল উঠিয়াছে, তাহা স্কুল-পাঠশালারই উপযুক্ত। এক পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে শহরের দুই-চারিজন ভদ্রলোক আসিয়া একেবারে ভিতরে গিয়া বসিলেন। দেখাদেখি আমরাও ভিতরে ঢুকিলাম। খান কয়েক বেঞ্চি ও চেয়ার পাতিয়া আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাড়াতাড়ি একটা জায়গায় বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বেঞ্চি-চেয়ারগুলি ভর্তি হইয়া গেল এবং বাকি লোকগুলি পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শুধু মাস্টার ও পণ্ডিত নয়, দুই-একজন নিম্নপদস্থ হাকিমও রহিয়াছেন। তাঁহাদের পরিধানে হাফ-প্যাণ্ট, টুইলের শার্টের উপর বুক-খোলা কোট, শার্টের কলারটা কায়দা করিয়া কোটের গলার উপর লটকাইয়া দিয়াছেন, পায়ে মোজা ও জুতা। সকলের সামনে চেয়ারে বসিয়া পা দোলাইতেছেন। এক পাশে চেয়ারে বসিয়া আছেন আর একজন সাহেব,—পরিধানে পুরা প্যাণ্ট, শার্ট কোট মায় টাই পর্যন্ত, পায়ে আনকোরা মোজা ও বার্নিশ-করা জুতা; চেয়ারে হেলান দিয়া পা দুইটা প্রসারিত করিয়া দিয়া বসিয়া

আছেন, যেন জুতার বার্নিশ ও মোজার নূতনত্ব সম্বন্ধে উপস্থিত কাহারও কোন সন্দেহ না থাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ইনি জেলা-স্কুলের হেডমাস্টার,—সোনার পাথর বাটি, পদে মাস্টার হইলেও মান্যে ও মাহিনায় হাকিম-তুল্য। আর এক পাশে চেয়ারে জন তিনেক কলেজের অধ্যাপক—দেশী হইলেও আমাদের মত রাস্তার নহেন, নিয়মিত আহার ও পরিধেয় জোটে। হঠাৎ একটা লোক আসিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িয়া গুঁতাগুঁতি করিতে লাগিল। কহিলাম, জায়গা নেই, আর একটু এগিয়ে দেখুন না, সামনে চেয়ার খালি আছে। লোকটা কহিল, একটু কষ্ট ক'রেই বসুন না মশায়। চিরদিন বাস করতে তো আসেন নি। মেরে-কেটে পনরো মিনিট, হাকিম এলেন ব'লে। কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া কহিল, স্কোয়াড-মাস্টার, না, আমার মত সাবর্ডিনেট? কহিলাম, সম্ভবত স্কোয়াড-মাস্টার। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে? স্থানের নাম করিলাম। লোকটা অত্যধিক পুলকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, বলেন কি! আমিও তো ওইখানেই, ভাল হ'ল আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল। কখন যাবেন? একেবারে হৃদিলগ্ন হইবার উপক্রম করিয়া কহিল, একসঙ্গে দুজনে যাওয়া যাবে, কি বলেন? কোনমতে একটু সরিয়া কহিলাম, কিসে যেতে হয়? লোকটা কহিল, কেন, হেঁটে, আমাদের গাঁয়ের সামনে দিয়েই রাস্তা, মোটে মাইল দশ এখান থেকে।

বাস-টাস নেই?—জিজ্ঞাসা করায় বলিল, কোথায় পাবেন, ইউনিয়ন-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা, বার দুই বৃষ্টি হ'লেই এক-হাঁটু কাদা। মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইয়া কহিল, মহাপ্রভুরা যে হুট ক'রে মোটরে গিয়ে হাজির হবেন, তার উপায় নেই। দুজনে পরামর্শ ক'রে যা করব তাই হবে। কহিলাম, শুধু আপনিই যাবেন নাকি? ঘাড় নাড়িয়া

লোকটা কহিল্, না। আরও আছে জন তিনেক—দুজন পাঠশালার পণ্ডিত, একজন ঋণসালিসী আপিসের কেরানী। সাহস দিয়া কহিল, তা কোনও ভয় নেই আপনার, কালেক্টরির পাকা ঘুন কেরানী আমি, সরকারী কাজ কেমন ক'রে করতে হয় খুব জানা আছে।

কোলাহল প্রবলতর হইয়া উঠিতেই পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, যাহারা বসিয়া ছিল তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; আমরাও দেখাদেখি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হাকিম বাহাদুর গটগট করিয়া আমাদের পাশ দিয়া সামনে আগাইয়া গিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেবের দোহারা গঠন, পরিধানে পুরা প্যাণ্ট, গায়ে সেলুলার শার্ট, কোট নাই, পায়ে মোজা ও জুতা, মুখ ও চোখ দেখিয়া মনে হয়, অত্যন্ত রুক্ষ ও গর্বিত প্রকৃতির লোক। উঠিয়া দাঁড়াইয়া মোটা কর্কশ স্বরে কহিলেন, আপনাদের সরকার কি জন্যে ডেকেছেন, তা সকলে জানেন, আর বুঝিয়ে বলতে হবে না বোধ হয়, বলবার সময়ও নেই। তবে আপনাদের কি কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু-চার কথা আমি ব'লে দোব।—বলিয়া একখানা চটি বই খুলিয়া কহিলেন, এই বইখানাতে সব আইন-কানুন লেখা আছে, আপনারা প্রত্যেকেই এক-একখানা ক'রে বই পাবেন, পেলে প'ড়ে সব বুঝতে পারবেন, আশা করি। আমি এই বই থেকে আপনাদের প'ড়ে শোনাচ্ছি, বেশ মন দিয়ে শুনুন, গোলমাল করবেন না।—বলিয়া গড়গড় করিয়া মিনিট পনরো ধরিয়া ইংরেজী ভাষায় রীডিং পড়িয়া গেলেন, অবশ্য মাঝে মাঝে কাশিলেন, ঢোক গিলিলেন ও পিঠ চুলকাইলেন (ঘামাচি হইয়াছে বোধ হয়)। আমরা কতক বুঝিলাম, কতক বুঝিলাম না; পিছনে দাঁড়াইয়া যাহারা ছিল তাহারা বোধ করি শুনিতেই পাইল না, বুঝিবে

কি! একজন সবিনয়ে আবেদনও করিল, হুজুর, একটু উঁচু ক'রে—। হুজুর ধমক দিয়া কহিলেন, এর চেয়ে উঁচু গলায় পারব না, পরে বই প'ড়ে নেবেন, এখন চুপ ক'রে শুনুন।

যতটুকু বুঝিতে পারিলাম, তাহাতেই স্বর্গ-চ্যুতি ঘটিল। এক-একজন স্কোয়াড-মাস্টারের অধীনে আটজন কর্মচারী, চারজনকে সরকার ঠিক করিয়া দিবেন, চারজনকে সরজমিনে গিয়া নিজেকে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ইহাদের থাকা ও খাওয়ার ভার স্কোয়াড-মাস্টারের স্কন্ধে। নিজের পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া শহর হইতে চাল-ডাল-তেল-নুন-মসলা-চা-চিনি-কেরোসিন ইত্যাদি কিনিয়া (অবশ্য কণ্ট্রোলের দরে) মোট-পুঁটুলি বাঁধিয়া নিজের খরচে অনুচরবর্গ সহ কর্মস্থানে পৌছিতে হইবে ; বাড়ি ভাড়া করিয়া ঠাকুর-চাকর বাহাল করিয়া হোটেল খুলিতে হইবে। কোন প্রতিপত্তিশালী লোকের আশ্রয়ে থাকিলে চলিবে না। কাহারও কাছ হইতে কোন সাহায্য লওয়া চলিবে না। অবশ্য সরকার বাহাদুর করুণাপরবশ হইয়া থানার দারোগা ও ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদিগকে যথাসাধ্য সব বিষয়ে সাহায্য করিতে হুকুম দিয়াছেন। তারপর নিজের পয়সায় খাইয়া ও খাওয়াইয়া যে কাজ করিবার ফিরিস্তি শুনিলাম, তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে খাদ্যান্বেষণ, লোকগণনা, গরু-বাছুরের হিসাব করা, জমি-জমার পরিমাণ-নির্ণয়, বীজধান কত লাগিবে তাহার পরিমাণ স্থির করা, সঞ্চয়ী লোকের সঞ্চয় নিষ্কাশন ও বড় বড় লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মজুদ মালের হিসাব করা, রাস্তা-ঘাটে মাল-বোঝাই গাড়ি ও নৌকার তদারক, গ্রামে গ্রামে পল্লীমঙ্গল-সমিতি গঠন ও সমবায়-সমিতি স্থাপন এবং খাদ্যাভাব ঘটিলে সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন না করিয়া অথবা চুরি-ডাকাতি না করিয়া আমৃত্যু

অর্ধাশন অথবা অনশন অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশদান,—এক কথায় পনরো-কুড়ি দিনের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের খাদ্য-সংস্থানের একটা সঠিক হিসাব করিয়া—উদ্বৃত্ত থাকিলে অভাবীদের সম্ভাবীদের পিছনে লেলাইয়া দিয়া, না থাকিলে অভাবীদের পাইকারী পিঠ থাবড়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। পারিশ্রমিকের কোন উল্লেখ নাই, পকেট হইতে যে টাকাটা বাহির করিতে হইবে, তাহা আদায় হইবে কি না—তাহারও কোন ভরসা নাই। কপাল ঘামিয়া উঠিল, কাপড়ের খুঁটে মুছিলাম।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, হুজুর, আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, যেখানে হোক গিয়ে থাকবার খাবার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারব। কিন্তু যাঁরা শহর থেকে যাবেন. তাঁদের খুব অসুবিধে হবে। তাঁদের যদি আপনি কোন ব্যবস্থা ক'রে দেন—। হুজুর বাহাদুর গর্জন করিয়া উঠিলেন, আপনাকে কারও জন্যে মোড়লি করতে হবে না, যাঁর যা বক্তব্য আছে, আমাকে যেন বলেন গিয়ে। ভদ্রলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বসিয়া পড়িল।

আমার পাশের লোকটা আমাকে কনুইয়ের গুঁতা দিয়া কহিল, কি রকম তেজী হাকিম দেখেছেন আমাদের! এত বড় লোকটাকে থ ক'রে দিয়েছে একেবারে! ব্যঙ্গের স্বরে কহিলাম, খুব ভাল কাজ করেছে নাকি? লোকটা কহিল, হাকিমদের সামনে বাহাদুরি করতে যাওয়া কেন? বাবা! জাত কেলে-সাপ, হেলে ঢোঁড়া নয়। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আপিসে সব একশা ক'রে দেয় মশায়। কথায় কথায় 'ড্যাম সোয়াইন'—একেবারে হুবহু আসল সাহেবের গলায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত ভয় করে ওকে। জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

এস. ডি. ও. কহিলেন, আপনারা চারটের সময় আমার আপিসে

আসবেন, কাগজ-পত্র যা যা দরকার পাবেন তখন।—বলিয়া সমস্ত বিষয়টা জলের মত সহজ করিয়া দিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই আমার পাশের লোকটা আমার কাঁধটা খামচাইয়া ধরিয়া এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, কবে যাচ্ছেন বলুন দেখি? কালই তো? সোজা রাস্তা শহর থেকে, একটা কুলির মাথায় জিনিস-পত্র চাপিয়ে চ'লে যাবেন গটগট, আমি বরং ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে খবর দিয়ে দোব, আমার বাড়ির কাছেই তো। তারপর বাম চোখ বুজিয়া, একটু হাসিয়া, কণ্ঠস্বর মৃদু ও ঘন করিয়া কহিল, সব শুনলেন তো? আমাদের খাওয়া ও থাকার সব খরচ আপনার। ভ্রূ দুইটা তুলিয়া, চোখ দুইটা বড় করিয়া, মাথায় একটা বাঁকা টান দিয়া, টানিয়া টানিয়া কহিল, সব খরচ। কহিলাম, মানে? লোকটা মুচকি হাসিয়া কহিল, মানে, শুধু ভাত জল খাওয়া নয়, আরও যা যা খাব তারও খরচ দিতে হবে। বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, আবার কি খাবেন? লোকটা হাস্যবিকশিত মুখে কহিল, কেন, নেশা?—বলিয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটা তির্যক ভঙ্গীতে আমার মুখের দিকে স্থির করিয়া দিল। লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ভ্রূ দুইটা নাই বলিলেই হয়, কিন্তু লম্বা গোঁফ ঠোঁটের দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মাথার সামনে বাম দিক ঘেঁষিয়া একটা ঘূর্ণি, চুলগুলা এমনই বাঁকিয়া গিয়াছে যে, তেড়ি কাটিবার প্রয়োজন হয় না। চোখ দুইটা লাল, নেশাখোর বলিয়া পরিচয় দিলে সন্দেহ করিবার নাই। কহিলাম, কি নেশা করেন আপনি? লোকটা মাথা নাড়িয়া কহিল, অতি শস্তা মশায়,—গাঁজা। বেশি নয়, ভরি খানেক নিয়ে যাবেন, তাতেই কুলিয়ে গুছিয়ে নোব আমি। কহিলাম, এ খরচও আমাকে দিতে হবে? লোকটা ভুরু নাচাইয়া,

চোখ ঘুরাইয়া কহিল, বাঃ! তা হবে না? আপনি হচ্ছেন দলের অধিকারী, আসামীদের সব খরচ তো আপনাকেই দিতে হবে। গম্ভীর হইয়া কহিল, তা ছাড়া কাজ তো শুনলেন, সারাদিন মাঠ-ঘাট ভেঙে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা, এক-আধ টান না দিলে ও-ধকল কাটানো কি সোজা? সবাইকে ওই পথের পথিক হতে হবে, দেখবেন। আপনিও বাদ যাবেন না। মুখের ও স্বরের ভঙ্গী বদলাইয়া কহিল, জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গেছি, কি করেন আপনি? কহিলাম, হেডমাস্টার। মাথাটা ওপরে ও নীচে নাড়িয়া কহিল, ওঃ! তাই। এসব কেনা-টেনা আপনার দ্বারা হবে না মশায়, আমাকে পয়সা দিয়ে দিন বরং, কিনে নিয়ে যাব, দিন।—বলিয়া ডান হাতটা মেলিয়া ধরিল। আমি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া ভারী গলায় কহিলাম, ওসব আমার কাছ থেকে হবে না মশায়। আমি চললাম।—বলিয়া চট করিয়া পিছন ফিরিয়া চলিতে শুরু করিলাম। লোকটা হাঁকিল, ও মশায়! চ'লে যাচ্ছেন যে, শুনে যান। আমি কর্ণপাত না করিয়া পদচালনার বেগ দ্রুততর করিলাম।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, নকুড় আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, কি দাদা, হয়ে গেল? হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, হয়ে গেল এখনকার মত। আবার যেতে হবে বিকেল-বেলায় কাগজপত্র আনতে। নকুড় কহিল, কি মনে হ'ল? পেরে উঠবেন? মলিন মুখে কহিলাম, কাজ না হয় এক রকম ক'রে করা যাবে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা শুনেই ঘাবড়ে যেতে হচ্ছে। নকুড় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, কেন? ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্টের ওখানে গিয়ে উঠবেন, কিছু ভাবতে হবে না, তারপর জামাইয়ের আদরে থাকবেন। চিন্তিত মুখে কহিলাম, শুধু নিজে তো নয়, আরও আট মূর্তি

আছেন যে। নকুড় সাহস দিয়া কহিল, কোনও ভাবনা নেই, সবাই নিজের নিজের ব্যবস্থা ক'রে নেবে, দেখবেন। কহিলাম, তুমি তো বেশ বললে হে; কিন্তু আইনে বাধে যে! সকলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে—এই হ'ল নাকি আইনের নির্দেশ। নকুড় অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, নির্দেশ! আপনাদের মত দু-চারজন ছাড়া কেউ ওটা কানেও নেয় নি, দেখুনগে। আমাদের আপিস থেকে যারা যাচ্ছে, তারা তো বগল বাজাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ফুর্তির হেতু?

দিন কয়েক বাইরে ঘুরে আসবে। রাহা ও খাই-খরচ যা পাবে পকেটে পুরে, পরের স্কন্ধে ভোগ ক'রে আসবে। কাজ এখানেও যা, সেখানেও তাই—সেই কলম পেষা। কহিলাম, শুধু কলম পেষা নয় হে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হবে। নকুড় বিজ্ঞতার ভঙ্গীতে কহিল, সেসব আনাড়ী স্কুল-মাস্টাররা করবে, এরা সব ঘুঘু লোক তো, আরও দু-চারবার ও-ধরনের সরকারী কর্ম করা হয়ে গেছে সবারই, ওরা প্রত্যেক গাঁয়ে দু-দশ ঘর নিজেরা ঘুরবে, তারপর চাপিয়ে দেবে গাঁয়ের লোকের ঘাড়ের ওপর। ঢোক গিলিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, রিপোর্ট যদি লেফাফা-দুরস্ত হয় তো কেউ কিছু উলটে দেখবে না। চুপ করিয়া রহিলাম। নকুড় বলিতে লাগিল, আর আপনাদের তো রাজার হাল। খাবেন-দাবেন, গ্রামের দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন তো তাস-পাশা খেলবেন, আর অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন। তবে লেখাপড়ার কাজটা একটু নিজে দেখে শুনে নিতে হবে। কোন কষ্ট হবে না দাদা, চ'লে যান আপনি। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলাম, কিন্তু টাকা? নকুড় বিস্ময়ের স্বরে কহিল, কিসের টাকা? রাহা আর খাই-খরচ? সে তো সরকার যা দেবে, পরে দেবে, এখন তো—। বাধা দিয়া কহিলাম, নিজের পয়সা খরচ ক'রে খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে,

তা তো আগে জানতাম না ভায়া, তাই বিশেষ কিছুই সঙ্গে আনি নি। কাজেই—। নকুড় কহিল, এখন দশ-বিশ টাকা দরকার হয় তো আপিস থেকে আগাম নিতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কিছু দরকার হবে না। আপনি চ'লে যান সেখানে, গিয়ে দেখবেন, সব ব্যবস্থা আপনা থেকে হয়ে যাবে। খুঁতখুঁত করিয়া কহিলাম, তা কি হয় হে? মাস্টার মানুষ হয়ে পরের ঘাড়ে খাওয়া কি উচিত?

নকুড় হাসিয়া কহিল, এই তো আপনাদের দোষ। এইজন্যেই এই যুদ্ধের বাজারে কত লোক কত ক'রে নিলে, আপনারা যে-কে সেই থেকে গেলেন।

নকুড়ের পরিধানে লংক্লথের ঢিলা পায়জামা, গায়ে খেলোয়াড়ী গেঞ্জি। এই যুদ্ধের জোয়ারে নকুড়ের ঘরেও অনেক কিছু ঢুকিয়াছে, ফলে মেদ ও মেধা—দুইয়েরই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। প্লাবনের পলি-মাটিতে বিলাতী বেগুন কুমড়া বনিয়াছে, কথায়-বার্তায় পাটোয়ারী বুদ্ধি ঝকমক করিতেছে।

বিকালবেলায় কাছারিতে গেলাম। অত্যন্ত ভিড়। সকলে এখানে ওখানে দল বাঁধিয়া—কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আলাপ ও আলোচনা করিতেছে। একজন পুরাতন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল, এখন মাস্টারি করে, মুখ চুন করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনাকেও টেনেছে নাকি সার্? কহিলাম, হ্যা হে। যা বেড়াজাল ফেলেছে, চুনোপুঁটি কেউ বাকি আছে ভাবছ? তারপর, কি খবর? ছাত্র ম্লানকণ্ঠে কহিল, কি যে করব সার্, বুঝতে পারছি না। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বললে—যেখানে আমাকে দিয়েছে, সেখানে শুধু উৎকল বামুনের বাস, অত্যন্ত কৃপণ সব, তা ছাড়া অত্যন্ত গোঁড়া, খাবার থাকবার ব্যবস্থা করাই মুশকিল। তার ওপর

যাঁরা আমার সহকর্মী হয়ে যাবেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে আসছে।—বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে সহকর্মীদের নির্দেশ করিল। দেখিলাম, কিছু দূরে একটা গাছের নীচে বিশ-ত্রিশজন বিদেশী লোক, পরিধানে কোট, পাৎলুন, মাথায় হ্যাট, মুখে সিগারেট, জটলা করিতেছে। ছাত্র কহিল, ওদেরই জন দুই আমার সঙ্গে যাবে শুনেছি। কহিলাম, কে ওরা? বলিল, কলকাতা থেকে এসেছে সব, সরকারী চাকরে, আমার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি মাইনে পায়, আর পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্যটা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। সাহস দিয়া কহিলাম, ওতে আর ভয় কিসের? মিলে-মিশে কাজ করবে। ছাত্র করুণ কণ্ঠে কহিল, তা তো করব সার্, কিন্তু খাওয়া থাকা? ওরা দুজনেই নাকি মুসলমান, উৎকল বামুনের গাঁয়ে কে ওদের ঠাঁই দেবে? তা ছাড়া খাবার ব্যবস্থা ওরা নিজেরা করবে কি না জানি না, না করলে তো আইনমত আমাকেই করতে হবে? মোটা মাইনের লোক সব রোজ মাংস পোলাও খাওয়া অভ্যাস। আর কিছু না হোক, ঝাঁকা দুই মুরগী আর মুরগীর ডিম তো সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। মনে মনে হাসিয়া কহিলাম, ইহার চেয়ে আমার আবগারী সহকর্মীটি তো ঢের ভাল।

হঠাৎ পিছন হইতে ডাক শুনিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, আমার বন্ধু সত্যেন কিছু দূরে একটা দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেই কাছে গিয়া কহিলাম, এখানে কখন থেকে? সত্যেন কহিল, তা হ'ল মাস ছয়-সাত, টাউন স্কুলের হেডমাস্টার। অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। দেখিলাম, সবগুলিই স্কুলের শিক্ষক। কহিলাম, আপনারা সবাই যাচ্ছেন নাকি? জন তিন-চার জিলা-স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, আমাদে

তা উপায় নেই, যমের বাড়ি যেতে বললে যেতে হবে। সত্যেনকে কহিলাম, তুমি যাচ্ছ? সত্যেন সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়। বহু ভাগ্যে হাকিমি জুটেছে ভায়া। এ সুযোগ হেলায় হারাতে দেয় কেউ? কহিলাম, কিন্তু দায়িত্বের বহরটা তো সকালে শুনলে! সত্যেন নাক কুঁচকাইয়া অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, তা হোকগে! কাজে নামলে কিছুতেই কিছু আটকাবে না।

পরিচিত সকলকেই এখানে-ওখানে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু পিয়ালডাঙার হেমন্তবাবুকে দেখিলাম না। এদিক-ওদিক তাকাইতেই সত্যেন কহিল, কাউকে খুঁজছ নাকি? কহিলাম, হ্যাঁ হে, আমার একটি পরিচিত লোক, আমাদের ওদিক থেকেই এসেছেন, হেডমাস্টার, এই কাজেই এসেছেন; কই, দেখছি না তো তাঁকে! একজন কহিল, কেটে পড়েছেন হয়তো। ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড উৎসাহ তাঁর, সস্ত্রীক এসেছেন। সকলে মুচকি হাসিয়া কহিল, তাই নাকি? একজন কহিল, কেটে পড়াও এত সোজা নয় মশায়। মেজাজ তো দেখলেন ও-বেলা, ওর সামনে হাজির হওয়ার চেয়ে বাঘের সামনে যাওয়া সহজ।

একজন লোক আসিয়া ভক্তিভরে সকলকে নমস্কার করিল। লোকটা বেঁটে ও মোটা; বাতাবির মত গোল, মাকুন্দে মুখ; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, মাঝখানে এক গোছা টিকি; চোখে নিকেলের চশমা; পরিধানে সাদা থান, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গায়ে গলাবন্ধ কেটের কোট, নীচের বোতাম দুইটি নাই, জামার ফাঁক দিয়া রোমশ ভুঁড়িটি দৃশ্যমান।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল, কাকে চান? লোকটা আমার নাম করিতেই সত্যেন আমাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে, ইনিই আপনাদের হাকিম।

লোকটি মোলায়েম হাসি হাসিয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাকিম বইকি। আপনারা সবাই হাকিমতুল্য ব্যক্তি। কহিলাম, কি চান আপনি? লোকটি হাত জোড় করিয়া কহিল, ওদিকে একবারটি যেতে হবে, দুটো কথা আছে আমার। সকলের মুচকি হাসির ফাঁস কাটাইয়াও লোকটার সঙ্গে যাইতে হইল। অনেকটা দূরে একটা গাছের নীচে লইয়া গিয়া লোকটা কহিল, কবে যাচ্ছেন? কহিলাম, কাল বিকেলে বোধ হয়। লোকটা করজোড়ে সবিনয়ে কহিল, আমার ওখানেই পায়ের ধুলো দিতে হবে। আমরা গোঁসাই মানুষ, বাড়িতে রাধামাধবের নিত্য সেবা, প্রসাদ পেয়ে আসবেন দিন কয়েক। কোনও কষ্ট হবে না আপনার। বৈঠকখানা-বাড়ি একেবারে আলাদা, কুয়ো পায়খানা সব ব্যবস্থা আছে। কহিলাম, আমি তো একা নয়, আরও আটজন আছেন যে। লোকটি হাত নাড়িয়া কহিল, কোনও চিন্তা নেই। আটজন কেন, আটান্নজন হ'লেও কোনও অসুবিধে হবে না। রাধামাধবের ততটুকু কৃপা আছে আমার ওপর, গেলেই বুঝতে পারবেন। কহিলাম, আচ্ছা, সুবিধে হ'লে তাই করব, নমস্কার।—বলিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই লোকটা কহিল, সুবিধে হ'লে নয়, হতেই হবে, না হ'লে বড় কষ্ট পাব।—বলিয়া ডান হাতটা বুকে চাপাইয়া, ঘাড় কাত করিয়া, মিনতিভরা চোখে চাহিয়া রহিল। আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কতকটা আসিয়াছি, এমন সময়ে পিছন হইতে বাজখাঁই গলায় কে ডাক দিল, শুনছেন, ও মশায়? থমকিয়া দাঁড়াইতেই একটা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া আমার কাছে আসিল। খাড়া সাত ফুট লম্বা, তদনুপাতে চওড়া, মেটে রঙ, চ্যাপটা ধরনের মুখ, মোটা ভুরু, কড়া গোঁফ, দাড়ি কামাইয়া আসিয়াছে, তবু নাক, কান ও কপাল বাদ দিয়া

সমস্ত মুখটা কালো হইয়া আছে। পরিধানে নরুনপার মিলের মিহি ধুতি, কোঁচাটা দোপাট করিয়া পেটের নীচে গোঁজা, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবির উপর গলা-খোলা কোট, পাঞ্জাবির নীচের দিকটা কোট ছাড়াইয়া হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিতেছে; মাথায় তেল-চবচবে চুলে তেড়ি; চোখে সেলুলয়েডের মজবুত ফ্রেমওয়ালা চশমা, নাক ও কানের ভিতর হইতে লম্বা লম্বা চুল উঁকি মারিতেছে, পায়ে মোজা ও চকচকে বুট-জুতা, হাতে আনকোরা নূতন ছাতা।

লোকটা কহিল, কি বলছিল ও? কহিলাম, কে? লোকটা ছাতাটা বাড়াইয়া দেখাইয়া কহিল, ওই যে, গোলু গোঁসাই? না বুঝিবার ভান করিয়া কহিলাম, সে আবার কে? লোকটা ভুরু নাচাইয়া কহিল, ওই যে মশায়, এতক্ষণ আপনার সঙ্গে আলাপ করছিল, নাম ওর গোলোক গোঁসাই, আমরা ডাকি গোলু গোঁসাই, ফুটবলের মত গোল চেহারা কিনা।—বলিয়া নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিল। পকেট হইতে একতাড়া বিড়ি বাহির করিয়া নিজে একটা লইয়া, আমার দিকে তাড়াটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, খাবেন নাকি একটা? ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না। লোকটা বিড়ি ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, আপনারা হাকিম-হুকিম লোক, বিড়ি কি আপনাদের চলে, ও হচ্ছে আমাদের মত চাষাভূষো লোকের নেশা। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া দুই ভুরু যুক্ত করিয়া, মাথাটা কাত করিয়া কহিল, কি বলছিল আপনাকে আমাদের গোঁসাইজী? কহিলাম, আমাকে ওঁর ওখানে থাকতে নিমন্ত্রণ করলেন। লোকটা হাঃ-হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিয়া কহিল, দেখেই বুঝেছিলাম। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চোখ পাকাইয়া কহিল, কিন্তু সাবধান! কিছুতেই রাজি হবেন না, তা হ'লে মারা যাবেন। সভয়ে কহিলাম, সে কি?

কেন? লোকটা কহিল, কেন? বলছি, ওই যে চাকমাহুলে লোকটি, দেখতে ভালমানুষ, হাড়বদমায়েস ও, দিনের বেলায় ওর হাতে হরিনামের ঝুলি, রাতের বেলায় টাকার থলে, পেল্লায় সুদী কারবার ওর, কসাইদের পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। নিজেও কসাইয়ের অধম, টাকায় চার আনা সুদ, টাকা না দিতে পারলে ভিটেমাটি গ্রাস। ভিখিরীকে পর্যন্ত ভিক্ষে দেয় না ও। ও আপনাদের খেতে থাকতে দেবে বিনা স্বার্থে ভেবেছেন? বাড়িতে মস্ত মস্ত ধানের গোলা ওর, কত লোককে পথে বসিয়ে আজ বিশ বৎসর ধ'রে জমিয়েছে, এক ছটাক বিক্রি করে নি, ভবিষ্যতে পঞ্চাশ টাকা মণ দরের জন্যে ব'সে আছে, সেই ধানটা আপনাদের দিয়ে বাঁচাতে চায়। কহিলাম, তাই নাকি? লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, না হ'লে যে-নিজের মাকে খেতে দেয় না, সে খাওয়াবে পরকে? তা ছাড়া খাওয়াবে কি জানেন? রাধামাধবের পেসাদ—স্রেফ খুদ-ঘাঁটা—জেলের লাপসি তার চেয়ে ঢের ভাল, আমিষের গন্ধটুকু পর্যন্ত নেই, দু দিন খেয়ে জিবে ঘাস গজিয়ে যাবে আপনাদের, আর তিন দিনের দিন কলেরা। চুপ করিয়া রহিলাম। লোকটা বলিতে লাগিল, তার চেয়ে আমার বাড়িতে চলুন, দিলখোলা শৌখিন মানুষ আমি, চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন বোধ হয়, তা ছাড়া ও-তল্লাটের যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করবেন, সে-ই বলবে। বাড়িতে এক ছটাক বাড়তি ধান-চাল নেই, লোকে বলবে অবশ্য, অনেক আছে, বনেদী ঘর কিনা, তালপুকুর নামটাই আছে, তালগাছের চারা পর্যন্ত নেই। মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, গিয়ে স্বচক্ষে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া, আমরা শাক্ত, বাড়িতে বারোমেসে কালী, প্রতি অমাবস্যায় পুজো হয়, পাঁঠাবলি তো দিন লেগেই আছে। মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, শুধু পাঁঠা নয়,

মাছও খাওয়াব আপনাকে, মস্ত বড় বাঁধ আছে আমার। হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ইয়া বড় বড় মাছ—বিশ সের, ত্রিশ সের—রুই, কাতলা, মিরগেল হরেক রকমের, কত খেতে পারেন দেখে নোব। চোখ ঠারিয়া কহিল, দিনের বেলায় রামশাল চালের ভাত আর রুইমাছের ঝোল, রাত্রে পাঁঠার কালিয়া আর লুচি—গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি—এই হ'ল চালাও ব্যবস্থা, তবে মাঝে মাঝে পোলাও-টোলাওয়েরও ব্যবস্থা হবে, কেমন! চলুন আমার ওখানে, তোফা থাকবেন, কোনও কষ্ট হবে না। কহিলাম, দেখি ভেবে। লোকটা কহিল, ভাববার কি আছে? কবে যাবেন বলুন দেখি? কহিলাম, কাল বিকেলে বোধ হয়। লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, কোন চিন্তা নেই আপনার, গরুর গাড়ি থাকবে নদীর ধারে, নদীর ধার পর্যন্ত একটা রিক্‌শায় যাবেন, যেয়ে হাঁক দেবেন, লোক মোতায়েন থাকবে, আপনার গাঁট-গাঁটরি—বলেন তো আপনাকে পর্যন্ত কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলবে। আর দেখুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার নাম তারাদাস চক্রবর্তী, এখানে দু-চারজন আসতে পারে আমাদের গাঁ থেকে, ভাংচি দেবে হয়তো, কিন্তু কারও কথা শুনবেন না, সোজা চ'লে গিয়ে চড়বেন আমার গাড়িতে আর উঠবেন গিয়ে সরাসরি আমার বাড়িতে। হেঃ-হেঃ করিয়া হাসিয়া কহিল, দেখুন, পদ্য ক'রে দিলাম একটা। চলুন তো আমার ওখানে, আরও কত শোনাব। আচ্ছা, নমস্কার।—বলিয়া আর একটা বিড়ি ধরাইয়া এঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে চলিয়া গেল।

আপিসের সামনে অত্যন্ত ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম। কাছে গিয়া শুনিলাম, কাগজপত্র দেওয়া হইতেছে। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া নাম সহি করিয়া মস্ত একতাড়া কাগজ পাইলাম এবং

সেটাকে বগলদাবা করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার নাম কি—? 'হাঁ' জানাইয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনার নাম কি? লোকটা নিজের নাম-ধাম বলিয়া বিনীতভাবে কহিল, আপনি কি ওখানে যাচ্ছেন? কহিলাম, হ্যাঁ। সে কহিল, আমি আপনার অধীনস্থ একজন কর্মচারী, ওখানকার পাঠশালার পণ্ডিত। লোকটি বেঁটে কালো ও কাহিল, পরিধানে ঘরে-কাচা কাপড় ও কামিজ, পায়ে জীর্ণপ্রায় জুতা, মাথায় ঢেউ-খেলানো তেড়ি। কহিল, কবে যাচ্ছেন? জবাব দিলাম, কাল বিকেলে।

কোথায় উঠবেন?

কহিলাম, কোথায় ওঠা যায় বলুন দেখি?

লোকটা ভুরু কুঁচকাইয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, গাঁয়ে তিনজন বড়-লোক—গোলোক গোঁসাই, দিগম্বর মুখুজ্জে আর তারাদাস চক্রবর্তী, এর মধ্যে দিগম্বরই সকলের চেয়ে বড়লোক, ধানের কল আছে, বাড়িতেও অনেক ধান মজুত। ভারি দুর্দান্ত লোক, তা ছাড়া ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, অনেক লোক তাঁবেদারে, হাকিমদের সঙ্গেও খুব দহরম তারাদাসের অনেক ধান ছিল, অধিকাংশ বিক্রি ক'রে দিয়েছে, বাকি যা আছে এখানে-সেখানে লুকিয়ে রেখেছে; তাপে দাপে এও কম নয় হাতে লেঠেলের দল আছে। আর গোলোক গোঁসাই, ওর টাকাই বেশি, ধান ওদের মত অত নেই, তবে যা আছে বিক্রি করে নি এক ছটাকও, খবর পেতে না পেতেই সব রাধামাধবের বেড়ের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছে। দম লইয়া কহিল, এদের কারও কাছে আপনার ওঠা উচিত হবে না। কহিলাম, তবে কোথায় থাকব, বলুন দেখি? পণ্ডিত কহিল, আমার পাঠশালায় থাকতে পারেন, গাঁয়ের অবস্থা

বাইরে, তবে আমরাও তো থাকব আপনার সঙ্গে, ভয় কি? ঢোক গিলিয়া কহিল, আমাদের থাবার থরচ তো আপনিই দেবেন। কহিলাম, তাই আইন বটে, তবে নিজের থরচ নিজে ক'রে নিতে পারলেই তো ভাল, সরকার তো দেবেন সব পরে। পণ্ডিত ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল কোথায় পাব টাকা, বলুন? পণ্ডিতি করি, মাসে দশ-পনরো টাকা আয়, বাড়িরই থরচ চলে না তাতে। আমি একজনের বাড়িতে তার ছেলেমেয়েকে সকাল-সন্ধ্যে পড়িয়ে থেতে পাই।

তা হ'লে সেথানেই থাবেন আপনি।

তা কি ক'রে হবে? সারা দিন-রাত সরকারের কাজ করব, তারা থেতে দেবে কেন?

কহিলাম, তা বটে। বেশ, তাই হবে, আমি আপনার ওথানেই উঠব। আর আর যারা যাবে, আপনি তাদের সঙ্গে দেথা করুন। পারেন তো আমার কাছেও পাঠিয়ে দিতে পারেন।—বলিয়া নকুড়ের বাড়ির ঠিকানা দিলাম।

রাত্রে কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া উপদেশাবলী পড়িতে লাগিলাম। আইনকানুন ও করণীয় কার্যের তালিকা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। তা ছাড়া দশ-বারো রকমের প্রায় একশোথানা ফর্ম্, সেগুলা পূরণ করিয়া সরকারের কাছে পাঠাইতে হইবে। জীবনে কথনও এ ধরনের কাজ করি নাই। উপদেশাবলীর বইথানা উপর্যুপরি বার কয়েক পড়িলাম। নকুড়ও তাহার অভিজ্ঞতামত কতকটা সাহায্য করিল। কিন্তু তবুও সব জিনিস পরিষ্কার হইল না। পরদিন সকালবেলায় সত্যেন ও হেমন্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিব স্থির করিয়া রাত্রি একটার সময়ে শুইতে গেলাম।

ঘুম আসিল না। একে নূতন জায়গা, তাহার উপর কোন্ এক

অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে, সম্পূর্ণ অজানা ধরনের কর্মকাণ্ডের চিন্তা। তা ছাড়া বাড়ির চিন্তাও মাঝে মাঝে উঁকি মারিতে লাগিল। প্রায় তিন সপ্তাহ বাড়ি-ছাড়া থাকিতে হইবে। এই যুদ্ধের বাজারে পাড়াগাঁয়ে চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, মারধোর খুন-জখম হামেশা হইতেছে, পুলিস কোন কিছুরই কিনারা করিতেছে না বা করিতে পারিতেছে না। বাড়িতে লোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা পর তো। তা ছাড়া সংসারের জিনিসপত্র কেনা-কাটা—। ব্যবসাদাররা তো আজকাল ডাকাতের বাড়া, পাঁচ আনার জিনিসের জন্য চোখ বুজিয়া অবলীলাক্রমে পাঁচ সিকা হাঁকিয়া বসে।

অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলাম, প্রায় দশ হাত লম্বা দশ হাত চওড়া একটা ফর্‌ম্‌, অসংখ্য ঘর-কাটা, একটা মাটির দোয়াতে ভোঁতা নিবওয়ালা কলম দিয়া ঘর পূরণ করিয়াই চলিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

সকালে উঠিয়া বাণ্ডিল বগলে লইয়া হেমন্তবাবুর কাছে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম, হেমন্তবাবু শ্বশুরবাড়ির বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া আপ্যায়নসহকারে বসাইয়া কহিলেন, কখন যেতে হচ্ছে আপনাকে? পাশে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিলেন, খোকা, আর এক কাপ চা আন তো। খোকা চলিয়া গেল। আমি কহিলাম, কাল বিকেলে আপনাকে দেখলাম না? হেমন্তবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আমি রেহাই পেয়ে গেছি মশায়। সবিস্ময়ে কহিলাম, সে কি! হেমন্তবাবু গম্ভীর হইয়া নাক-মুখ কুঁচকাইয়া কহিলেন, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না মশায়, ভারি শক্ত কাজ, তার তুলনায় সরকার যা দেবে শুনলাম, তা অতি সামান্য।

কি দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে? তা ছাড়া শ্বশুর ও শ্বশুরকন্যা দুজনেরই অমত। যে জায়গাটায় দিয়েছে, সেখানটা নাকি চোর-ডাকাতের আড্ডা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ক'রে রেহাই পেলেন? হেমন্তবাবু কহিলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে, চার টাকা খরচ করতে হয়েছে। কহিলাম, নিজের অসুখ ব'লে? হেমন্তবাবু ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে? উত্তর দিলেন, স্ত্রীর। সোদ্বেগে কহিলাম, কি হ'ল তাঁর? হেমন্তবাবু হাসিয়া কহিলেন, আসন্ন-প্রসবা, একেবারে আজ-কালে, বাড়ি ছেড়ে এক পাও যাওয়া চলবে না। কহিলাম, ডাক্তার ওই সার্টিফিকেট দিলে? বলিলেন, দেবে না! বাম চোখ বুজিয়া তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সহযোগে টাকা বাজাইবার ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, এর বদলে মশায়।

চা খাইয়া চলিয়া আসিলাম। মনটা দমিয়া গেল। কিছু টাকা খরচ করিয়া সার্টিফিকেট একটা যোগাড় করিব নাকি? কিন্তু এতগুলা টাকা! কোথায় লাভ করিতে আসিয়া লোকসান দিয়া বাড়ি ফিরিব? সত্যেনের বাড়ি চলিলাম।

ছোট একতলা বাড়ি, খান তিনেক ঘর, বাহির হইতেই দেখা যায়। ভিতরে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর বোধ হয় আছে। বৈঠকখানাটি নেহাত ছোট, আসবাবপত্রও বিশেষ কিছুই নাই, মাত্র একখানা ছোট টেবিল, গোটা দুই কাঠের হাতলহীন চেয়ার, এক পাশে একটা ডেক-চেয়ার। সত্যেন বাড়ির মধ্যে ছিল। ডাক দিলাম, একটি ছেলেমানুষ চাকর আসিয়া কহিল, বসুন, আসছেন। বসিলাম। কিছুক্ষণ পর সত্যেন আসিল, কিন্তু এ কি চেহারা সত্যেনের! অবশ্য উহার চেহারা সাধারণতই কাহিল, কিন্তু আজ যেন আরও কাহিল দেখাইতেছে!

সাধারণত কোটরে-ঢোকা চোখ দুইটা যেন আরও কোটরে ঢুকিয়াছে। মাথার চুল উস্‌কোখুস্‌কো, যন্ত্রণায় সারামুখ কুঁচকাইয়া গিয়াছে, দেহটা ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে। অতি ধীরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া সত্যেন ডেক-চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া, চিত হইয়া গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজিয়া হাঁফাইতে লাগিল। প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত কহিলাম, কি হয়েছে হে? সত্যেন চোখ দুইটা কোনমতে একবার খুলিয়া আবার বুজিল, পেটে হাত দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, কলিক পেন, রাত তিনটে থেকে হয়েছে। প্রশ্ন করিলাম, কলিক তোমার ছিল নাকি? সত্যেন মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টানিয়া টানিয়া কহিতে লাগিল, ছিল, মাঝে মাঝে হয়, এবার যেন একটু বেশি।

কাল তো ভালই ছিলে, হঠাৎ হ'ল কেন?

চোখ দুইটা জোর করিয়া খুলিয়া, কপালে কয়েকটা ভাঁজ তুলিয়া, সত্যেন কহিল, দুশ্চিন্তা! কাল রাত দুটো পর্যন্ত ঘুমুতে পারি নি।—বলিয়া একবার খাড়া হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেটে হাত দিয়া বমি করিবার ভঙ্গী করিয়া শুইয়া পড়িল। কহিলাম, বমি হচ্ছে নাকি? বমির ভাবটা সামলাইতে সামলাইতে সত্যেন জানাইল, হ্যাঁ। চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। সামলাইয়া সত্যেন কহিল, এইটাই সিম্‌টম, বসলেই বমি, শুলেই অনেকটা আরাম। কহিলাম, ডাক্তারকে খবর দিয়েছ? সত্যেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ, এখনই আসবে বলেছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া সত্যেন কহিল, একটু চা খাও। কহিলাম, থাক্‌ ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম, তা ছাড়া ভেবেছিলাম, কাজটার সম্বন্ধে দুজনে একটু আলোচনা করব। সব জিনিস বেশ বুঝতে পারি নি এখনও। কেতাবটাতে অবশ্য দেখলাম, সব জিনিস এস. ডি. ও.

সাহেবেরই বুঝিয়ে দেবার কথা, কিন্তু কাল তো লোকটার হাবভাব দেখলে, কিছু করবে না ও, উল্টে হয়তো অপমান ক'রে দেবে। তা তোমার যা অবস্থা দেখছি, তোমার তো যাওয়াই চলবে না। সত্যেন এতক্ষণ মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আমার কথা শুনিতেছিল, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পাগল! এই শরীরে যাওয়া যায়! কহিলাম, তা হ'লে আসি ভাই। যা থাকে কপালে, এস. ডি. ও.র কাছেই যাই, একবার জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে আসি; আজ বিকেলেই তো যেতে হবে। সত্যেন কিছুক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, শুনবে আমার একটা কথা? তুমিও পার তো কেটে পড়বার চেষ্টা করগে, এসব কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। কহিলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমার কি আর হবে? দেখি তাই চেষ্টা ক'রে একবার।

যাইতে যাইতে স্থির করিলাম, কাটিয়া পড়িবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু যাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার মান। স্মরণ হইতেই মন পিছাইতে শুরু করিল। এস.ডি.ও.কে যতটা আর দেখিয়াছি ও যতটা তাহার কথা শুনিয়াছি, তাহাতে তাহার দশ টা-ইতে কোন ভদ্রলোক আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া ভালয়-ভালয় হ'লে আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। হয়তো ধমক দিবে, অপমান করিবে, যেপোলাগালি দেওয়াও বিচিত্র নয়। উহার হাতে, বিশেষ করিয়া আজকালিকার দিনে, এত রকমের অস্ত্র আছে যে, নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। তা ছাড়া আমার কোন মুরুব্বি নাই যে, আমার হইয়া দুই কথা বলিয়া দিবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত কার্যে যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

ধীরে ধীরে বাণ্ডিল বগলে করিয়া এস. ডি. ও.র কাছারির সামনে আসিয়া হাজির হইলাম। ভিড়ের অন্ত নাই, কত রকমের লোক, সামনে

একটা গাছের নীচে একটা গরুর গাড়ির ছইয়ের আড়ালে দুইজন মেয়েমানুষও দেখিলাম, আদালতে কোন কাজে আসিয়াছে বোধ হয়। এক চানাচুরওয়ালা চানাচুর বিক্রয় করিতেছে; এক পাশে একটা লোক আমের টুকরি লইয়া বসিয়াছে, তাহার সামনে পোশাক-সমেত উবু হইয়া বসিয়া উকিল ও মোক্তার বাবুরা আমের দর করিতেছেন। একটা লোক কিসের বিজ্ঞাপন বিলি করিতেছে, পেটের উপর পেস্ট-বোর্ডের সাইন-বোর্ড বাঁধা, বড় বড় হরপে লেখা আছে—শার্দূল বটিকা, যদি শার্দূলের মত শক্তিমান বীর্যবান হইতে চান, এক বটিকা সেবন করুন। মনে হইল, সম্প্রতি এক বটিকা সেবন করিতে পারিলে মন্দ হইত না, এস ডি. ও.র লম্ফঝম্পটা সামলাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতাম।

কাছারির বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম, আমার ছাত্রটি দাঁড়াইয়া আছে, বগলে বাণ্ডিল, মুখ শুষ্ক ও বিষণ্ণ, যেন সদ্য পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি খবর হে? ছাত্র কাঁদ-কাঁদ সুরে কহিল, আমার দ্বারা হবে না সার্, কাল রাত দুটো পর্যন্ত পড়েছি, কিছুই বুঝিতে পারি নি। মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিলাম, এস. ডি. ও.র কাছে যাও নাইল, ছাত্র করুণস্বরে কহিল, গিছলাম, ছাড়তে চাচ্ছে না কিছুতেই। আমি বললাম, আমি পারব না করতে, তো বললে, বলুনগে যা আরাম ...টি সাহেবকে, আমার দ্বারা কিছু হবে না। দেখুন দেখি, কি বিপদ! বলিয়া কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হাসিল। ছাত্রটি কহিতে লাগিল, ... শেষে অনুনয়-বিনয় করাতে দয়া হ'ল বোধ হয়, বললে, নীচে ... অপেক্ষা করুনগে, যদি লোক জোটে তো রেহাই পাবেন।

গভীর কৃষ্ণ মেঘের এক প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখিতে পাইলাম, ভদ্রলোকের তা হ'লে দয়ার দুর্বলতাও ... আছে। কহিলাম,

আমারও যে যাওয়া চলবে না। বাড়িতে কেউ নেই। পাড়াগাঁয়ের খবর সব জান তো! ছাত্র কহিল, যান, ব'লে দেখুন একবার। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই সামনেই ওঁর খাস-কামরা।—বলিয়া পাশেই একটা সিঁড়ির দিকে চক্ষের ইঙ্গিত করিল।

হঠাৎ দেখি, সেই সিঁড়িটা দিয়া একটা লোক নামিয়া আসিতেছে, রোগা-পটকা চেহারা ; গায়ে শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল ; মুখ লাল, চোখ দুইটা হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছে, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে। কাছে আসিতেই ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল মশায়? লোকটা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িয়া ডান হাত দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিবার ভঙ্গী করিয়া কহিল, ফেলে দিয়ে এলাম ছুঁড়ে। বলে, রিপোর্ট করব। বললাম, করুগে যা, অনেক হাকিম দেখা আছে আমার। কহিলাম, কি হ'ল আপনার? লোকটা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিল, দেখুন দেখি মশায়! কুড়িটা টাকা আগাম চাইতে গেলাম আপিসে, বলে, দশ টাকা নিয়ে যান। দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া কহিল, যেন ভিক্ষে চাইতে এসেছি আর কি! দম লইয়া কহিল, তা গেলাম এস. ডি. ও.র কাছে। বললাম, দশ টাকায় আমার হবে না। তো বলে, ওই নিয়েই যেতে হবে, না হ'লে রিপোর্ট করব। বললাম, করুনগে। আমার বাড়িতে স্ত্রীর অসুখ, যেতে পারব না আমি, তো বলে, লিখে দিন। দিলাম চড়চড় ক'রে লিখে। বলিয়া তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সহযোগে লিখিবার ভঙ্গী করিল। কহিলাম, আমি কি করব বলুন দেখি? আমার বাড়িতেও ওই ব্যাপার, অথচ ঘরে কেউ নেই। সিঁড়িটার দিকে হাত বাড়াইয়া লোকটি কহিল, চ'লে যান গটগট ক'রে, কি করবে ও? জলন্ত চোখ দুইটা আমার মুখের উপর রাখিয়া কহিল, মাথাটা কেটে নেবে?—বলিয়া ডান হাতটা নিজের গলার উপরে বার কয়েক ঘষিয়া দিল।

মনে মনে দুর্গানাম জপ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, দেখি, একজন বাঙালী সাহেব নামিতেছে। পরিধানে কোট-প্যাণ্ট, হাতে হ্যাট, একটা রুমাল দিয়া ঘন ঘন মুখ মুছিতেছেন। কাছে আসিতেই শুনিতে পাইলাম, বলিতেছেন, ব্রুট, ইডিয়ট! সাহেবের সঙ্গে দ্বৈরথ-সমর শেষ করিয়া আসিলেন বোধ হয়। কিন্তু ইঁহাকে. অন্তত পোশাক-পরিচ্ছদে, হাকিমদের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই হানাহানিটা নেহাত একতরফা হয় নাই।

সাহেবটির সহিত ছাত্রের আলাপ ছিল। জিজ্ঞাসা করিল. আপনাকেও দিয়েছে নাকি? সাহেবের রাগ তখনও নিবে নাই. উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, দেবে না? আমি তো আর হাকিম নয়। হাকিমরা, নেহাত নিরীহ গোছের দু-চারজন ছাড়া, কেউ পা বাড়ায় নি। তা দিয়েছে কোথায় জানেন? একেবারে জেলার সীমানায়, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। তাই বলতে গিয়েছিলাম যে, শহরে আমাকে দাও, বাড়িতে থেকে কাজ ক'রে দোব, রাজি হ'ল না। বললাম, তা হ'লে কি করতে হবে, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও, তো বললে কি জানেন? ইস্কুলে ইংরিজী পড়েন নি নাকি? কি পড়েছি আর কি না পড়েছি, ওর কাছে ফিরিস্তি দিতে হবে! পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ, কপাল, ঘাড় ভাল করিয়া মুছিয়া মুখ দিয়া কতকটা উত্তপ্ত বাষ্প বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, অভদ্র কোথাকার! তারপর হ্যাট মাথায় দিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে ইনি? ছাত্র কহিল. ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, শহরের গণ্যমান্য লোক। ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এর পর আর যাওয়া উচিত হবে কি? দেখছ তো সব দুর্দশা! ছাত্রটি সাহস দিয়া কহিল, তা হ'লেও একবার দেখুন চেষ্টা ক'রে, না হয় তো কি করবেন!

মা দুর্গার নাম করিয়া যাত্রা করিলাম। দরজার কাছে আসিয়া ফাঁক দিয়া দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাহেবের সহিত কথা কহিতেছেন, পরিধানে মুসলমানী পোশাক, কোন উঁচুদরের কেরানী বোধ হয়। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, ভেতরে আসতে পারি কি? সাহেব আদেশ দিলেন, আসুন। ভিতরে যাইতেই প্রৌঢ় লোকটি উঠিয়া গেলেন। সাহেব স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, বসুন। ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ভ্রূকুঞ্চনের সহিত কহিলেন, কি চাই আপনার? জবাব দিতে না দিতেই, মাথাটা উপরে নীচে নাড়িয়া কহিলেন, এক্‌জেম্প্‌টেড হতে চান তো? মাথার ঝাঁকানি দিয়া কড়া গলায় কহিলেন, হবে না ব'লে দিচ্ছি। প্রবলতর ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, কিছুতেই হবে না। আমি সবিনয়ে কহিলাম, আমার যে কোথাও যাওয়া চলবে না। সাহেব নাক উঁচাইয়া কহিলেন, কেন চলবে না? স্ত্রীর অসুখ? ডেলিভারি আসন্ন? কি বলুন? কহিলাম, আজ্ঞে, ওসব কিছু নয়, বাড়িতে আমাব আর কোন পুরুষ নেই। সাহেব শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিলেন, কার বাড়িতে দুজন পুরুষ থাকে মশায়? বাধা দিয়া কহিলাম, আজ্ঞে, তা বলছি না, মানে, চাকর-বাকর—। আজকাল পাড়াগাঁয়ের অবস্থা জানেন তো, বাড়িতে শক্ত-সমর্থ একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে—। সাহেব দুই হাত চিত করিয়া দিয়া কহিলেন, কোনও উপায় নেই, এই কাজের ভার নিয়েছি ব'লে তো আমি সকলের বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যে লোক যোগাড় ক'রে বেড়াতে পারব না। চোখ দুইটি একবার বুজিয়া ঘাড়টা কাত করিয়া দিয়া কহিলেন, যান আর বিরক্ত করবেন না। করুণ কণ্ঠে আবেদন করিলাম, দয়া ক'রে আমার কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখুন। সাহেব সক্ষোভে কহিলেন, আমার কথাটাও দয়া ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখুন। সবাই যদি আপনারা 'না' বলেন, আমি কাজ চালাই কি ক'রে?

কহিলাম, আপনার আবার লোকের অভাব! আপনি হুকুম করলে সারা জেলার লোক ছুটে যাবে, তবে অবশ্য যাদের উপায় নেই—। হঠাৎ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেন আপনি? কহিলাম, হেডমাস্টারি। স্কুলের নাম করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, সরকারের সাহায্য পান? কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। সাহেব কড়া গলায় কহিলেন, তা হ'লে আর দ্বিরুক্তি করবেন না। আপনার ভালর জন্যেই বলছি, আপনি না গেলে আপনার নামে আমাকে রিপোর্ট করতেই হবে, তাতে আপনাদের ভাল হবে না।

প্রৌঢ় কেরানীটি আবার আসিলেন। সাহেব আমাকে কহিলেন, আসুন আপনি, আমার কাজ আছে।

নামিয়া আসিলাম। ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

ঘাড় নাড়িয়া 'হ'ল না' বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্লাব-ঘরের সামনে আমাদের থানার সরকারী দারোগার সহিত দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মশায়, কোথায় দিয়েছে আপনাকে? গ্রামের নাম করিলাম। শুনিয়াই দারোগাবাবু দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন, ওরে বাবা! ও যে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার জায়গা, ধরলে আর ছাড়তে চাইবে না, অন্তত দু বছর তো নিশ্চিন্ত। আমি ছিলাম কিনা ওখানে বছর খানেক। চোখ দুইটা বুজিয়া মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, ওঃ! কি জ্বর রে বাবা! এখনও মনে হ'লে মাথাটা টিপটিপ ক'রে ওঠে। চোখ চাড়াইয়া কহিলেন, জ্বর ধরতে না ধরতেই ১০৬, শুনেছেন কখনও? কলসী কলসী জল মাথায় ঢাললেন তো নামল এক ডিগ্রী, আর বন্ধ করলেন তো আবার যে-কে সেই; সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে ইন্‌জেক্‌শন নিলেন তো ভাল, না হ'লে তিন দিনের দিন ফরসা।—বলিয়া ডান হাতে তুড়ি দিলেন। কহিতে লাগিলেন, চিকিচ্ছে

করালেই একেবারে ছাড়ে নাকি? হায় কপাল! দু বছর ধ'রে জ্বের টানে। একটু অনিয়ম করলেন কি চেপে এল। তবে যদি খরচপত্র ক'রে পুরী-বদ্যিনাথ-ওয়ালটেয়ার ঘুরে আসতে পারেন তো সেরে উঠতে পারেন। বক্তৃতায় বাধা দিলাম না, কারণ জানি, ভদ্রলোককে বাধা দিলেও কোন কাজ হয় না। কিন্তু ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। কাহার মুখ দেখিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি কে জানে? হয়তো বাড়ি ফিরিতেই পারিব না। যে ধরনের ম্যালেরিয়া শুনিতেছি, আমাদের মত নূতন লোককে দেখিবামাত্র ধরিবে। পাড়াগাঁ, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, ঔষধপত্রও দুষ্প্রাপ্য, কাজেই তিন দিন পরেই মৃত্যু। আর যদি ডাক্তার ও ঔষধ জুটেই, তাহা হইলেও পুরাপুরি রোগমুক্ত হইবার জন্য অন্তত হাজার খানেক টাকা খরচ করিয়া হাওয়া-বদলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কহিলাম, কি করা যায় বলুন দেখি? দারোগাবাবু কহিলেন, কি আর করবেন, মশারি নিয়ে যাবেন, গরমজল ফুটিয়ে খাবেন, আর রোজ কুইনিন খাবেন দশ গ্রেন ক'রে, কুয়োর জলে নাইবেন, আর যথাসম্ভব খালি গায়ে থাকবেন না। আচ্ছা, চলি এখন, বাসের সময় হয়ে গেল। নমস্কার।—বলিয়া বাস ধরিবার জন্য ভদ্রলোক দৌড়াইতে শুরু করিয়া দিলেন।

রাস্তার পাশেই একটা অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করা যায়? ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিলে চলিবে না, দিলেও বিশ্বাস করিবে না। যদি সোজাসুজি লিখিয়া দিই—পারিব না, স্কুলের ক্ষতি হইতে পারে। বলা যায়, স্কুলের ক্ষতি হোক, আমার কি? আমার প্রাণ বাঁচিলেই হইল। কিন্তু যে স্কুল নিজের হাতে গড়িয়াছি, তাহার ক্ষতি করিতে পারিব না।

হঠাৎ দেখিলাম, একটি ঝকঝকে কালো প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি

আসিতেছে। আরোহীকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের গ্রামের জামাই নবীনবাবু, মিলিটারি কণ্ট্রাক্টর, বিস্তর টাকা রোজগার, হাকিমদের সঙ্গে খুব খাতির। সামনে দিয়া যাইতেই ডাকিলাম, নবীনবাবু! কতকটা গিয়াই গাড়িটা 'ঘ্যাঁচ' শব্দ করিয়া থামিল। আমিও দৌড়াইয়া গিয়া মোটরের সামনে দাঁড়াইলাম। নবীনবাবু গাড়ি হইতে নামিল। গোলগাল মাংসল চেহারা, মুখে গোঁফ-দাড়ি কম, গাল দুইটি ফোলা, চিবুকে ও ভুঁড়িতে একাধিক থাক পড়িয়াছে, সদা-হাস্যবদন, প্রাণখোলা লোক। আমাকে দেখিয়াই এক গাল হাসিল। হাসিতেই নাকের দুই পাশে দুইটি বাঁকা খাঁজ পড়িল, চোখ দুইটি গালের মাংসের চাপে প্রায় ঢাকা পড়িল, মোটা নাকটি প্রায় চ্যাপ্টা হইয়া গেল। কহিলেন, কি দাদা, এখানে? কহিলাম, ভারি বিপদে পড়েছি ভাই। নবীনবাবু গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, কি ব্যাপার বলুন দেখি? সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলাম, তোমার সঙ্গে এস. ডি. ও. সাহেবের আলাপ আছে শুনলাম। আবার সেই গাল-ফোলানো, চোখ-ডুবানো, নাক-চ্যাপ্টানো হাসি। ভুঁড়ি ও ভুরু নাচাইয়া নবীনবাবু কহিল, কে বললে আপনাকে, অ্যাঁ? চোখ দুইটা চাড়াইয়া, মাথাটা নাড়িয়া কহিল, মটকা থেকে মেঝে পর্যন্ত সব আমার মুঠোর মধ্যে।—বলিয়া ডান হাতটা মেলিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিল। তারপর কহিল, চলুন, কার কাছে যেতে হবে। আসুন।—বলিয়া গাড়িতে উঠিল। আমিও উঠিয়া পাশে বসিলাম।

এক মিনিটে গাড়ি এস. ডি. ও.র কাছারির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নবীনবাবু গাড়ি হইতে নামিল, আমিও নামিলাম। ছাত্রটি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। আমার এই হঠাৎ পদোন্নতি দেখিয়া সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইল। নবীনবাবু একটা দামী সিগারেট ধরাইয়া কেসটা

আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, নিন। শুষ্ক মুখে কহিলাম, না, এখন থাক্। নবীনবাবু আশ্বাসের সুরে কহিল, আরে, ধরান না, ভয় কি? বন্ধু-লোক; চলুন না, দেখবেন গিয়ে ব্যাপারটা।—বলিয়া পরম আত্ম-প্রসাদে আবার বদন-বিস্ফারক হাসি হাসিল। কহিলাম, তোমার বন্ধু বটেন, আমার তো হাকিম।

নবীনবাবুর খাতির আছে দেখিলাম। তাহাকে দেখিবামাত্র সাহেবের চাপরাসী ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। নবীন অতীব ঘনিষ্ঠতাসূচক স্বরে কহিল, সাহেব কোথায় রে? চাপরাসী কহিল, কাজ করছেন। তা হোক, আসুন আপনি। নবীন কহিল, তুই খবর দে। চাপরাসী ছুটিল এবং অবিলম্বে সিঁড়ির উপর হইতে হাঁকিয়া কহিল, আসুন হুজুর।

নবীনবাবুর পাছু পাছু চলিলাম। নবীনবাবু ভিতরে ঢুকিতেই সাহেব হাস্যবদনে অভ্যর্থনা করিলেন, এই যে, মিঃ চক্রবর্তী! আসুন, বসুন। নবীনবাবুর উপর অত্যন্ত ভক্তি হইল। যাহাকে দেখিয়া এত বড় জাঁদরেল হাকিমের মুখে হাসি ফুটে, সে সামান্য ব্যক্তি নয়। কিন্তু আমাকে দেখিবামাত্র হাসি এক মুহূর্তে মিলাইয়া গিয়া কালবৈশাখীর কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল। সাহেব গর্জন করিয়া উঠিলেন, আবার এসেছেন? আমি প্রস্তরমূর্তির মত নিস্পন্দ নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলাম। নবীনবাবু কহিল, আমার সঙ্গে এসেছেন, আমার পরিচিত। ভানুমতীর ভেল্কি জানে নাকি নবীন? এক কথায় কালবৈশাখীর মেঘকে উড়াইয়া দিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো ফুটাইয়া তুলিল। আমার দিকে তাকাইয়া নবীনবাবু কহিল, বসুন। সাহেব কহিলেন, কি ব্যাপার বলুন দেখি? নবীনবাবু জবাব না দিয়া সিগারেট-কেস বাহির করিয়া নিজে একটা ধরাইল, সাহেবকেও একটা দিল।

সিগারেট টানিতে টানিতে নবীনবাবু কহিল, ওঁকে আর মিছিমিছি টানছেন কেন? সত্যি, ওঁর বাড়িতে কেউ নেই, উনি না থাকলে ভারি অসুবিধে হবে, তা ছাড়া অত্যন্ত ভালমানুষ নিরীহ লোক—

সাহেব কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আপনি কাগজপত্র আপিসে দিয়ে যান।

নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, হাকিম বলিতেছেন, কোথায় ধরল আপনাকে লোকটা? নবীনবাবু কি জবাব দিল, শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এস. ডি. ও.র কথাটা খচ করিয়া মনে বিঁধিল। তাহা হইলেও হঠাৎ এই নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দে দেহ ও মন দুইই হালকা হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, হাত দুইটা পাখার মত মেলিয়া পাখির মত উড়িয়া চলিয়া আসি; কিন্তু ইচ্ছা দমন করিয়া তিন লম্ফে নীচে নামিয়া আসিলাম।

বিকালে সত্যেনকে দেখিতে চলিলাম। রাস্তায় ছাত্রটির সঙ্গে দেখা হইল—বেশ হাসিখুশি ভাব। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হে, কি হ'ল? ছাত্র কহিল, ছাড়ান পেয়ে গেছি সার্! শেষে সাহেব বললেন, একটা লোক নিয়ে আসুন, তা হ'লে ছেড়ে দোব, গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে একটা লোককে রাজি করালাম।

সত্যেনের বাড়ি গিয়া ডাক দিলাম। আশা করিলাম, সেই ছেলে-মানুষ চাকরটি বাহির হইয়া আসিবে, কিন্তু চাকরের পরিবর্তে আসিল গৃহস্বামী নিজে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চেহারা, রোগের বিন্দুমাত্র চিহ্ন মুখে নাই। কহিলাম, কি হে, কেমন আছ? হাসিয়া সত্যেন কহিল, দেখতেই তো পাচ্ছ। হাসিয়া কহিলাম, মিছামিছি স্কুলের চাকরিতে প'ড়ে আছ কেন ভাই? থিয়েটারে যাও, নাম করবে। যা অভিনয়

করেছ সকালে, বিন্দুমাত্র টের পাই নি। সত্যেন কহিল, করতাম না নাকি কোনদিন—কলেজে মনে নেই?

কলেজের থিয়েটারে সত্যেনের সুনাম ছিল মনে পড়িল। সে রাত্রে সত্যেন না খাওয়াইয়া ছাড়িল না।

বাড়ি ফিরিলাম। গৃহিণী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু আনন্দ গোপন করিয়া কহিলেন, চ'লে এলে যে, গেলে না? গৃহিণীকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম, অবশ্য কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করিয়াই। ফলে গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন, যে, শুধু তাঁহার সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লোহার জোরেই এক মারাত্মক বিপদের কবল হইতে কোনমতে নিষ্কৃতি পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাধানাথ কিন্তু বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্যের জন্য আমাকে পছন্দ না হওয়ায় হাকিম আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

হারাধন

রায়হাটির জমিদার—হারাধন রায় বহুদিন পরে স্বগ্রামে ফিরিল। দামী ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়ি, তীক্ষ্ণ উচ্চ হর্নের শব্দ। কাজেই সরকারী পাকা রাস্তা হইতে গাড়ি গ্রামের রাস্তায় পড়িতেই, গ্রাম-প্রান্তবাসী লোকেরা উচ্ছ্বসিত হইয়া রাস্তার দিকে তাকাইল এবং কোন একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি গ্রামে আসিতেছেন বা গ্রামের ভিতর দিয়া পার হইয়া যাইতেছেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। দ্রুতব্যাপী তরঙ্গের মত, এই বার্তা গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিলম্বে সঞ্চারিত হইল, এবং গাড়ি যখন জমিদার-বাড়ির সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল, তখন রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া হারাধন অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য প্রজারা জড়ো হইয়াছে। বাঙালীর অনেক ভাল ভাল জিনিসের মত, রাজভক্তিও বহু ঝড়-ঝাপটা কাটাইয়া এখনও এই পল্লীবাসীদের মধ্যেই টিকিয়া আছে। অবশ্য হারাধন রাজা নহে, ক্ষুদে জমিদার, তাহা হইলেও প্রজাদের কাছে রাজতুল্য পূজনীয় তো!

একজন মুরুব্বী-গোছের লোক হাত কচলাইতে কচলাইতে আসিয়া আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে কহিল, আমাকে চিনতে পারেন হুজুর? আমি নফর। হারাধন যেন চিনিতে পারিয়াছে, তেমনই সুরে কহিল, ও-হো! তুমি সেই নফর, সেই যে—। লোকটা কথাটা লুফিয়া লইয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বদন মোড়লের ছেলে নফর মোড়ল, মনসাতলার বাঁ-হাতি হাত

কুড়ি যেয়ে ফকির মোড়লের সারকুঁড়ের পাড়ে বাঁশতলার পেছনে ঘর, আপনি দেখেছেন হুজুর, ছোটবেলায়। প্রসারিত দক্ষিণ করতল মাটির কতকটা উপরে সমান্তরালভাবে রাখিয়া কহিল, এত বড় তখন আপনি, কুল খেতে গেছলেন, কুল খেয়ে কাশি হ'ল আপনার, কর্তা কত রাগ করলেন, সে অনেক দিনের কথা হুজুর, এখনও মনে হচ্ছে—

হারাধন বাধা দিয়া কহিল, আমি আসব জানলে কি ক'রে সব?

লোকটা একগাল হাসিয়া জবাব দিল, হুজুর, শিঙে ফোঁকার শব্দ শুনে। আমিই সক্কলকার আগে শুনেছিলাম হুজুর; সঙ্গে ছিল আমাদের ফটকে—বললাম, হ্যাঁ, দেখ্, কে শিঙে ফুঁকছে রে এখন? তা ফটকে দেখেই বললে, শিঙে নয়, হাওয়া-গাড়ি, ওই ঝিলিক মারছে দেখ্। গাড়িটার গায়ে পরম সমাদরের সহিত হাত বুলাইয়া কহিল, আচ্ছা গাড়ি কিনেছেন হুজুর! ম্যাজিষ্টর সাহেবের গাড়িকেও হার মানিয়ে দেয়।

গাড়িটাকে ঘিরিয়া সমস্ত লোকগুলা যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, গাড়ির মালিকের চেয়ে গাড়িটাই তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে বেশি। হতাশ হইল হারাধন; ক্ষুন্নস্বরে কহিল, তোমরা বাড়ি যাও, রোদ হয়ে গেছে। ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকাইতে আদেশ দিল। পশ্চিমা পাইক লছমন সিং আসিয়া সসম্মানে সেলাম করিয়া প্রভুকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেল।

রায়হাটি এবং আরও পনরো-ষোলটা ছোট-বড় মৌজা লইয়া রায়হাটির রায়দের জমিদারি। এই ছোট জমিদারির আয়ে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করা চলে না, গাড়ি-ঘোড়া হাঁকানোও চলে না। হারাধনের পূর্বপুরুষেরা কোনদিন তাহা করে নাই। তাহারা বরাবর গ্রামে বাস করিত, মোটামুটি চালে চলিত, গ্রামের সকলের সুখ ও

দুঃখের সমান ভাগ লইত। হারাধন প্রথম এই বংশে বি. এ. পাস করিল, জনৈক খাস-কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিল, শ্বশুরের পরামর্শে কাঠের ব্যবসা শুরু করিল। ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতে লাগিল হারাধনের। উৎসাহিত হইয়া সে কয়লার ব্যবসা ধরিল; ক্রমে কলিয়ারির কণ্ট্রাক্টার ও আট-দশ বৎসরের মধ্যেই দুই-তিনটা কলিয়ারির খোদ মালিক হইয়া উঠিল। কলিকাতায় বাড়ি করিল হারাধন। গ্রামে পৈতৃক পুরাতন বাড়ি ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া নূতন হাল-ফ্যাশনের বাড়ি করিল। প্রতিবেশী নারাণপুরের পড়তি জমিদারের অনেকগুলা মৌজা নিলামে ডাকিয়া লইয়া নিজ জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি করিল। দেনার দায়ে, বাকি খাজনার জন্য নিলাম করিয়া এবং মোটা দাম দিয়া প্রজাদের অনেক জমি খাস করিয়া লইল। নিজ জোতে প্রায় হাজার দুই বিঘা জমি চাষের ব্যবস্থা করিল, উৎপন্ন শস্য কলিকাতার ও কলিয়ারির বাজারে বিক্রয় করিয়া জমিদারির আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করিল। তারপর যুদ্ধ বাধিল, হারাধন মিলিটারির কণ্ট্রাক্ট লইল। দুইদিনে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল হারাধন, অজস্র টাকা লাভ হইতে লাগিল; ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ছয় অঙ্কে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। কলিকাতায় তিন-চারখানা বাড়ি করিল হারাধন; চার-পাঁচখানা গাড়ি কিনিল; পুরাতন ব্যবসাগুলি বিস্তারিত করিল, নূতন নূতন ব্যবসার পত্তন করিল; দুই-তিনটা ব্যাঙ্কের ।ডরেক্টর হইল; গঙ্গার ধারে রবিবাসরীয় আমোদ-প্রমোদের জন্য বাগানবাড়ি কিনিল; মোটা মাসোহারা দিয়া জনৈকা হালি ফিল্মস্টারকে বিলাসসঙ্গিনী করিল; একজন নামজাদা অ্যারিস্টোক্র্যাটিক গুরুর শিষ্য হইল; কর্পোরেশনের কমিশনারির জন্য পাড়ার হিন্দু-সৎকার-সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইল; হিন্দু মহাসভার মেম্বর হইল ও ব্যবস্থাপক সভায়

ঢুকিবার জন্য পার্টি-ফণ্ডে মোটা চাঁদা দিতে লাগিল; রায় বাহাদুরির জন্য নিজ জেলার হাকিম বাহাদুরদের পূজা পাঠাইতে লাগিল। মোট কথা কলিকাতার বাঙালী, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী-সমাজে, হারাধন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিল।

বেলা তিনটার সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া হারাধন দোতলার ঢাকা বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ারে বসিল। দিবানিদ্রার জন্য মুখটা থমথম করিতেছে, চোখ দুইটা লাল। বার দুই হাই তুলিয়া খাস-ভৃত্য রামচরণকে ডাক দিল, রামচরণ! রামচরণ ত্বরিত পদে আসিয়া দেখা দিল।

হারাধন কহিল, এক গ্লাস জল দে।

একটা কাচের গ্লাসে জল আনিল রামচরণ। ঢকঢক করিয়া সমস্ত জলটা গিলিয়া হারাধন গ্লাসটা রামচরণের হাতে ফেরত দিল; রামচরণের হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিয়া তোয়ালেটা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, হলধর ফিরেছে, খবর জানিস?

রামচরণ জবাব দিল, না হুজুর, ফেরে নি এখনও।

কোথায় গেছে সে?

নারাণপুরের জমিদারদের একটা তালুক নিলাম হচ্ছে, সেইটা ডাকবার জন্তে জেলায় গেছে—সন্ধ্যের বাসে ফিরবে।

স্মরণ হইল হারাধনের; কহিল, আচ্ছা, যা। হারাধন ঈজি-চেয়ারটায় উপরে অর্ধশায়িত হইল। রেলিঙের ফাঁক দিয়া বহুদূর দেখা যায়, গ্রামের দক্ষিণ সীমার উঁচু পাড়ওয়ালা গড়পুকুর, তাহার পরেই সমস্ত দক্ষিণ দিকটা ব্যাপিয়া শুভঙ্করীর দাঁড়া পর্যন্ত বিস্তৃত প্যারীমোহনের মাঠ—একচকে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি, আগে

নারাণপুরের জমিদারদেরও অংশ ছিল এখানে; দেনার দায়ে তাহাদের অংশ কিনিয়া লইয়াছে হারাধন। শুভঙ্করীর দাঁড়ার ওপারে, ছোট একটা গ্রাম—কেঁদবেদে, তাহার পরেই দধিমুখো, গয়লাবাদী—ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, হারাধনের জমিদারির মধ্যে, তাহার পরেই গদারডিহির জঙ্গল—চওড়া সবুজ পাড়ের মত ফুটিয়া আছে দিগন্তের গায়ে। এইখানেই হারাধনের জমিদারি শেষ হইয়া নারাণপুরের আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জুড়িয়া গদারডিহির জঙ্গল—শাল, পিয়াল, পিয়াশাল, নানা রকমের গাছে ভর্তি। জঙ্গলটার উপরে লোভ আছে হারাধনের। তবে নারাণপুরের জমিদারির অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহার মনোবাসনা ষোলআনা পূর্ণ হইতে দেরি নাই। নারাণপুরের মুখুজ্জেদের আগে খুব নাম-ডাক ছিল, কিন্তু বর্তমান জমিদারের পিতামহ যোগেন্দ্রনারায়ণের বিলাস-ব্যসনের মাত্রা ঐশ্বর্যের পরিমাণকে ছাড়াইয়া গেল, ফলে তাঁহার জীবনকালেই বহু দেনা হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ সে দেনা পরিশোধ করিতে পারিলেন না, বরং বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, বর্তমান জমিদার—ভগবতীনারায়ণ তো দেশ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং দেনা করিয়া সেখানের খরচ চালাইতেছেন। একটি শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ হারাধনের মনে একটি আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিষাদের সুর বাজিতে লাগিল—ঐশ্বর্যই সুখের কারণ নহে। সে তো অনেক ধন, অনেক ঐশ্বর্য আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু সে সুখী কি? তাহার রুক্ষস্বভাবা চিররুগ্না স্ত্রী; একমাত্র পুত্র, সে চিররুগ্ন। ওই ভগবতী মুখুজ্জে আকণ্ঠ দেনায় ডুবিয়া থাকিয়াও হয়তো তাহার চেয়ে সুখী।

রামচরণ আসিয়া খবর দিল, গাঁয়ের জনকয়েক ভদ্রলোক দেখা করতে চাচ্ছেন। হারাধনের মুখের উপর একটি বিরক্তির ছায়া শরতের আকাশে লঘু খণ্ডমেঘের মত দ্রুত পার হইয়া গেল; কহিল, ডেকে নিয়ে আয় এখানে, আর কতকগুলো বসবার জায়গা দিয়ে যা। রামচরণ খানকয়েক চেয়ার আনিয়া রাখিয়া আগন্তুকদের ডাকিবার জন্য চলিয়া গেল।

জন-পাঁচেক ভদ্রলোক আসিলেন; গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট—নয়ন ঘোষাল, পোস্টমাস্টার, আর দুই জন ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর। হারাধন আপ্যায়নসহকারে সকলকে বসিতে বলিল। নয়ন কহিল, শরীর ভাল আছে বেশ?

হারাধন নিজের পরিপুষ্ট দেহের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল, ভালই। আপনার?

নয়ন কহিল, আমাদের ভাল-মন্দর কথা ছেড়ে দেন, যা দিনকাল পড়েছে দেশে!

হেডমাস্টার গলা ঝাড়িয়া, বার দুই কাশিয়া কহিলেন, একটা অনুরোধ করবার জন্য এসেছি আপনার কাছে।—বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন। হারাধন গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া রহিল। হেডমাস্টার বলিলেন, খুব অন্যায় অনুরোধ নয়, জমিদারের কাছে প্রজাদের সে অনুরোধ করবার ন্যায্য অধিকার আছে। শেষের দিকে গলাটা বসিয়া গেল মাস্টারের; উত্তেজনায় মুখটা লাল হইয়া উঠিল, রগ দুইটা গরম হইয়া উঠিল, কানের ভিতরে ঝিমঝিম শব্দ শুরু হইল, ঠোঁট শুকাইয়া উঠিল; জিব দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া কহিলেন, প্রজারা আপনার সন্তানের মত, পিতার কাছে সন্তানের যে কোন দাবি-দাওয়া করতে লজ্জা নেই।

হারাধন এবার মৃদু হাসিয়া কহিল, অনুরোধটা কি ?

হেডমাস্টার কহিলেন, আপনার গোলাবাড়িতে এ বৎসর প্রচুর ধান মজুত হয়েছে ; প্রজাদের অনুরোধ, এ ধান আপনি এ বৎসর বাইরে নিয়ে যাবেন না। যেন কোন একটা অসম্ভব অনুরোধ প্রত্যাশা করিতেছে—এই ভাবে কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া হারাধন এতক্ষণ শুনিতেছিল, কথা শেষ হইবামাত্র নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া, কপালের কুঞ্চনরেখাবলী অপসারিত করিয়া কহিল, ওঃ; এই অনুরোধ ! আমি ভাবি, কি হাতী-ঘোড়া চেয়ে বসবেন ! গম্ভীর হইয়া কহিল, তা আমার উদ্দেশ্য তো হলধরের মুখে আপনাদের জানিয়েছি।

হেডমাস্টার বিনীতভাবে কহিলেন, হ্যাঁ, তা জানিয়েছেন, তাতে কারও মন নিশ্চিন্ত হয় নি, আপনার মুখে না শুনলে—

হারাধন বাধা দিয়া কহিল, বেশ, আমার মুখেই শুনুন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর একটুখানি তীক্ষ্ণ, চোখ দুইটা একটুখানি ছোট ও দৃষ্টি একটুখানি তীব্র করিয়া কহিল, দেখুন, মাস্টার মশায়, প্রজাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা জমিদারকে কি পরের কাছে উপদেশ পেয়ে তবে করতে হবে ? আমি বুঝেছিলাম, বাইরে থেকে এ বছর দালালরা এসে এখানের ধান-চাল সরিয়ে ফেলবে। লোকে কাঁচা টাকা হাতে পাবার লোভে সব উজাড় ক'রে তাদের হাতে তুলে দেবে। তাই আমি তাদের আসবার আগেই সব ধান কিনে নিয়েছি, অবশ্য ন্যায্য দামে। সকলের মুখের দিকে পর পর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়াইয়া কহিল, বলুন, কারও কাছ থেকে জমিদার হিসাবে জোর ক'রে, কি কম দাম দিয়ে কিছু আমি নিয়েছি ? আপনারা তো জমিদারির সব খবর রাখেন—বলুন, আপনারা সে রকম কোন অভিযোগ আমার সম্বন্ধে শুনেছেন ?

সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

হারাধন কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিয়া কহিল, দু লক্ষ টাকার ওপর খরচ করেছি আমি, ওই টাকা এমনই ভাবে ফেলে না রেখে, যদি ব্যবসায় খাটাতাম তো এতদিনে লক্ষ টাকা ঘরে আসত আমার। তবু প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে, তাদের অন্নাভাব থেকে বাঁচাবার জন্যে সে ক্ষতি আমি স্বীকার করেছি। শেষ দিকটায় কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া উঠিল হারাধনের—করুণার কোমল সজলতায় চোখ দুইটা চকচক করিতে লাগিল। সকলে হতভম্বের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজের প্রতি সন্তোষের সীমা রহিল না হারাধনের; চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছে সে; অ্যাসেম্ব্লিতে ঢুকিলে সেখানে সে বেমানান হইবে না।

হারাধন হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকাইয়া কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষ মিশাইয়া কহিল, আর কিছু বলবার আছে আপনার? হেডমাস্টার লজ্জারক্ত মুখে কহিলেন, আজ্ঞে না, আর কি বলব! নয়ন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, বলবার আছে বইকি। আপনি শতায়ু হয়ে প্রজাদের এমনই ভাবে মঙ্গল করতে থাকুন।

একজন ঝাঁকড়া ভুরু ও গোঁফ, খচখচে দাড়ি, ড্যাবডেবে চোখ —এতক্ষণ ভ্রূ দুইটা একসঙ্গে যুক্ত করিয়া কপাল কুঁচকাইয়া শুনিতেছিল ও মাঝখানে ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া ও কণ্ঠপেশী ফুলাইয়া কি বলিবার চেষ্টা করিয়াই থামিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মুখটা হাঁ করিয়া বলিতে শুরু করিল, আ-আ-আ—। নয়ন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল, চুপ কর। নয়নের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া, তাহার দিকে জলন্ত চক্ষে চাহিয়া কহিল, ব-ব-বলতে দাও—আ-আ-আমি তো ব-ব-বরাবরই বলছি যে, হ-হ-হ—। বলিতে বলিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল, চোখের তারা

কপালে উঠিবার উপক্রম করিল, কপালের শিরা ও কণ্ঠপেশী ফুলিয়া উঠিল। নয়ন কহিল, থাম না, দম আটকে মারা যাবে যে! লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হোক, হু-হু-হুজুর না বললে, হু-হু-হু—। পাশের লোকটা বলিয়া দিল, 'হলধরের'। ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া লোকটা কহিল, সা-সাধ্যি কি!

হারাধন হাসি চাপিয়া কহিল, সত্যিই তো, আমি না বললে হলধর কি এ কথা বলতে পারে? লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ব-ব-বলুন তো, আ-আ-আমি—গো-গো-গোড়া থেকে, এ-এ-এ—। বাধা দিয়া হারাধন কহিল, বুঝেছি, তা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, চাল-ধান যা আছে সব আপনাদের জন্যেই থাকল, ঠিক সময়ে আপনারা পাবেন।

রাত্রি আটটা। বৈঠকখানায় একটা ঈজি-চেয়ারে বসিয়া হারাধন রূপার গড়গড়ায় জরির-কাজ-করা নল দিয়া তামাক খাইতেছিল। সচরাচর সে সিগারেট খায়; তবে গ্রামে আসিলে জমিদারি চাল বজায় রাখিবার জন্য গড়গড়া ব্যবহার করে। খাস-ভৃত্য রামচরণ দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল।

গোমস্তা, গৌরবে ম্যানেজার—হলধর সরকার হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘরে ঢুকিয়া, হারাধনের সামনে লম্বালম্বি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া, হারাধনের চটিজুতা-মোড়া পা দুইটাতে কপাল রাখিয়া, মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, তারপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, প্রভুর চটিজুতা হইতে যতটা সম্ভব ধূলি সংগ্রহ করিয়া তাহা মাথায় ও জিবে ঠেকাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে বুকে চাপিয়া ধরিল। হারাধন কহিল, ব'স।—বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে পাশের একটা বেঞ্চিকে নির্দেশ করিল। প্রভুর সম্মুখে উচ্চাসনে বসিতে কুণ্ঠিত হইল হলধর, যেখানে

দাঁড়াইয়া ছিল সেইখান হইতে একটু সরিয়া আসিয়া মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল।

হারাধন কহিল, কত চাল সংগ্রহ করেছ?

হলধর কহিল, প্রায় চল্লিশ হাজার মণ। হারাধন সবিস্ময়ে কহিল, বল কি, এত? হলধর বিনীত হাস্যসহকারে কহিল, আমাদেরই তো ছিল প্রায় দশ হাজার মণ, বাকি সব কিনেছি, সবাইকারই বিক্রি করবার খুব আগ্রহ, কাজেই খুব চড়া দরে কিনতে হয় নি।

আগ্রহ কেন?

এধারে গুজব যে, সরকার সব ধান কেড়ে নিয়ে যাবে, কাজেই যার যা ছিল বিক্রি ক'রে দিয়েছে, অবশ্যি যারা ব্যবসায়ী তারা করে নি।

হারাধন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সব বস্তাবন্দী করা হয়েছে?

হুজুর, হ্যাঁ।

পাহারার ব্যবস্থা আছে তো?

মাহিন্দী বাগদী আর ওর ছেলে গোকুল পালা ক'রে সারারাত পাহারা দেয়, ওরা আমাদের খুব বিশ্বাসী লোক।

হারাধন হাসিয়া কহিল, এত চাল কি হবে, কেউ প্রশ্ন করে নি? হলধর প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, খুব। সবাইকার মুখেই এক কথা—এত চাল কি হবে!

কি বলেছ?

হলধর কহিল, আপনি যা বলতে আদেশ করেছেন, তাই বলেছি। পড়া মুখস্থ বলার সুরে বলিতে লাগিল, দেশের চাল যাতে বাইরে যেতে না পারে, সেইজন্তে হুজুর চাল আটকে রাখছেন, শ্রাবণ-

ভাদ্র মাসে যখন চালের দাম আগুন হয়ে উঠবে, হুজুর তখন সস্তা দরে চাল ছাড়বেন, যারা কিনতে পারবে না তাদের দান করবেন। ঢোক গিলিয়া কহিল, দেশে ধন্য ধন্য রব প'ড়ে গেছে হুজুর।

হারাধন গম্ভীর মুখে তামাক টানিতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে কহিল, তাই মতলব ছিল হলধর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারলাম কই?

হলধর বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, এবারও কি তা হ'লে—

হারাধন বাধা দিয়া কহিল, বিক্রি ক'রে দিতে হবে মিলিটারিকে, সরকারের হুকুম, না করলে একেবারে শ্রীঘরবাস। জান তো, কি দিনকাল চলছে এখন দেশে! হলধর আর্তকণ্ঠে কহিল, দেশে কেউ যে খেতে পাবে না হুজুর, ম'রে যাবে সব। হারাধন উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, গীতা পড়েছ হলধর?

হলধর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না। হারাধন কহিল, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়ে অর্জুন যখন একটুখানি নার্ভাস হয়ে—মানে, ঘাবড়ে গেলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সাহস দেবার জন্যে বলেছিলেন, হে অর্জুন, কুরুপক্ষের ওই যে ধুরন্ধর যোদ্ধারা সব চিড়বিড় করছে, ওরা সব ম'রে গেছে, শুধু ওরা নয়, ওদের হাতী-ঘোড়াগুলো পর্যন্ত, কাজেই ওদের উপর অস্ত্রাঘাত করতে কোন অধর্ম নেই, বরং ধর্ম, কারণ ওরা পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করছে মাত্র। ওদের পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যেই আমি অবতীর্ণ হয়েছি। কাজেই তুমি এ কর্ম না করলে, কষ্ট ক'রে আমাকেই হাতিয়ার ধরতে হবে।

হলধর কহিল, যাত্রার দলে দেখেছি হুজুর, দ্রোণ-ভীষ্ম এরা আসরে এসে বেজায় দাপাদাপি করে, আসরের মাঝে বসাই দায় হয়, ওরা যদি যুদ্ধ করবার আগেই ম'রে ব'সে থাকে, তবে—

হারাধন কহিল, ওসব কথা তুমি বুঝবে না হলধর। আসল

কথা কি জান, আমাদের দেশের পিলে-পেটা, হাড়-জিরজিরে লোকগুলো মরুক আর বাঁচুক তাতে পৃথিবীর কিছু যাবে-আসবে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, অর্থাৎ যারা বীর তাদেরই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা উচিত। কাজেই সরকার ঠিক করেছেন, দেশ-বিদেশের যারা ভারতবর্ষে এসে যুদ্ধ করছে, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা আগে করতে হবে, তারপর যা বাচবে সাহেবেরা পাবে, আর যারা যুদ্ধে সাহায্য করছে—যেমন, মন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী, আমাদের মত মিলিটারি কণ্ট্রাক্টর ইত্যাদি, তারা পাবে, তারপরেও খুদ-কুঁড়ো যা বাঁচবে, পায়রাদের ধান ছড়িয়ে দেবার মত ছড়িয়ে দেওয়া হবে সারা দেশে, যে যা পারে খুঁটে খাবে।

হলধর ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হুজুর, আমারও যে কিছুই নেই, ওই চালের ওপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছি,—শুধু আমি নয়, আপনার চাকর-বাকর সব।

হারাধন বরাভয়দানের ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া কহিল, তোমাদের কোনও ভয় নেই হলধর, তোমরাও তো যুদ্ধে সাহায্য করছ। এই যে এত চাল সংগ্রহ করা, তাদের বস্তাবন্দী করা, পাহারা দেওয়া, গ্রামের লোককে ভুজুং দেওয়া, এ সব তো তোমরাই করছ। আমি আর কতটুকু করছি বল, ভগবান হাতে টাকা দিয়েছেন, খরচ করছি মাত্র।

হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া হারাধন কহিল, সবই ভগবানের লীলা হলধর, কেউ কিছু করে নি, তিনিই যাকে যা করাবার করিয়েছেন। বলিয়া কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া হারাধন বোধ করি মানসচক্ষে ভগবানের লীলা সন্দর্শন করিতে লাগিল, তারপর চোখ খুলিয়া কহিল, আমার গুরুদেব কি বলেন জান হলধর?—মহাকালের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে, স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল একাকার হয়ে যাবে।

হলধর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, তাণ্ডবনৃত্য কি হুজুর ?

হারাধন কহিল, জান না ? আচ্ছা, চালগুলো ভালয় ভালয় পার ক'রে দাও, তারপর তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখাব।

হুজুর, মহাকাল না কি বললেন, উনি কি আজকাল কলকাতাতেই নাচছেন ?

হারাধন হাসিয়া কহিল, আরে, মহাকালের নাচ তো জগৎ জুড়েই চলছে, কলকাতায় নাচে আমাদের সব বাঙালী নাচিয়েরা,—গাট্টা-গোট্টা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, সাজগোজ ক'রে হাত-পা ছুঁড়ে সে কি নাচ! দেখে তাক লেগে যাবে তোমার। দশ টাকা ক'রে টিকিট। তা পয়সা দেওয়া সার্থক কিন্তু। কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা হরেক রকমের সাজপোশাক প'রে পরী হুরী সেজে দেখতে আসে, আশেপাশে সামনে-পেছনে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি ক'রে বসে, তারই দাম এক শো টাকা; নাচটা তো ফাউ। তা তুমি সব ব্যবস্থা ক'রে দাও, তারপর কলকাতায় গিয়ে দেখে আসবে।

হলধর কহিল, এত চাল কি গরুর গাড়িতেই যাবে ? তা হ'লে কিন্তু সবাই জানতে পারবে, তারপর মাল গাঁ থেকে বার করা দায় হয়ে উঠবে।

হারাধন কহিল, সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নেই। জেলার বড় হাকিম—এস. ডি. ও. সে বিষয়ে ভার নিয়েছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশখানা লরি আসবে, রাতারাতি সব ধান স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তারপর রেল-কোম্পানির ভার। তুমি কেবল গাঁয়ের লোককে ঠাণ্ডা ক'রে রেখো।

হলধর কহিল, তা না হয় রাখলাম হুজুর, কিন্তু পরে যখন জানতে

পারবে তখন মেরে গুঁড়ো ক'রে দেবে সবাইকে ; মুখের অন্ন যারা কেড়ে নিয়ে যায়, তাদিকে কি কেউ ছেড়ে দেয় হুজুর ?

অবজ্ঞার স্বরে হারাধন কহিল, সব করবে ! এই যে পূর্ববঙ্গ থেকে সব ধান-চাল সরিয়ে দিয়েছে সরকার, সবাই জানতেও তো পেরেছে, কে কি করেছে ? দিনকতক হা-হা, হু-হু, হৈ-হৈ, তারপর যে-কে সেই। মরদের বাচ্চা কি এ দেশে আছে হলধর ? সব মরা মানুষ, বললাম যে এখনই।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা ছাড়া তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একটা ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দোব এখন ; তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফিরে আসবে। ঠাণ্ডা না হ'লেও ক্ষতি নেই, কারণ যে পদ নিয়ে তুমি আসবে, সবাইকে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়ার দাওয়াই তোমার হাতে থাকবে।

হলধর বোকার মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, বুঝলাম না হুজুর।

হারাধন মুচকি হাসিয়া কহিল, তুমি তো এখন একজন ক্ষুদে জমিদারের গোমস্তা, যখন আসবে তখন হবে একটা বড় জমিদারের ম্যানেজার।

হলধর সবিস্ময়ে কহিল, আপনি কি নতুন জমিদারি কিনছেন হুজুর ?

হারাধন পুরাপুরি হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ হে, নারাণপুরের ভগবতী-বাবুর এক মাড়োয়ারীর কাছে অনেক টাকা দেনা। তার সুদ ঠেলে জমিদারির খাজনা মেটানোই তাঁর দায় হয়েছে। তাই জমিদারিটা মাড়োয়ারীকেই বিক্রি করছিলেন। আমাদের বড় হাকিম—এস. ডি. ও. তা জানতে পেরেই ভগবতীবাবুকে নিষেধ ক'রে দেন, আর আমাকে

জমিদারিটা কেনবার জন্তে অনুরোধ করেন। ভগবতীবাবু ওঁর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়; আর আমার তো বন্ধু, কলকাতায় আলাপ। তা উনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এই জমিদারিটা কেনবার জন্তেই ধানগুলো বিক্রি করতে হচ্ছে, না হ'লে খেতই বা প্রজারা এক বছর। একটু হাসিয়া কহিল, তুমি হয়তো বলবে, আপনার কি টাকার অভাব? কিন্তু কথাটা কি জান, একটা কেন দশটা জমিদারি কেনবার টাকা আমার আছে, তবে ব্যবসার টাকা জমিদারিতে খরচ করতে চাই না, চাইলেও করবার উপায় নেই, গুরুদেবের কড়া নিষেধ, বলেছেন, কখনও তা ক'রো না বাবা। ওতে কোনটাই ভাল ক'রে চলে না। বলিয়া গুরুদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

হলধর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হারাধন কহিল, আমাদের বড় হাকিমকে দেখেছ হলধব?

হলধর একগাল হাসিয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি বইকি, এদিকে আসেন মাঝে মাঝে, তবে আমাদের মত লোকের সঙ্গে তো হুজুর—

হারাধন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, খুব ভাল লোক, হিন্দু ব্যবসাদাররা তো ওঁর মত হাকিম পেয়ে বর্তে গেল যুদ্ধের বাজারে। আমারও খুব উপকার করেছেন উনি; না থাকলে কিছুই হ'ত না।

ঢোক গিলিয়া কহিল, তা আমিও নেমকহারামি করব না, হাকিম-গিন্নীকে হাজার বিশেক টাকার একটা হীরের নেকলেস দোব ভাবছি। এখানের খুদে হাকিমগুলিও অনেক উপকার করলেন, ওঁদের তো আর মাথা-পিছু কিছু দিতে পারব না, তবে ওঁদের ক্লাবে হাজার দুই টাকা দিয়ে দোব।

হলধর কহিল, কেলাব কি হুজুর?

তা জান না! যেখানে হাকিমরা খেলাধুলো করেন, ফুর্তি করেন—

হলধর চোখ বড় করিয়া কহিল, হাকিমরাও খেলা করেন! আমি তো ভাবতাম, ওঁরা দিনরাত পোশাক এঁটে, গোমড়া মুখ ক'রে ব'সেই থাকেন।

হারাধন হাসিয়া কহিল, তুমি ভারি বোকা হলধর, হাকিম হ'লেও তো ওঁরা মানুষ; কাজের সময় কাজ করেন, তখন হাকিমী মেজাজে থাকেন; আবার কাজ শেষ হ'লেই তোমার আমার মত গল্পগুজব করেন, খেলাধুলো করেন। দেবতারা পর্যন্ত লীলা করেন, আর হাকিমরা করবেন না!

হলধর মাথা চুলকাইয়া কহিল, তা বটে হুজুর। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি, লরিতে তো মাল যাবে, কিন্তু শব্দ তো একটু হবেই, তখন যদি লোকে জানতে পারে?

হারাধন বেপরোয়াভাবে কহিল, পারলেই বা, সঙ্গে বন্দুকধারী পুলিস পাহারা থাকবে, দু-চারবার আওয়াজ করলেই যে যার ঘরে ঢুকবে।

হলধর কহিল, আমি বলি কি, হুজুর, ওসবে কাজ নেই। হাতাহাতি শিবরাত্তির মেলা আসছে; গাঁয়ের ছোকরারা থিয়েটার করবার জন্যে ঝুঁকেছে, তা আপনি এত দিকে এত টাকা খরচ করছেন, এ বাবদেও যদি কিছু দেন তো আপনার নামও হবে, আর থিয়েটার যদি হয় তো এ তল্লাটের কেউ বাড়িতে থাকবে না, সব জড়ো হবে গিয়ে শিবতলাতে; তখন চুপচাপ মাল পার ক'রে দিলেই হবে।

হারাধন পুলকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, ঠিক বলেছ। তুমি বোকা নও হলধর। বুদ্ধি আছে তোমার, তবে এখনও ধার পড়ে নি বেশ; দিন কতক কলকাতাতে থাকলেই বুদ্ধিতে শান পড়বে তোমার;

তোমাকে মানুষের মত মানুষ ক'রে দোব আমি, এ তল্লাটে আমার নীচেই হবে তোমার স্থান।

হলধর কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলিয়া গিয়া কহিল, হুজুর, আপনিই আমার মা-বাপ; আমার ভগবানের নীচেই আপনি,—পূজোর ঘরে, নিতাই-গৌরের পটের পাশেই আপনার ফটক রেখেছি হুজুর। গোবরার মা (হলধরের স্ত্রী) নিত্যি পূজো করে।

হারাধন সন্তোষের হাসি হাসিয়া কহিল, তাই নাকি! পাগল।

সেই দিন রাত্রি দশটার সময়ে রমেশ কবিরাজের ডিস্‌পেন্সারিতে গ্রামের ছোকরারা হলধরের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। এইখানেই তাহাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য-আড্ডা বসে। রাত্রে রমেশের কোন কাজকর্ম থাকে না; কাজেই ইহার জন্য তাহার কোন ক্ষতি হয় না; বরং মোদক বিক্রয়ের দরুন কিছু লাভই হয়। হলধরের বয়স ত্রিশের কোঠায় অনেকটা অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও সে ইহাদের বন্ধু। হলধরের গোলগাল চেহারা, শ্মশ্রুবিরল মুখ, নারীসুলভ কোমল কণ্ঠ; ফলে কেহই তাহাকে বয়োজ্যেষ্ঠের খাতির দিতে চাহে না। মাঝে মাঝে নিজ পদমর্যাদা স্মরণ করিয়া সে গাম্ভীর্য অবলম্বন করে; কিন্তু বেশিক্ষণ বজায় রাখিতে পারে না, অনভ্যস্ত পোশাকের মত অচিরে তাহা বর্জন করিয়া সকলের সহিত আবার হাসি-গল্প শুরু করিয়া দেয়।

গত রাস-পূর্ণিমা হইতে রায়হাটির ছোকরারা লজ্জায় কাহারও কাছে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। পাশেই বড়জুড়ি গ্রাম। ওখানের ছোকরারা গত রাস-পূর্ণিমায় তিন দিন নিজেদের দলের 'শখের যাত্রা' করিয়াছে। অথচ তাহারা একটা ঝুমুরের দল ডাকিয়াও গাওনা করাইতে পারে নাই। রায়হাটির এই কলঙ্ককালিমা সাফ

করিবার জন্ত তাহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে, কিন্তু গ্রামের লোকগুলির স্বাভাবিক ঔদাসীন্তের জন্ত বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহারা ডুগি-তবলা ও ঢোল কিনিয়াছে, একটা ভাঙা হারমোনিয়াম সারাইয়া কাজ-চলা গোছের করিয়া লইয়াছে, একখানা বই কিনিয়া নিয়মিত রিহার্সাল চালাইতেছে ; কিন্তু যাহা আসল অর্থাৎ টাকা, তাহারই কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। মাগগি-গণ্ডার বাজারের জন্ত গ্রামের কেহ একটি পয়সা বাহির করিতে চাহে নাই, কাজেই তাহাদের গোপনে চাল-ধান বিক্রয় ও পিতৃদেবদের পকেট-মারা-লব্ধ সামান্ত সঞ্চয়কে অবলম্বন করিয়া কি করিয়া এই বিরাট কাজ হাসিল করিবে ভাবিয়া সকলে সমবেতভাবে সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। জমিদার হারাধনবাবুর শুভাগমনের বার্তা শুনিয়া তাহারা নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আলোর রেখা দেখিতে পাইল এবং হলধর বাস হইতে নামিবামাত্র তাহাকে ঘেরাও করিয়া জমিদারের কাছে কথাটা কলে-কৌশলে পাড়িবার জন্ত অনুরোধ করিল।

হলধর আসিবামাত্র ছোকরারা সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল হলধরদা ?

আশু-ভবিষ্যতে যাহাকে বহুবিস্তৃত জমিদারির ম্যানেজার হইতে হইবে, তাহার এই চ্যাংড়া ছোঁড়াদের সঙ্গে হাসিয়া কথাবার্তা বলা চলে না। কাজেই হলধর গুরু-গাম্ভীর্যে মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিল, বলছি, তোমরা স্থির হয়ে ব'স দেখি।

হলধরের গাম্ভীর্য! হলধরের মাকুন্দে মুখে যদি এক নিমেষে গোঁফ-দাড়ি গজাইয়া উঠিত তো কেহ এতটা বিস্মিত হইত না। সকলে হকচকিয়া গিয়া একসঙ্গে বোকার মত হাসিয়া একসঙ্গেই থিতাইয়া গেল। হলধর এক পাশে গম্ভীর মুখে পায়ের উপর পা চাপাইয়া

বসিল। হায়! ভগবান যদি তাহাকে এক জোড়া টাণ্ডির মত গোঁফ দিতেন! তাহা হইলে তা দিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হলধর ব্যর্থ হইতে দিত না। সবাই চুপচাপ, মশকের গুঞ্জন স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। বিশু হালদার, হলধরের প্রায় সমবয়সী; ভয়ে ভয়ে কহিল, কি হে! খবর খুব খারাপ নাকি?

হলধর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল, তবে? এমন থমথমে হয়ে উঠলে কেন বল দেখি?

হলধর পোজ না বদলাইয়া কহিল, থমথমে আবার কি! এতবড় জমিদারি যার মাথায়, তার কি খেলোমি করলে চলে?

একজন শ্লেষের সহিত কহিল, এতদিন চলল, হঠাৎ আজই অচল হয়ে উঠল! জমিদার ধমক-টমক দিয়েছে নাকি?

ধমক! আমাকে?—বলিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিল হলধর।

বিশু কহিল, ওসব বাজে কথা যাক, জমিদার টাকা দেবেন কি না বল দেখি?

হলধর কহিল, দেবেন তো বলছি।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল, কত?

হলধর জবাব দিল, পাঁচ শো।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিল সব; বিশুই প্রথমে সামলাইয়া লইয়া কহিল, বল কি! অ্যাঁ! এতে যাত্রা কেন, থিয়েটার হবে যে! যা কখনও এ তল্লাটে হয় নি; বড়জুড়ির ছোঁড়াগুলো 'শখের যাত্রা' ক'রে ধরাকে সরা দেখছে, এর পর টুঁ করবার জোটি থাকবে না বাছাধনদের।

হলধর কহিল, হবেই তো। জমিদারবাবু বললেন, ছেলেরা যদি

একটু ফুর্তি করতে চায় তো যাত্রা কেন, থিয়েটারই করুক, যা খরচ লাগে আমি দোব।

সকলে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিল। একজন কহিল, এ যে গৌরী সেনকেও হার মানিয়ে দিলে হে, বলতে না বলতেই পাঁচ শো টাকা।

হলধর মৃদু হাসিয়া কহিল, ওঁর কাছে পাঁচ শো টাকা আবার টাকা! যাঁর দিন দশ হাজার টাকা আয়—

সকলে চোখ বড় করিয়া কহিল, বল কি! ক্ষণজন্মা পুরুষ!

হলধর কহিল, কিন্তু ভাই যা-তা বই করলে চলবে না; সরকারের সঙ্গে ওঁর হরদম কারবার; তা ছাড়া ধর্ম করছেন আজকাল, বললেন, এমন বই করতে হবে যাতে যুদ্ধু-টুদ্ধু লাফ-ঝাঁপ থাকবে না। বেশ মোলায়েম ধরনের ধর্মসংক্রান্ত বই, যাতে শুধু নরম নরম বক্তৃতা আর গান থাকবে, অবশ্য দু-চারটি নাচ থাকলেও আপত্তি নেই।

বিশু কহিল, বেশ তো। তেমনই বই করব। ধর—বিল্বমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র—

হলধর কহিল, বিল্বমঙ্গলই ভাল, হরিশ্চন্দ্রে একটু হাঁকডাক আছে, শুনেছি কলের গানে। যখন বারণই করেছেন, থাক্ না ভাই, বিল্বমঙ্গলই ভাল।

একজন কহিল, চিন্তামণির পার্ট তা হ'লে হলধরদাদা নিচ্ছ তো? বেশ, গোঁফদাড়ি কামাতে হবে না।

আর একজন কহিল, তা হলধরদাদাকে মানাবে মন্দ নয়; একটু মুটকি হয়ে যাবে, তা চিন্তামণিকে যে প্যাঁকাটি-মার্কা হতেই হবে তার কোন মানে নেই।

হলধর কহিল, না ভাই, আমার অনেক কাজ হাতে, আমাকে বাদ দাও। হয়তো সে সময় থাকতেই পারব না আমি।

সকলেই অনুযোগের স্বরে কহিল, বাঃ রে! তা কি হয়! তোমার দৌলতেই টাকা, আর তুমি থাকবে না?

হলধর কহিল, তা হোক ভাই, তোমরা ফুর্তি কর, যারা কাজের লোক তাদের কি এসব চলে?

সেই দিন রাত্রে—রাত্রি এগারোটা। মাহিন্দী বাগদী ও তাহার বেয়াই লখাই উঠানে বসিয়া মদ খাইতেছিল। এক পাশে মদের হাঁড়ি, সামনে একটা থালায় কতকগুলা মুড়ি ও একটা পাতায় পাঁঠার নাড়ীভুঁড়ি ভাজা। লখাই এক ভাঁড় মদ গিলিয়া এক থাবা চাট মুখে ভরিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল, তোমরা বেশ আছ মাইরি, আমাদের দুবেলা ভাত জুটছে না, আর তোমাদের নবাবী খানা।

মাহিন্দী তাহার টাঙির মত গোঁফের ডান প্রান্তটা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা চুমরাইতে চুমরাইতে পরম তৃপ্তির সহিত কহিল, হুঁ, তা বটে, বলছি যে, তোমরা এখানে চ'লে এস সবাই, গোমস্তাবাবুকে ব'লে অশ্বত্থতলার জায়গাটা ক'রে দেওয়াব, তা তোমার মনে লাগছে কই? কি গুণ যে আছে মাইরি তোমার ওই ল'গাঁয়ের ভাঙা কুঁড়ের যে, নড়তে চাচ্ছ না কিছুতেই।

লখাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমার কি আর অসাধ হে, বুড়ী মা মাগী যত গোলমাল লাগিয়েছে। বুড়ী মরবে না কিছুতেই, নড়তেও চাইবে না। বলে, সোয়ামী-শ্বশুরের ভিটে, না খেয়ে মরব এখানে, তবু ভিন গাঁয়ে যেতে নারব। একটা চুটি ধরাইয়া টানিতে টানিতে লখাই কহিল, বেগতিক দেখলে আসতেই হবে শেষে, বুড়ী না আসে তো মরবে বেঘোরে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাকে পাহারা দিতে যেতে হবে না?

মাহিন্দী কহিল, যাব শেষ পহরে, গোকুল দিচ্ছে এখন, আমি যেয়ে ছাড়ান ক'রে দিব তাকে। কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিল, জোয়ান বউ ঘরে, সারারাত কি বাইরে থাকতে পারে, কি বল হে?—বলিয়া ঝাঁকড়া ভুরু নাচাইয়া লখাইকে কনুয়ের গুঁতা দিল মাহিন্দী।

লখাই গুঁতা সামলাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া চাপা কণ্ঠে কহিল, যা বলেছ। আমরা এখন বনে-বাদাড়ে সারারাত প'ড়ে থাকলেও কারও যায়-আসে না। সক্ষোভে কহিল, কি দিন গেছে মাইরি! ভাটিখানা থেকে ঘরে ফিরতে একটু রাত হ'লেই মুখ একেবারে হাঁড়ি, কত সাধ্যি-সাধনা করলে হাসি ফুটত। এখন এই দেখ না, এখানে যদি এক মাস ব'সে থাকি তো মাগীর গায়েই লাগবে না।—বলিয়া মুখটা বিরস করিয়া চুটি টানিতে লাগিল।

বেয়াইয়ের এক মাস বসিয়া থাকার সম্ভাবনা শুনিয়া মাহিন্দী শঙ্কিত হইয়া উঠিল; দেঁতো হাসি হাসিয়া কহিল, বেশ তো, থাকই না বেয়াই, দেখি, বেয়াইন কি করে! চোখ মটকাইয়া কহিল, বেয়াইনের এ বয়সেও যা ঠসক, বল তো আমি যেয়ে থাকব বেয়াইনের কাছে।

মাহিন্দীর স্ত্রী শুনিতে পাইয়া কহিল, অ্যাঁ, মর্ মিনসে, কথা দেখ, বুড়িয়ে মরতে যাচ্ছে, এখনও রস মরল না বুড়োর!

দুই বৈবাহিক হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

লখাই কহিল, গেলই বা বেয়ান, আমি থাকব, তার আর কি!

মাহিন্দী গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, আ মরণ!

লখাই কহিল, আমাদের ওখানে চাল-ধান এখনই যা মাগগি হয়েছে, আষাঢ় শ্রাবণে যে কি দশা হবে, কে জানে? তোমাদের এখানে তো রামরাজত্বি, যা শুনছি, এ রকম জমিদার লাখে একটা হয় কি না সন্দেহ।

মাহিন্দী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা সত্যি।

লখাই বোধ করি মাহিন্দীর কাছ হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের আশা করিয়াছিল, মাহিন্দীর প্রকাশ্য স্বীকৃতিতে নিরাশ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, এ তল্লাটের সব ধানই তো নিয়েছেন তোমাদের জমিদার।

মাহিন্দী প্রতিবাদে কহিল, নিবেন কিসের লেগে, নগদ পয়সা দিয়ে কিনেছেন।

ঔৎসুক্যের সহিত লখাই কহিল, সব তোমাদের লেগে তো?

মাহিন্দী জোর দিয়া কহিল, নিশ্চয়। জমিদারির সব্বাইয়ের লেগে, কেউ বাদ যাবে না। একটু চুপ করিয়া কহিল, জমিদারি না থাকলে মান থাকে না, তাই। না হ'লে জমিদারির জন্যে থোড়াই পরোয়া করে জমিদার। লাখ লাখ টাকা ঘরে ঢোকে ব্যবসাতে, কি হবে এত টাকায়? একটি মাত্র ছেলে, তাও প্যাঁকাটির মত চেহারা।

কত ধান আছে, দেখেছ?

মাহিন্দী ঢোক গিলিয়া কহিল, তা দেখেছি বইকি।

আসলে কিছুই দেখে নাই মাহিন্দী। প্রায় আট-দশ বিঘা জায়গায় উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা জমিদারের গোলা-বাড়ি, জমিদারির সমস্ত ধান আসিয়া এখানে জমে; এইখানেই ছোট একটা অয়েল ইঞ্জিন দিয়া ধান ভানা হয়, তৈরী চাল বস্তাবন্দী হইয়া গুদামজাত হয়। পশ্চিমা পাইক লছমন সিং, রামসুন্দর সিং আর হলধর এসব তদবির করে, ভিতরে ঢুকিবার এখতিয়ার নাই মাহিন্দীর। তবু বেয়াইয়ের কাছে নিজের মর্যাদা বজায় রাখিতে হইবে তো!

মাহিন্দী কহিল, বিস্তর ধান, ধানের পাহাড় একেবারে, পর পর দু বছর অজন্মা হ'লেও এ তল্লাটের লোকের চিন্তা নেই।

লখাই কিছুক্ষণ গুম হইয়া ভাবিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যা বলছ ভাই, তাই করব আমি,—চ'লেই আসব আমি এখানে, তুমি গোমস্তাবাবুকে ব'লে রেখো আমার জন্তে।

শিবচতুর্দশীর রাত্রি। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে বুড়া শিবের মন্দিরে সন্ধ্যার পর হইতেই ভিড় জমিতে শুরু করিয়াছে। মন্দিরের চত্বরে, নাটমন্দিরে, মন্দিরের আশেপাশে যেখানে যতটুকু স্থান আছে, মানুষে ভর্তি হইয়া উঠিতেছে। দুই-চারিটা খাবারের দোকান বসিয়াছে, তক্তাপোশের উপর থালায় থালায় সাজানো জিলাপি, মণ্ডা, মুড়ি, মুড়কি, তেলেভাজা ইত্যাদি; দোকানের সামনে ছেলেমেয়েদের ভিড়। একটা বড খাবারের দোকানে কড়াভর্তি রসগোল্লা ও পানতুয়া; উনানে আঁচ দেওয়া হইয়াছে; ধোঁয়াতে চারিপাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, নাকে চোখে ঢুকিয়া দর্শকবৃন্দের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে ও চোখে জল ঝরিতেছে, তবু কেহ নড়িতেছে না। কারণ, অদূরে একটা বড় থালায় ময়দা মাখা হইয়াছে, এখনই কড়া চাপিবে, লুচি ভাজা হইবে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিবে; দর্শকবৃন্দের অনেকের ভাগ্যে তাহার আস্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইবে না, তবু দেখিয়াও সুখ। পানের দোকানও বসিয়াছে দুই-তিনটা, সস্তা সিগারেট ও বিড়ি বিক্রয় হইতেছে সেখানে। পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর যুবকেরা, তৈলচিক্কণ চুলে তেড়ি কাটিয়া, ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া, গায়ে রঙিন গেঞ্জি আঁটিয়া, এক-এক পয়সার পান খাইয়া মুখ লাল করিয়া, এক-একটা সস্তা সিগারেট টানিতে টানিতে নিম্নশ্রেণীর যুবতী মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে। মেয়েরাও সাজিয়াছে সাধ্যমত; চুল বাঁধিয়া চাকাবেণীর চারিদিকে বেলকাঁটা গুঁজিয়াছে; তেল গড়াইয়া কানের

পাশ ও কপাল চকচক করিতেছে; চোখে কাজল পরিয়াছে কেহ কেহ; কাহারও কপালে কাচপোকার টিপ, গালে পান; ফুলপাড় শাড়ি যত্ন করিয়া পরিয়াছে; কাহারও বা শাড়ির নীচে টকটকে লাল রঙের সায়া, গায়ে সস্তা ছিটের ব্লাউজ; কাহারও সায়া-সেমিজ নাই, গায়ে শুধু চটকদার রঙওয়ালা ব্লাউজ, কেহবা শুধু শাড়িখানি আঁটসাঁট করিয়া পরিয়া যৌবনসমৃদ্ধ বুকখানি সযত্নে ঢাকিয়া গাছ-কোমর বাঁধিয়াছে। একটা লোক সাপুড়ে বাঁশী বাজাইয়া ফুলছড়ি বিক্রয় করিতেছে—তাহাকে ঘেরিয়া ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়াছে। মেলার এক পাশে জুয়াখেলা চলিতেছে, খেলোয়াড় একটা শতরঞ্জির উপর খেলা পাতিয়া বসিয়াছে, পাশেই একটা টুলে একটা গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে; তাহাকে ঘেরিয়া বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে,—কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া; একটা লোক ক্রমাগত হাঁকিতেছে, ভারি মজার খেলা, চ'লে এস ভাই, এক-এক পয়সা, দো-দো পয়সা। কিছুদূরে একটা লোক মনিহারী দোকান পাতিয়াছে—রেশমী চুড়ি, রঙিন কাচের চুড়ি, ঘুনসি, মালা, কালো ফিতা, চীনেমাটির খেলনা ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস সাজাইয়াছে। তাহাকে ঘেরিয়া নানা বয়সের মেয়েদের ভিড়, লোভে ও প্রশংসায় উজ্জ্বল তাহাদের চোখ। দুই-চারিজন উবু হইয়া বসিয়া আছে; দোকানী মেয়েদের নরম হাতগুলি নিজের কড়া হাতে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে সুস্থে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চুড়ি পরাইতেছে, কেহ চুড়িতে হাত দিতে গেলেই সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতেছে, ছুঁয়ো না বাছা, ঠুনকো জিনিস, ভেঙে গেলে মিছামিছি গচ্ছা দিবে কেনে? গণিকাদেরও আমদানি হইয়াছে, আমসির মত শুকনা পাকানো চেহারা, কুৎসিত সাজসজ্জা, বীভৎস ভাবভঙ্গী, শিকার দেখিলেই অস্ত্র

চনিতেছে, ভোঁতা অস্ত্র ঠিকরাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, শিকার বলীলাক্রমে নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

আরও কতকটা দূরে মাঠের মধ্যে জমি চাঁচিয়া-ছুলিয়া পরিষ্কার করিয়া, শামিয়ানা টাঙাইয়া, থিয়েটারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এক দিকে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে; স্টেজের সামনে ড্রপসিন ঝুলিতেছে, উপরে শিবাজীর ছবি—ধাবমান সাদা ঘোড়ায় আসীন, এক হাতে রশ্মি, আর এক হাতে কোষমুক্ত তরবারি, দূরে প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের চূড়া দৃশ্যমান; সাইড স্ক্রিনে বঙ্কিমঠামে দণ্ডায়মানা অতিপীনোন্নত-পয়োধরা যুবতীর ছবি, চোখে কটাক্ষ, ওষ্ঠে হাসি, অঞ্জলিবদ্ধ হাতে রক্তকমলের অর্ঘ্য। এখানেও বিস্তর মেয়ে-পুরুষের ভিড়। সকলের মুখে বিস্ময় ও কৌতুক সুপরিস্ফুট। তল্লাটে আগে থিয়েটার কখনও হয় নাই। শখের যাত্রা হয়, আসরের চতুর্দিক ঘেরিয়া শ্রোতারা বসে, আসরের মধ্যে অভিনেতারা ঘুরিয়া বক্তৃতা ও গান করে। তিন দিক ঘেরা ঘরের মধ্যে কি রকমের যাত্রা! সকলকেই সামনের দিকে বসিতে হইবে! পিছনে কিংবা আশেপাশে বসিলেই সব মাটি! গোঁফদাড়ি-কামানো ভদ্রলোকের ছেলেরা সিগারেট টানিতে টানিতে ব্যস্ততার সহিত ঘুরাফিরা করিতেছে এবং সুযোগ পাইলে আশেপাশে চোখে-লাগা মেয়েদের এক চোখ দেখিয়া লইতেছে।

রাত্রি বারোটার সময়ে থিয়েটার আরম্ভ হইল। ভিড়ের আর অন্ত নাই; আশেপাশে দশ-বারোটা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, নেহাত শয্যাশায়ী রোগী ছাড়া সকলে আসিয়াছে। শহর হইতে একটা কন্‌সার্ট-পার্টি আসিয়াছে; তাহারা মজাদার নাচের সুর বাজাইতেছে। যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে; যাহারা বসিয়া

আছে, তাহারা হাঁটু অথবা মাথা নাড়িতেছে; যাহারা আরও একটু বেশি রসগ্রাহী, তাহারা তালি দিতে শুরু করিয়াছে।

মাহিন্দী বাগদী ও তস্য পুত্র গোকুলের আজ ছুটি। বাপ-বেটা মদে চুর হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা টকটকে লাল, গাল ও নাকের ডগা যেন ফুলিয়া চকচকে হইয়া উঠিয়াছে; ঠোঁট দুইটা মাঝে মাঝে চাড় দিয়া লম্বা করিতেছে, কখনও গুটাইয়া ছুঁচালো করিতেছে; মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, লাঠি ঘাড়ে টলিতে টলিতে এখানে সেখানে ছুটিতেছে ও শিথিল কর্কশ কণ্ঠে হাঁক-ডাক করিয়া জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি দুইটা। গোলা-বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপরে সারি সারি চল্লিশ-পঞ্চাশখানা বড় বড় লরি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় পঞ্চাশজন লোক পিঠের উপর বস্তা বহিয়া আনিয়া লরি বোঝাই করিতেছে; বোঝাই শেষ হইবামাত্র লরিগুলা গম্ভীর চাপা গর্জন করিয়া ছুটিতে শুরু করিতেছে; ছয় মাইল দূরে রেল-স্টেশনে মাল খালাস করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার মণ চাল সাফ হইয়া গেল। রামসুন্দর সিং সদর-দরজায় ভারী তালা ঝুলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে গেল।

সারা তল্লাটে জমিদারের প্রশংসায় কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। প্রজাদের আনন্দ-বর্ধনের জন্য জমিদারের এত চেষ্টা প্রায় দেখা যায় না। জয় হউক হারাধন রায়ের, তাহার টিকটিকির মত ছেলেটি তাকিয়া-মাফিক হইয়া উঠুক।

পরদিন রাত্রি হইতে মাহিন্দী ও তাহার ছেলে গোকুল আবার তেমনই নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত পাহারা দিতে লাগিল। গ্রামের লোক তেমনই নিশ্চিন্তে তাস-পাশা খেলিতে ও পরচর্চা করিতে লাগিল।

প্রয়েটার-করা ছেলেগুলি নিজ নিজ কৃতিত্বের গৌরবে মশগুল হইয়া রহিল ; পথচারী পথিকেরা গোলা-বাড়ির পাশ দিয়া যাওয়া-আসার সময়ে স্তম্ভগুলির পরিধি ও উচ্চতা সম্বন্ধে আগের মতই আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিল ; যাহারা হারাধনের প্রজা নহে, তাহারা আগের মতই হিংসায় পুড়িতে লাগিল।

মাস দুই যাইতে না যাইতে চালের দর দশ টাকা হইতে কুড়িতে উঠিল। মধ্যবিত্তেরা প্রথমে পুঁজি ভাঙিয়া, পরে জমি-জায়গা বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া, গহনা-পত্র গরু-বাছুর থালা-বাটি কাপড়-চোপড় বিক্রয় করিয়া চাল সংগ্রহ করিতে লাগিল ; শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সপরিবারে অণ্ডাল ও আসানসোল অঞ্চলে, যেখানে বিস্তর মিলিটারির কাজ চলিতেছিল, সেখানে পলাইতে লাগিল ; যাহারা অক্ষম ও দুর্বল তাহারা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং ভিক্ষা না পাইলে ঘাস ও গাছের পাতা-সিদ্ধ, ফল-মূল খাইয়া পেট ভরাইতে লাগিল এবং তাহাদের স্ত্রী বধূ ও কন্যারা অনেকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল। চাউলের ব্যবসায়ীরা যেখানে যাহার যতটুকু রক্ত আছে চুষিয়া লইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রক্তমোক্ষণও শুরু হইল কিছু-কিছু। তেঁতুলের বাগদী ও ডোমেরা, যাহারা বংশানুক্রমে ডাকাতি করিয়া জীবিকার্জন করিত ও ইংরেজ-শাসনের তাড়নায় ভালমানুষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা আবার লাঠি-সড়কি ও দা লইয়া মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে হানা দিতে লাগিল ; মুসলমানেরা গাই-গরু নির্বিচারে গোয়াল হইতে চুরি করিয়া কোরবানি করিতে শুরু করিল ; এবং শাসক-সম্প্রদায় সরকারের স্নেহ-ছায়াতলে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে

থাকিয়া, দেবলোকবাসী দেবতাগণের মত, দুঃস্থ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা পরম আত্মপ্রসাদের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

হলধর এতদিন কলিকাতায় বসিয়া ছিল, একদিন ফিরিয়া আসিল। চেহারা তাহার ফিরিয়া গিয়াছে, গায়ের রঙ একটু ফিকা হইয়াছে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্তায় শহুরে ছাপ লাগিয়াছে। গ্রামের লোক ধরিয়া বসিল তাহাকে, জমিদারবাবুকে ব'লে আমাদের এর পর চাল দেওয়ার ব্যবস্থা কর। গ্রামের ধানচালের ব্যবসায়ীরা আপত্তি করিল, এখনই ও-চালে হাত দেওয়া কেন? আমাদের কাছেই তো পাচ্ছে সব। যখন কোথাও পাওয়া যাবে না, তখন ওতে হাত দেওয়াই ভাল।

হলধর গম্ভীর বদনে ঘাড় নাড়িয়া যুক্তির ন্যায্যতা স্বীকার করিল।

গরিবেরা দল বাঁধিয়া কাছারির সামনে জমায়েৎ হইল। হলধর বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই বাপু?

সহস্র ক্ষুধার্ত ও ক্ষীণকণ্ঠ জবাব দিল, ভাত।

একজন মুরুব্বী-গোছের লোক সামনে আগাইয়া আসিয়া জোড়হাতে কহিল, হুজুর, জমিদারবাবু যে ধানের পাহাড় ক'রে রেখেছে, সে তো আমাদের জন্যেই। আমরা এতদিন আপনার অপেক্ষায় ব'সে আছি, আমাদের ধান এখন আমাদের দেওয়া হোক।

হলধর কহিল, ধান তো শুধু তোমাদের নয়। প্রসারিত ডান হাত দিয়া বাম হইতে দক্ষিণে অর্ধবৃত্ত রচনা করিয়া কহিল, সকলের।

লোকটা নীরস কণ্ঠে কহিল, বেশ, সকলকে দেওয়া হোক, দু-দশজন বাদে সকলের তো অভাব।

হলধর চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এখন নয়, এখনও গাঁয়ে চাল আছে, সেইখানেই কেনো গে তোমরা।

লোকটা অনুযোগের সুরে কহিল, পয়সা কই গো বাবু? কিনব কি ক'রে?

হলধর কহিল, কাজ করগে।

কাজ কই? কাজ দাও আমাদের।

হলধর ভারিক্কি সুরে কহিল, চারদিকেই কাজ হচ্ছে, ঘরে ব'সে আছ কেন? চ'লে গেলেই পার সব। মাহিন্দীকে হাঁকিয়া কহিল, তাড়িয়ে দে সবাইকে।

মাহিন্দীর শরীর তেমনই পুষ্ট ও সবল; জমিদারের অনুগ্রহপুষ্ট ভৃত্য সে, নিত্য সিধার বরাদ্দ আছে তাহাদের বাপ-বেটার জন্য। গোঁফ চুমরাইয়া লাঠি আস্ফালন করিয়া কহিল, চ'লে যাও সব এখান থেকে।

হলধর হাত নাড়িয়া কহিল. হ্যাঁ, চ'লে যাও, কিছু ভাবনা নেই তোমাদের, সময় হ'লেই চাল পাবে, এ কটা দিন কোন রকমে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করগে।

লোকটার চোখ দুইটা শান দেওয়া ইস্পাতের মত চকচক করিয়া উঠিয়া ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া শোকার্ত পিতা যেমন করিয়া হাসে তেমনই হাসিয়া কহিল, ও-চাল আর আমাদের খেতে হবে না বাবু। আমরা কি বাঁচব ততদিন! মাহিন্দীর উদ্দেশ্যে কহিল, তোরাই লুটে-পুটে খাবি ভাই, আমরা ম'রে যাব সব।

ক্ষুধার্ত জনতা ক্ষুব্ধ গুঞ্জন করিয়া সরিয়া গেল।

গ্রামের গোবিন্দ মণ্ডল হলধরের সহিত দেখা করিতে আসিল। গোবিন্দ একজন বড় চাষী, চারখানা লাঙলের চাষ; জমিদারের একজন বড় প্রজা, অনেক টাকার এলাকা রাখে সে। বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ, ছেলে-মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি কয়েকটা মোটা খরচের জন্য ধানের যা পুঁজি

ছিল বেচিয়া ফেলে ; তাহার উপরে গত বৎসরের অজন্মার জন্ম কাবু হইয়া পড়িয়াছে ; জমিদারের কাছে জমি বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিতে চায় সে। মাহিন্দী তাহাকে বসিবার জন্ম বারান্দায় চট পাতিয়া দিল। গোবিন্দ কহিল, সরকার মশায় কোথায় ? মাহিন্দী কহিল, ঘর গেছেন, আসবেন এখনই, ব'স।

হলধর হাস্তমুখে কহিল, কি হে মোড়ল, কি খবর ?

গোবিন্দ উঠিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, আমার সেটার কথা বলেছিলেন বাবুকে ?

হলধর চোখ মটকাইয়া কহিল, বলেছিলাম বইকি। যাব সন্ধ্যেবেলায় তোমার ওখানে, সব কথা বলব তখন।

গোবিন্দর একটি বিধবা পুত্রবধূ আছে, বয়স কাঁচা, সুন্দরীও বটে ; হলধরের নজর আছে তাহার উপরে ; গোবিন্দ তাহা জানে ; মাছ ধরিবার জন্ম টোপ খরচ করিতে তাহার দ্বিধা নাই ; হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল, সে তো আমার ভাগ্যের কথা, আপনার পায়ের ধূলো পড়বে আমার ঘরে।

গোবিন্দ বাড়ি ফিরিতেছিল, মুখে সন্তোষের পিচ্ছিল হাসি। হলধরকে খেলাইয়া যদি বামুনবেড়ার প'ড়ো জমিটা গছাইয়া মোটা টাকা আদায় করিতে পারে তো মন্দ হইবে না। হলধরের দৌড় তাহার জানা আছে ; দুষ্ট ক্ষুধা তাহার, পুত্রবধূর সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

রাস্তায় হরি বাড়ুজ্জের সঙ্গে দেখা হইল। হরির ভাই রেলে চাকরি করে, দাদার প্রতি ভক্তি তাহার অগাধ, মাসে মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দাদাকে পাঠায়। তাহাই জমাইয়া, তেজারতি করিয়া হরি দুই পয়সা করিয়াছে ও এই দুর্দিনের বাজারে অভাবগ্রস্ত অসহায় চাষীর গলা

টিপিয়া সস্তায় দশ-পনরো বিঘা জমিও কিনিয়াছে। গো-মড়কে শকুনির মত, উল্লাসে ও উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে হরি, বাড়িতে এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে পারে না, কোথায় কোন্ সুযোগ আছে, সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাই সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

হরি কহিল, কোথায় গেছলে গো মোড়ল?

গোবিন্দ পাশ কাটাইয়া কহিল, গোমস্তাবাবুর কাছে। আসি দাদা, জরুরী কাজ আছে ঘরে।—বলিয়া পা চালাইয়া দিতেই, হরি থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখে ও চোখে বিদ্রূপের ভঙ্গী করিয়া কহিল, দেখ মোড়ল, একটু আস্তে যেও, হোঁচট খাবে যে।

গোবিন্দ কহিল, সত্যি কাজ আছে, না হ'লে কথা কইতাম।

হরি চোখ দুইটা ছোট করিয়া ধারালো কণ্ঠে কহিল, এতদিন কাজকর্ম ছেড়ে আমার বাড়িতে ধন্না দিয়েছ, আজ বড়লোক পেয়ে বুঝি গরিবকে আর মনে ধরছে না, না?—বলিয়া বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট দুইটা ধনুকের মত বাঁকাইয়া তুলিল।

গোবিন্দ কহিল, তা আশ্রয় নিতে হ'লে বড় গাছে নেওয়াই ভাল, নয় কি বলুন?

হরি হাত নাড়িয়া কহিল, বেশ বেশ, তাই নাওগে হে। ছোট গাছও চিরদিন ছোট থাকে না, বড় হয়ে ওঠেই একদিন। তা ছাড়া আমার হাতে দিলে জমিটা ফেরত পেতে একদিন। ওখানে—। মাথাটা নাড়িয়া কহিল, ওটি চলবে না।

গোবিন্দ কহিল, কি করব বলুন? গোমস্তাবাবু নিজে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমার হয়ে জমিদারবাবুকে বলেছেন তিনি—

হরি হাসিয়া কহিল, বলবেন বইকি কত অনুগ্রহ তোমার ওপর! হঠাৎ মুখ-চোখের ভাব কঠিন করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, কিন্তু

বুঝবে বাবা একদিন মজাটা, নাম ওর হলধর, হলের মুখে সব সমভূম ক'রে দেবে ও।

বন্ধুবান্ধবরা হলধরকে ধরিয়া বসিল, হলধরদা, আমাদের একটা ব্যবস্থা কর।

হলধর মুরব্বিয়ানার সুরে কহিল, বেশ তো। চল না সব আমার সঙ্গে।

প্রশ্ন হইল, তুমি আবার যাচ্ছ নাকি ?

হলধর চোখ ডাগর করিয়া ভুরু নাচাইয়া কহিল, বাঃ রে! আমার না গেলে চলে! মস্তবড় একটা ব্যবসার ভার আমার হাতে। বাবু বলেছেন, উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্যন্ত আমার এখানে আসা চলবে না।

গোবরার মাও সঙ্গে যাবে নাকি ?

হলধর ঢোক গিলিয়া কহিল, ও একবার 'যাব' বলছে, কলকাতা কখনও দেখে নি ; তা ছাড়া গিন্নীমাও বললেন, একবার নিয়ে যেতে ; ভারি স্নেহ করেন তো সব আমাকে।

একজন কহিল, আমরাও কি গোবরার মায়ের সঙ্গে মেয়েমানুষ সেজে ঘোমটা টেনে অন্দরে ঢুকব নাকি ?

হলধর হাসিয়া কহিল, না হে, তা কেন ? তোমরা সব বার-বাড়িতে থাকবে, কত লোক প'ড়ে আছে সেখানে, সে যেন একটা হোটেলের ব্যাপার! কে আসছে, কে থাকছে, কোনও হিসেব নেই ; এলাহী ব্যাপার কিনা! বিস্তর পয়সা হ'লে যা হয় আর কি।

একজন কহিল, ঠাট্টা নয় ভাই, সত্যি বলছি, একটা ব্যবস্থা ক'রে

দাও আমাদের। সংসারের অবস্থা যা সঙিন হয়ে উঠছে দিন দিন, না হ'লে আর ভদ্রস্থতা থাকবে না।

হলধর গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, কুলি-ঠ্যাঙানোর কাজ করতে পারবে?

দুই-চারিজন কহিল, খুব। নেহাত চাকরবাকরের কাজ ছাড়া যা বলবে সব পারব।

হলধর কহিল, বেশ। বাবু একটা নতুন কণ্ট্রাক্টরি পেয়েছেন অণ্ডালের কাছে; চ'লে যাবে তোমরা ওখানে, বাবুর একজন কর্মচারী থাকেন সেখানে, বাবুর কাছ থেকে তাঁর নামে চিঠি লিখিয়ে পাঠিয়ে দোব তোমাদের।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অবস্থা সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। মহাজনেরা চাল আটকাইয়া দিল, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে চালের দাম মণ-করা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হইবে—এই আশায়। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বীজধান কিনিয়া খাইতে শুরু করিল; যাহাদের ছিল না, তাহারা কেহ কেহ সপরিবারে এক বেলা, কেহ দুই বেলাই উপবাস দিতে লাগিল। দরিদ্রেরা ফেনের জন্য বাড়িতে বাড়িতে হা-হা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু শীতল হস্ত বুলাইয়া অনেককে নিষ্কৃতি দিল, অনেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া নিষ্কৃতি মাগিয়া লইল। মধ্যবিত্তদের অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল, অনেক হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যাহারা এতদিন বিধবা কন্যা বা ভগ্নী বা দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াদের ভরণ-পোষণ করিতেছিল, তাহারা তাহাদের বিদায় করিয়া দিল। হতভাগিনীরা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া দাসীবৃত্তি বা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল।

তবু, যে বা যাহারা এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, তাহাদের কেহ দোষ দিল না। দোষ দিল নিজেদের অদৃষ্টকে, আর জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত নীলাভ ধূসর আকাশের দিকে তাকাইয়া ধিক্কার দিল অদৃশ্য বিধাতাকে।

একদিন কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর রাত্রে রায়হাটির সামন্ত ও ছত্রীদের এবং এক মাইল দূরবর্তী ইসলামপুরের মুসলমানদের মধ্যে, দুই গ্রামের মাঝখানে রায়পুকুরের ধারে একটা প্রকাণ্ড বড় গাছের তলায় মজলিস হইয়া গেল। বক্তৃতা দিল একজন বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের ছোকরা, বেঁটে কালো কাহিল, চোখে চশমা, পরিধানে খদ্দরের পাজামা ও পাঞ্জাবি, পায়ে কাবলী চটি। ইসলামপুরের একজন বর্ধিষ্ণু মুসলমানের ছেলে কলেজে পড়ে,—ছোকরাটি তাহারই বন্ধু, জাতিতে হিন্দু অথচ মুসলমানের বাড়িতে খাইতে থাকিতে আপত্তি নাই, ছোট খানা অবলীলাক্রমে পার করে, এবং ধরন-ধারণ দেখিয়া মনে হয়, বড় খানাতেও আপত্তি নাই; কাজেই গ্রামের মোল্লা সাহেব একটু চেষ্টা করিলেই ছোকরাটিকে কলমা পড়াইয়া আসল ধর্ম অবলম্বন করাইতে পারিবেন বলিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরাটি বলিতে লাগিল, জমি জমিদারের নয়, জমি যে চাষ করে তাহার। যিনি জমিদারকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমাদেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তাঁহার সৃষ্ট মাটিতে তোমাদের ও জমিদারের সমান অংশ থাকা উচিত। বরং তোমাদেরই থাকা উচিত, জমিদারকে অংশ হইতে বঞ্চিত করা উচিত। কারণ, জমিদার জমিতে কখনও পা পর্যন্ত দেয় না, আর তোমরা সারা বৎসর রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া জমি চাষ কর। জমিদার বৎসরের শেষে গোমস্তা পাইক ও বরকন্দাজ পাঠাইয়া তোমাদের পরিশ্রমলব্ধ শস্য কাড়িয়া লইয়া যায়; তোমাদের ঠকাইয়া তোমাদের শস্য অল্প দামে কিনিয়া বহুগুণ দামে সেই শস্য বাহিরের

বাজারে বিক্রয় করে। সারা বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বদলে তোমরা পাও অনাহার, নগ্নতা ও মৃত্যু, আর জমিদার বিনা পরিশ্রমেই পায় প্রচুর খাদ্য ও পরিধেয়—বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচুর উপকরণ। বংশানুক্রমে তোমরা দেশের খাদ্য উৎপাদন করিয়াছ, তোমাদের খাদ্যাভাব কখনও ঘুচিয়াছে কি? তোমাদের স্ত্রী পুত্র ও কন্যার মুখে কোনদিন হাসি ফুটাইতে পারিয়াছ কি? দুরন্ত রোগের কবলে যখন তোমাদের বুকের ধন—ছেলেমেয়েরা তোমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন মনের মত চিকিৎসা করাইয়া বা উপযুক্ত পথ্য দিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছ কি? তোমাদের সেই সনাতন ভগ্ন জীর্ণ কুটিরের কিছু উন্নতি বিধান করিতে পারিয়াছ কি?

আলকাতরার মত কালো ঘন অন্ধকার আশেপাশে সামনে প্রায় হাজার বিঘা জমির উপর কালো পাথরের মত জমাট হইয়া আছে; দূরে শুভঙ্করী দাঁড়ার ধারে আলেয়া জ্বলিতেছে, নিবিতেছে; গাছের উপর কতকগুলা পেঁচা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল।

ছেলেটি বলিতে লাগিল, এই যে তোমরা অনাহারে দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া মরিতেছ, তোমাদের জমিদার তাহার ধানের পাহাড় হইতে একমুঠা ধান তোমাদের দিয়াছে কি? কেন দিবে? ও-ধান কি তোমাদের খাওয়াইবার জন্য রাখিয়াছে জমিদার? ধাপ্পা দিয়া বোকা বুঝাইয়াছে তোমাদের, তোমরা ভালমানুষ, যাহা বুঝাইয়াছে তাহাই বুঝিয়াছ; ও-ধানের একটি কণাও তোমাদের জন্য নয়, ধান সরকারের; সরকারের সঙ্গে হয়তো দেনা-পাওনা চুকিয়া গিয়াছে এতদিন। তোমরা, তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা শুকাইয়া মরিয়া গেলেও ওর একটি দানাও তোমাদের ভাগ্যে জুটিবে না।

একটা ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন ঘন কালো অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল।

পরদিন রাত্রি দুইটার সময়ে প্রায় শ-দুই লোক গোলা-বাড়ির সামনে জড়ো হইল, হাতে কুড়াল দা শাবল ও লাঠি। শ্মশানে মড়া খাইবার জন্য ক্ষুধার্ত নেকেড়ের দল যেমন করিয়া আসে, তেমনই নিঃশব্দে। অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের চোখ ও দাঁতগুলা শান-দেওয়া ছুরির ফলার মত চকচক করিতে লাগিল।

মাহিন্দী ও গোকুল দুইজনেই পাহারা দিতেছিল সেদিন। মাহিন্দী ভারী গলায় হাঁক দিল, কে? কে হা? কোনও জবাব নাই। আবার হাঁকিল, কে হা, তোমরা এখানে কি করছ?

বিরাট সরীসৃপের মত জনতা ধীর নিশ্চিন্ত পদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাঘের মত লাফাইয়া আসিয়া ডান হাতে লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়া মাহিন্দী হাঁকিল, কি মতলব বল দেখি তোমাদের? বারণ করছি, শুনছ নাই কেনে?

একজন দীর্ঘাকৃতি লোক, মাথাটা ঢাকিয়া ও মুখটা বেড়িয়া পাগড়ি, আগাইয়া আসিয়া কহিল, স'রে যাও বাগদীর পো, লুঠ করতে এসেছি আমরা।

ক্ষিপ্ত শৃগালের মত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া মাহিন্দী কহিল, মগের মুলুক পেয়েছ নাকি, না, মামাবাড়ি? মাহিন্দী বাগদীকে আগে ঘায়েল ক'রে তবে এগোবে বলছি।—বলিয়া সামনের লোকটার উদ্দেশে লাঠি চালাইল।

লোকটা লাফাইয়া সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই পাশ হইতে একটা

লোক লাঠি মারিল মাহিন্দীর মাথায় ; মাথাটা কাটিয়া গিয়া গাল ও ঘাড় বাহিয়া রক্তধারা ছুটিল, এক হাতে রক্ত মুছিয়া মাহিন্দী হাঁকিল, গোকুল ! লুঠ করতে এসেছে রে, রামসুন্দর সিংকে খবর দিগে যা।

গোকুল এতক্ষণ কিছু দূরে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া ছিল, শুনিয়াই ছুটিল খবর দিতে। একজন একটা হাত-লাঠি ছুঁড়িল তাহাকে তাক করিয়া। মুহূর্ত মধ্যে 'বাবা গো' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া গোকুল পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা লোক ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া, একটা গাছের নীচে ফেলিয়া রাখিল।

মাহিন্দী তখনও লাঠি চালাইতেছে, বিস্তর লাঠি পড়িতেছে তাহার গায়ে ; জমাট রবারের মত দৃঢ় নমনীয় মাংসপেশীতে প্রত্যেকটি আঘাত প্রতিহত হইতে লাগিল, শেষে একটা লোক শাবল দিয়া মাথার পিছনে আঘাত করিতেই তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করিয়া মাহিন্দী মাটিতে পড়িয়া গেল।

এদিকে গোলা-বাড়ির দেওয়ালে শাবলের পর শাবল চালাইয়া জনকয়েক লোক একটা বিরাট হাঁ-এর মত গর্ত করিয়া তুলিল।

ভিতরে প্রায় তিন শো হাত লম্বা ও পঞ্চাশ হাত চওড়া একটি পাকা দেওয়াল ও টিনের ছাদওয়ালা ঘর, টিনেরই একটা প্রকাণ্ড দরজা, তাহাতে একটা ভারী তালা ঝুলিতেছে। জন দুই বলিষ্ঠ লোক শাবলের চাড় দিয়া তালাটা ভাঙিতে লাগিল, প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক দরজা হইতে গর্ত পর্যন্ত সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল, দলপতি এবং আরও ত্রিশ জন লোক তালা ভাঙার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল বাকি লোকগুলা বাহিরে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল। তালা ভাঙা হইতেই একটা চাপা উল্লাসধ্বনি জনশ্রেণীর এ-প্রান্ত হইতে ও-

প্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া দেওয়ালের অপর পার্শ্বে জনতার মধ্যে সংক্রামিত হইল। মশালের রক্তাভ আলোকে ইহাদের ঘর্মাক্ত দেহগুলা পালিশ-করা কালো পাথরের মত চকচক করিতে লাগিল; আসন্নপ্রায় অভীষ্ট-সিদ্ধির উল্লাসে ইহাদের চোখগুলা জলজল করিতে লাগিল; বিচার-বিবেচনাহীন, লোভী, স্বার্থ-সর্বস্ব জমিদারের প্রতি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় ইহাদের মুখগুলা বীভৎস দেখাইতে লাগিল।

দরজা খোলা হইতে জন ত্রিশেক লোক ভিড় করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের বদ্ধ বাতাস যেন আগুনের হলকার মত গরম, সকলের দেহ হইতে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে শুরু করিল; একটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে দম আটকাইয়া আসিল সকলের; গ্রাহ্য না করিয়া জলন্ত মশাল হাতে তাহারা সমস্ত ঘরটা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে শুরু করিল।

কোথাও কিছু নাই। মেঝের উপর পুরু হইয়া ধূলা জমিয়াছে, তাহার উপর শত শত পায়ের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এখানে সেখানে ফুটা বস্তা হইতে ঝরিয়া-পড়া ধান জমিয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে বিস্তর ইঁদুরের গর্ত; কতকগুলা ইঁদুর বোধ হয় ধান্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল, আলো দেখিয়া ছুটিয়া গর্তে ঢুকিল; গুটি কয়েক চামচিকা বার কয়েক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নিজ নিজ স্থানে ঝুলিতে শুরু করিল।

নিদারুণ নৈরাশ্যের সুরে সকলে বলিয়া উঠিল, সব সরিয়ে দিয়েছে রে! উচ্ছ্বসিত ক্রোধে কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া দড়ির মত হইয়া উঠিল সবারই, গায়ের মাংসপেশীগুলা হইয়া উঠিল ইস্পাতের মত শক্ত, দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কহিল, বেটা শয়তান! দৃঢ়মুষ্টিতে লাঠি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, পেতাম সামনে, মাথাটা গুঁড়ো ক'রে দিতাম বেটার।

অভিশাপ দিল, আমাদের বেটা-বেটীর ভাত কেড়ে নিয়ে গেছিস, নির্বংশ হবি বেটা।

দলপতি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, কুছ পরোয়া নাই, ভাই সব। জমিদারের বাড়ি লুঠ করব।

জমিদারের বাড়ির সামনে আসিয়া জনতা উন্মত্ত কোলাহল করিয়া উঠিল। তারপর সামনের ছোট দেওয়াল ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। লছমন সিং দোতলার বারান্দা হইতে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। গ্রাহ্য না করিয়া সকলে বেপরোয়া দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতকগুলা লোক ইট-পাটকেল ছুঁড়িতে শুরু করিল; তাহাতে দুই-চারিটা সার্শির কাচ ভাঙিল, কতকটা কার্নিস খসিয়া পড়িল, দোতলার বারান্দায় একটা ছবির কাচ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। লছমন সিং দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাড়াইয়া গুলি ছুঁড়িল; পায়ে লাগিয়া বসিয়া পড়িল একজন; আর একবার, এবার বাহুতে লাগিল স্বয়ং দলপতির। চীৎকার করিয়া উঠিল সে, বন্দুক চালাতে শুরু করেছে, পালাও ভাই সব।

সেই রাত্রে তিন-চার বাড়িতে ডাকাতি হইল। হলধরের বাড়িতে; তাহার বুড়ী মাকে মারিয়া ধরিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুঠ করিল এবং যাইবার সময়ে বাঁধিয়া তুলিয়া লইয়া গেল তাহার বিধবা বউদিদিকে। আর ডাকাতি হইল পরাণ রায়ের বাড়িতে; পরাণ জাতিতে তেলী, গৃহে প্রাচুর্য নাই, তবে ধারও তাহাকে করিতে হয় না; নিরীহ, নির্বিরোধী লোক, তাহার ধান-চাল, বাসন-কোসন, দুই-চারিখানা সোনা-রূপার গহনা, কাপড়-চোপড়, সব কাড়িয়া লইয়া সত্যসত্যই তাহাকে সপরিবারে পথে বসাইয়া দিয়া গেল। আর ডাকাতি হইল হারাণ চক্রবর্তীর বাড়িতে; হারাণ সম্পন্ন গৃহস্থ, ধান-চালের কারবার করিয়া

এ বৎসর অনেক টাকা লাভ করিয়াছে। দূরে কোলাহল শুনিয়াই মূল্যবান জিনিসপত্র ও ক্যাশ-বাক্স সমেত সপরিবারে হারাণ কোঠার উপরে উঠিয়া পড়িল। উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির পরিবর্তে মইয়ের ব্যবস্থা ছিল; হারাণ উপরে উঠিয়া মইটাও তুলিয়া লইল। ডাকাতের দল উঠানে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিল, গালাগালি করিল, আগুন লাগাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল; কিন্তু টিনের ছাউনি বলিয়া হারাণ ভয় পাইল না। শেষে গোয়াল হইতে গরুগুলা খুলিয়া লইয়া তাহারা চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, কোরবানি করব তোর নামে, বেটা গোহত্যার পাতক হবি।

কোলাহল হইল প্রচুর—আর্তনাদের অন্ত রহিল না, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা, এমন কি যাহাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল তাহারাও, দরজা আঁটিয়া শুইয়া রহিল। কেহ বাহির হইয়া সাহায্য করিবার চেষ্টা করিল না বা দুই-তিন মাইল দূরবর্তী থানাতে খবর দিয়া পুলিসের সাহায্য আনিবার ব্যবস্থা করিল না।

মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের ইহাই রীতি। ইহারা প্রতিবেশীর হাঁড়ির খবর রাখে; কিন্তু হাঁড়িতে চাল না থাকিলে একমুষ্টি দিয়া সাহায্য করে না। সম্পদে ইহারা যেমন দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসে, বিপদে তেমনই দল বাঁধিয়া আত্মগোপন করে। বাড়িতে কেহ অসুখে পড়িলে, ইহারা ভিড় করিয়া আসিয়া চিকিৎসার ত্রুটি বাহির করে ও চিকিৎসকের সমালোচনা করে, কিন্তু রোগীর সেবা করিবার জন্য কেহ আগাইয়া আসে না। রোগী মরিলে ইহারা সোৎসাহে সৎকার করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধের বিরাট ফর্দ ফাঁদিয়া গৃহস্থকে সর্বস্বান্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। প্রতিবেশীর পুত্র ভাল চাকুরি পাইলে, ইহাদের চোখের ঘুম উবিয়া যায়, গোপনে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়া

চাকুরিটি ঘুচাইবার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীর পুকুরে মাছ হইলে ইহারা রাত্রে জেলে নামাইয়া ধরিয়া আনে, মাঠে ভাল ফসল হইলে গরু নামাইয়া দেয়, বাগানে তরি-তরকারি হইলে রাতারাতি সরাইয়া ফেলে। প্রতিবেশীর পুত্র বা কন্যার বড়লোকের বাড়িতে বিবাহের সম্ভাবনা হইলে ইহারা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করে; প্রতিবেশীর সুশীলা পুত্রবধূ থাকিলে, ইহারা শ্বশুর ও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাহার মনকে বিষাইয়া তুলে; কর্মিষ্ঠা বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূ থাকিলে তাহার নামে কলঙ্ক প্রচার করে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা অত্যাচারী শাসকের সহস্র উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে, তবু দলবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করে না। ইহারা কোনদিনও ভাবে না যে, ইহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সরকারের বা সমাজের কাহারও দৃষ্টি নাই। সরকার ইহাদের নিরীহ নিষ্ক্রিয় ও নির্বিরোধী প্রকৃতির কথা ভাল করিয়া জানে বলিয়া, ইহাদের বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা বোধ করে না। দেশের নেতারা ইহাদের ঘাড়ে চড়িয়া বড় হইলেও, সমগ্র দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে ইহাদের কথা চিন্তা করিবার সময় পান না। এমন কি ইহাদের পুত্র-কন্যারা, যাহারা উচ্চশিক্ষিত, দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি যাহাদের নখাগ্রে, সারা পৃথিবীর উৎপীড়িত মানববৃন্দের দুঃখে যাহারা বিগতনিদ্র, তাহারাও ইহাদের কল্যাণ কামনা করা দূরে থাক্, উল্টা বরং উচ্ছেদ কামনা করে।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই সকলে শয্যাত্যাগ করিয়াই, প্রাতঃকৃত্য না সারিয়া, উৎপীড়িত গৃহস্থদের সংবাদ লইতে আসিল। তাহারা যে সকলেই আসিবার জন্য ছটফট করিয়াছে, শুধু ঢিল-পাটকেলের ভয়ে আগাইয়া আসিতে পারে নাই—এই কথা পুনঃ পুনঃ জানাইল, এবং যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে সকলের ভাগ্যেই এই

বিপদ ঘটিবে, হয় কিছু আগে কিংবা পরে—এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গৃহস্থকে সান্ত্বনা দিল। হলধরের বাড়িতে গিয়া তাহারা তাহার বৃদ্ধা মাকে শান্ত করিল এবং তাঁহার পুত্রবধূর অন্তর্ধানের সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়ে ও কৌতুকে আকুল হইয়া উঠিল, এবং যখন শুনিল রায়পুকুরের ধারে মেয়েটি রক্তাক্ত-বসনে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে, তখন দল বাঁধিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটিল। কিন্তু হতভাগিনীর সেবা-শুশ্রূষা ও আশ্রয়ের কোন ব্যবস্থা করিল না। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক আসিয়া মেয়েটিকে সারাদিন ধরিয়া ঘেরিয়া বসিয়া থাকিয়া, সন্ধ্যার পর একে একে সরিয়া পড়িল। পরদিন দেখা গেল, মেয়েটির মৃতদেহ রায়পুকুরের জলে ভাসিতেছে।

স্থানীয় শাসকবর্গ চাঙ্গা হইয়া শাসনযন্ত্র চালনা করিবার জন্য উঠিয়া বসিল। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, প্রজারা ক্ষুধার জ্বালায় নগ্নদেহে ছুটাছুটি করিতেছে, কুকুর-বিড়ালের মত রাস্তায় ঘাটে মরিয়া থাকিতেছে, স্থানীয় শাসকের তাহাতে করিবার কিছু নাই। প্রজাশাসনের ভার তাহার হাতে, প্রজাপালনের দায়িত্ব তাহার নাই। কাজেই যতক্ষণ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে, সে দারুব্রহ্মের মত নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার বসিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি কেহ বা কাহারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চুরি-ডাকাতি করে, হল্লা-হাঙ্গামা করে, তখন আর তাহার চুপ করিয়া থাকা চলিবে না, দুর্বিনীত প্রজাকে শায়েস্তা করিবার জন্য অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

ফলে, দারোগা আসিল, দফাদার আসিল, কন্‌স্টেব্‌ল আসিল, ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আসিল, সারা গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মাহিন্দী ও গোকুলের এজাহার-মত রায়হাটি ও ইসলামপুরের জ

পঞ্চাশেক লোক ও সেদিনের নৈশ সভার বক্তা ছেলেটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া জেলা-শহরে লইয়া গেল।

হারাধন জেলা-শহরেই ছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে এখানে আসিতে হয় বলিয়া একটি বাড়ি এখানে ভাড়া লওয়াই আছে,—শহরের বাহিরে এক নিভৃত পল্লীতে নাতি-বৃহৎ একটি দোতলা বাড়ি। একজন পাচক ও একজন ভৃত্য বরাবর এখানে থাকে।

জমিদারি-ক্রয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে এখানে আসিয়াছে; সে একা নয়, ভগবতীবাবু ও তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রিয়তোষিণী দেবী তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন ও একই বাড়িতে বাস করিতেছেন। ভগবতীবাবুর প্রথম পক্ষের পত্নী হরমোহিনী দেবী পাকাপাকি বন্ধ্যা প্রমাণিতা হওয়ায় কাশীতে নির্বাসিতা হইয়াছেন; তবে সীতা দেবীর মত গহনবনে নির্বান্ধব ও নিঃসহায় অবস্থায় নহে, রীতিমত ভাড়া-করা বাড়িতে, দাসদাসী-সমভিব্যাহারে। স্বামীর কাছ হইতে প্রতি মাসে মোটা মাসহারা যায় তাঁহার নামে। ভগবতীবাবুর বয়স পঞ্চাশের বেশি নয়, কিন্তু দেহের বিপুলতার জন্য তাঁহাকে আরও অধিকবয়স্ক দেখায়। সম্প্রতি দেহে বাতের আক্রমণ হওয়ায়, একেবারে অনড় হইয়া উঠিয়াছেন। পত্নী প্রিয়তোষিণী—বয়স পঁচিশের বেশি নয়; লম্বা দোহারা গঠন, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, শিক্ষিতা। তাহার বাবা সওদাগরী আপিসের কেরানী, মেয়েটিকে কলেজে পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন এবং বোধ করি, অর্থের লোভে, প্রথম পক্ষ বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও পুত্রার্থী প্রৌঢ় ভগবতীর হাতে কন্যাটিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। প্রিয়তোষিণী অবশ্য ভগবতীকে নিরাশ করে নাই, একটি পুত্রের জননী হইয়াছে সে। অসুস্থ স্বামী, কোলে শিশুসন্তান, দাসদাসী, দূর ও নিকট সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়াবর্গ লইয়া স্বামীর বৃহৎ সংসার; তবু প্রিয়তোষিণী বেকার। স্বামীর সেবার ভার

দাসদাসীদের হাতে ; পুত্রের লালনপালনের ভার আত্মীয়াদের হাতে ; কাজেই দিনে ও রাত্রে স্নান, আহার, নিদ্রা ও প্রসাধন ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব সময় খরচ করিয়া যাহা হাতে থাকে, তাহা আধুনিক লেখকদের ভাল ভাল নভেল পড়িয়া, দোকানে দোকানে দামী গহনা ও কাপড় কিনিয়া, থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিয়া তাহাকে কাটাইতে হয়।

প্রিয়তোষিণীর পরামর্শে ভগবতীবাবু জমিদারি বিক্রয় করিতেছেন। পাড়াগাঁয়ে যখন কোনদিন যাওয়া চলিবে না, চিরদিন পরের উপর নির্ভর করিয়া জমিদারি চালাইতে হইবে, তখন সে জমিদারি না রাখাই ভাল। তাহার চেয়ে, জমিদারি বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ ব্যবসায়ে খাটাইলে বিস্তর পয়সা ঘরে আসিবে। ব্যবসা দেখাশুনা করিবার লোকেরও অভাব নাই। তাহার বাবা সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরি করিতে করিতে এসব বিষয়ে ঘুণ হইয়া উঠিয়াছেন ; তিনিই সব ভার লইবেন। তাহা ছাড়া, সে নিজেও তাঁহাকে সাহায্য করিবে।

হারাধনের সহিত পরিচিত হইবার পর প্রিয়তোষিণীর প্ল্যান কিঞ্চিৎ বদলাইয়াছে। ব্যবসা যদি করিতেই হয়, হারাধনের মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর সাহায্য লওয়াই ভাল। হারাধনকে ভালও লাগিয়াছে তাহার। হারাধনের বয়স চল্লিশের কম, চেহারা ভাল, লম্বা-চওড়া দেহ ; ফরসা রঙ ; সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ভুঁড়ির সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাহার দেহকে সৌষ্ঠবহীন করে নাই, বরং বড়লোকিয়ানা মর্যাদা দান করিয়াছে। সে যখন দামী স্যুট পরিয়া, চুলে ব্যাক-ব্রাশ করিয়া, সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হয়, তখন তাহার লীলাসঙ্গিনী—হালি ফিক্সস্টারটি পর্যন্ত তাহার চেহারার তারিফ করে। তবে শুধু চেহারা নহে, হারাধনের ক্লান্তিহীন কর্মিষ্ঠতা, প্রখর ও প্রচুর ব্যবসায়-বুদ্ধি

প্রিয়তোষিণীর চিত্তকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। বলা বাহুল্য, হারাধন প্রিয়তোষিণীর দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়াছে; সে তাহার লোভের অনলে ইন্ধন সংযোগ করে; শুধু সাহায্য নয়, সে ভগবতীবাবুকে তাহার এক ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়া লইবে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বিচিত্র ছবি আঁকিয়া সে প্রিয়তোষিণীর চোখের সামনে ধরে, তাহাতে রঙের উপর রঙ ফলায়; প্রিয়তোষিণী মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া অন্তরে অন্তরে বিগলিত হইয়া উঠে।

এখানে প্রায়ই পরামর্শ হয় তাহাদের, কখনও ভগবতীবাবুর চোখের সামনে, কখনও বা অন্তরালে। অন্তরালে পরামর্শটাই জমে বেশি, একটা টেবিলের দুই পাশে দুই জনে মুখামুখী চেয়ারে বসে। কাগজ-কলম লইয়া, অঙ্ক কষিয়া, জমা-খরচ খতাইয়া, লাভের মোটা অঙ্ক ছাঁকিয়া তুলে হারাধন। উত্তেজনায় প্রিয়তোষিণী কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, হাতে হাত ঠেকে, মুখের কাছে মুখ ঘনাইয়া আসে; হারাধনের বুকের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলিয়া উঠে। কখনও মিষ্টি করিয়া হাসে প্রিয়তোষিণী, মিষ্টি করিয়া তাকায়; হারাধনের বুকের ভিতরটা রসিয়া উঠে।

এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রিয়তোষিণীকে সঙ্গে লইয়া হারাধন মোটরে বেড়াইতে বাহির হয়। ভগবতী আপত্তি করেন না; হারাধনকে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার উপায় নাই। তাহা ছাড়া পুত্র-প্রসবের পর হইতে প্রিয়তোষিণীর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছে না, এই সুযোগে মফস্বলের খাঁটি জল-হাওয়ায় যদি তাহার শরীরটা কিছু সুস্থ হইয়া উঠে তো ডাক্তার ও ঔষধের হাঙ্গামাটার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। শহর হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া তাহাদের মোটর কত গ্রাম, মাঠ ও বন পার হইয়া বহুদূর চলিয়া যায়। একটি ছোট নদীর ধারে গিয়া থামে।

নদীর বালির উপর পাশাপাশি তাহারা বসে। প্রিয়তোষিণী হয়তো এক-আধ লাইন কবিতা আওড়ায়। হারাধন পীড়াপীড়ি করিলে এক-আধটা গানও গায়; এমনই করিয়া তাহাদের পরিচয় ঘন ও ঘনতর হয়,—মিসেস মুখার্জি ক্রমান্বয়ে 'প্রিয়তোষিণী' ও 'প্রিয়' হইয়া উঠে।

মোট কথা, এ কয়দিন হারাধনের বড় আনন্দে কাটিয়াছে। জমিদারিটা হাতে আসিয়াছে, টাকা যাহা দিতে হইয়াছে তাহাও প্রায় হাতেই ফিরিয়া আসিতেছে, এবং ফাউ-স্বরূপ জমিদারের রূপসী গৃহিণীর, আন্তরিক প্রেম না হোক, প্রীতিলাভ ঘটিয়াছে। কাজেই, কাজ শেষ হইয়া গেলেও এখান হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না; সুখস্বপ্নের মত, এই মধুর দিনগুলিকে দীর্ঘায়িত করিতেছিল।

রামসুন্দর ভগ্নদূতের মত দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর লইয়া আসিল। হারাধন অবিলম্বে বড় হাকিমের সঙ্গে দেখা করিল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, আপনার সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে মশায়। হারাধন বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। হাকিম কহিলেন, বুঝতে পারছেন না? রায়বাহাদুরি এবার আপনার নির্ঘাত। পঞ্চাশ হাজার টাকার ডিফেন্স বণ্ড কিনেছেন আপনি, সিভিক-গার্ডদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন; কিন্তু সে তো সরকারের সেবা। জনসেবার জন্যে কি কি করেছেন? এখন তারই সুযোগ এসেছে। চোখ মটকাইয়া কহিলেন, এমন ব্যবস্থা ক'রে দোব যে, প্রজা পালন ও দলন, দুই একসঙ্গে হবে। যাদের একটুখানি রস এখনও আছে আর তার জন্যেই তিড়বিড় করছে, তারা শুকিয়ে টিট হয়ে আসবে; যারা একেবারে শুকনো আর সব কাজের বাইরে, তারা ম'রে যাবে; আর সবারই

আপনার জয়গান করতে করতে মুখে খড়ি ফুটতে থাকবে। আর সেই গানের রেশ যখন লাট সাহেবের কানে পৌছবে, তখন রায়বাহাদুর তো ছাই, সি. আই. ই. হয়ে যেতে পারেন আপনি।

মকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল। প্রজারা পুত্রস্থানীয়, তাহাদের সহিত কলহ করিবার ইচ্ছা হারাধনের নাই। তাহারা কখনও এমন কাজ করে নাই; এখনও করিত না, শুধু বাহিরের লোকের প্ররোচনায় করিয়াছে। আসামীরা খালাস পাইয়া হারাধনের অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাহাদের জানাইয়া দেওয়া হইল, চাল-চালানের ব্যাপারটা হারাধনের অজ্ঞাতে হলধর নিজের বুদ্ধিতে করিয়াছে। তাহাতে বিরক্ত হইয়া হারাধন তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। ইহার পর একজন নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন, তিনি প্রজাদের 'ভাত'-এর ব্যবস্থা করিবেন। অভাজন পরাণ রায় ও হারাণ চক্রবর্তী বাধ্য হইয়া হারাধনের মত মহাজন ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। শুধু প্ররোচক ছেলেটি মুক্তি পাইল না, রীতিমত বিচার হইয়া তাহার দুই বৎসরের জন্য জেল হইল।

দরিদ্র প্রজাদের জন্য অন্নসত্র খোলার ব্যবস্থা হইল। হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা-পিছু চাল-ডালে এক পোয়া বরাদ্দ অর্থাৎ অর্ধাশনটা যেন কোনমতে সম্পন্ন হয়। যাহারা কার্যক্ষম তাহারা সম্প্রতি হারাধনের চাষে কাজ করিবে, আর যাহারা দুর্বল ও অক্ষম তাহারা এমনই খাইতে পাইবে। ইসলামপুরের মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল; তাহাদের মসজিদ সংস্কার করা হইবে ও তাহাদের মোল্লা সাহেবদের বিনামূল্যে চাল দেওয়া হইবে। অন্নসত্রের জন্য হারাধনকে

বাড়ি হইতে টাকা বাহির করিতে হইবে না, চাউল বিক্রয়ের টাকা হইতেই খরচ চলিয়া যাইবে। নিজের কলিয়ারির কুলীদের জন্য সে কিছুদিন আগে মিলিটারী বিভাগের জনৈক কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়া প্রায় দশ হাজার মণ ছাতা-ধরা চাল সস্তা দরে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা হইতে হাজার দুই মণ এখানে পাঠাইয়া দিবে এবং হাজার দুই মণ বিউলির ডাল হাকিম সাহেব স্থানীয় কোন ব্যবসাদারের কাছ হইতে সুবিধামত দরে সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

অন্নসত্র উদ্বোধনের দিন। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্বোধন করিবেন। সঙ্গে আসিবেন বড় হাকিম। হারাধন নিজের গাড়িতে তাঁহাদের লইয়া আসিবে। নূতন ম্যানেজারবাবুটি কর্মকুশল ব্যক্তি; হলধরের মত গোলগাল চেহারা নহে,—লম্বা, কাহিল, তামাটে রঙ; খাকী হাফপ্যাণ্ট, টুইলের হাফ-হাতা শার্ট, পায়ে খয়ের রঙের ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া একটা ভাঙা সাইকেলে চড়িয়া সারাদিন সারা জমিদারিটা টহল দিয়া ফিরে। আয়োজনও করিয়াছে নিখুঁত। গোলা-বাড়ির সামনে প্রায় বিঘাখানেক জায়গা চাঁচিয়া-ছুলিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। এক দিকে চাঁদোয়া টাঙাইয়া সভামণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে, সেখানে খানকয়েক চেয়ার ও বেঞ্চি বিধিমত সাজানো হইয়াছে; অন্য দিকে একপাশে টিনের চালা তুলিয়া রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং চারিজন নবনিযুক্ত পাচক সকাল হইতেই রান্না শুরু করিয়া দিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঢোল-শোহরতের ব্যবস্থা হইয়াছে, হাকিমদের পূজার জন্য প্রচুর উপকরণ জেলা-শহর হইতে আনা হইয়াছে এবং ভোগরন্ধন ও নিবেদনের জন্য দুইজন রন্ধনকুশল কুলীন বাবুর্চি সংগ্রহ করা হইয়াছে;

এবং পরদিন গদারডিহির জঙ্গলে হাকিম বাহাদুরদের শিকারের জন্ত সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

সকাল আটটা হইতে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সমাগম শুরু হইয়াছে—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, অক্ষম সক্ষম সকলেই। সকলেরই দেহ শীর্ণ, বুকের হাড়গুলা এক-একটা করিয়া গোনা যায় ; গায়ে যে কতদিন তেল পড়ে নাই কে জানে, খড়ি উড়িতেছে ; চুলগুলা রুক্ষ বিশৃঙ্খল—মেয়েদের চুলে জট পড়িয়াছে ; কেহ কোনমতে একটা ঝুঁড়ি বাঁধিয়াছে, কাহারও খোলা ; চোয়ালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে সবারই ; গাল বসা, কোটরে-ঢোকা চোখে ক্ষুধার্ত সর্পের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যাহারা ছয় মাস আগে যৌবনের দর্পে বুক চিতাইয়া চলিত, তাহারা লাঠি ধরিয়াছে ; বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের চলিবার ক্ষমতা নাই, নাতি-নাতিনীদের কাঁধ ধরিয়া কোনমতে জড়প্রায় দেহগুলা টানিয়া টানিয়া আনিতেছে। কাহারও দেহে পুরাপুরি কাপড় নাই, কেহ গামছা পরিয়াছে, কেহ একখণ্ড মলিনবস্ত্র কৌপিনের মত করিয়া পরিয়াছে, শতছিন্ন বস্ত্রে মেয়েদের লজ্জা ঢাকিতেছে না। ছোট ছেলেমেয়েগুলার দিকে তাকানো যায় না, যেন কতকগুলা কঙ্কালের সমষ্টি, চামড়া দিয়া কোনমতে ঢাকা হাত-পাগুলা কাঠির মত সরু, পেট ঢুকিয়া গিয়া পিঠে ঠেকিয়াছে ; মুখগুলা ইঁদুরের মুখের মত ছুঁচালো, চোখে হাড়কাঠে-গলানো ছাগশিশুর মত অবোধ অসহায় আর্ত দৃষ্টি ; ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষুধার্ত পক্ষীশাবকের মত চিঁ-চিঁ করিয়া কাঁদিতেছে, মাঝে মাঝে মায়েদের শুষ্ক-শীর্ণ স্তনে মুখ দিয়া রসাহরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে।

বেলা তিনটার সময়েই সমস্ত স্থানটা জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল,

কোলাহলে কানে তালা লাগিতে লাগিল। রামসুন্দর সিং, লছমন সিং, আরও দুইজন নবনিযুক্ত পশ্চিমা দরোয়ান, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাহিন্দী ও তাহার পুত্র গোকুল সকলকে সারিবদ্ধভাবে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসিয়াছে—ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নয়ন ঘোষাল, হেডমাস্টার, সেই ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটি, পোস্টমাস্টার এবং আরও জনকয়েক। পাশাপাশি গ্রাম হইতে আসিয়াছে—থানার দারোগা, সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার, জনকয়েক মহাজন ও ব্যবসায়ী, ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বরগণ ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাক্তারবাবু ও দারোগাবাবুর চেহারা বেশ নধর, হাসি-খুশি ভাব, দেখিয়া মনে হইল—দুর্ভিক্ষের অগ্নিশিখা তাহাদের স্পর্শ করে নাই। মহাজন ও ব্যবসাদারগুলির দেহে গত কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর মেদ জমিয়া উঠিয়াছে, ভুঁড়িতে ও চিবুকে থাকের পর থাক পড়িয়াছে। চিত্র-প্রদর্শনীতে নিজের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের মত তাহাদের মুখ ও চোখ হইতে আনন্দ যেন উপচিয়া পড়িতেছে; পোশাক-পরিচ্ছদও তাহাদের নূতন, দামী ও চাকচিক্যময়। মধ্যবিত্তদের সকলেরই জামা-কাপড় ঘরে সাবান বা সাজিমাটি দিয়া সদ্যপরিষ্কৃত এবং জীর্ণপ্রায়, কেহ কেহ অনেকেরই মলিন ও শীর্ণ; সকলে মুখে হাসিতেছে বটে, কিন্তু চোখ দেখিলে মনে হয়—ভিতরে ভিতরে অভাবের অগ্নিময় স্পর্শে পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে সবাই, অথচ নিবৃত্তির কোন দিকে কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ভয়ে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া পরিবর্তন ঘটিয়াছে ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটির, যেন সদ্য একটা গুরুতর রোগ হইতে উঠিয়াছে লোকটা, দেহে মাংস নাই, গলার হাড়গুলা বাহির হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা সরু হইয়া গিয়াছে, গোঁফ ছাঁটিয়া

ফেলিয়াছে, চোখে জ্বালাময় দৃষ্টি, পরিধানে আট-হাতি জিলজিলে কাপড়, তালি-দেওয়া কামিজ, হাতে বা গলায় বোতামের বালাই নাই।

ম্যানেজারবাবুকে তোষামোদী করিতেছে সবাই। দুই-দুইটা জমিদারির ম্যানেজার, হলধরের মত অশিক্ষিত নয়, ম্যাট্রিকুলেশন পাস; হাকিমদের জানিত্, বিশেষ করিয়া বড় হাকিমের অনুগৃহীত ব্যক্তি, তাহা ছাড়া কাপড় পরে না মোটেই, দিবারাত্র সাহেব সাজিয়াই আছে; কথাবার্তাতেও ইংরেজীর ছিটা খুব বেশি, বুঝিতে অসুবিধা হয় অনেকের।

ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নয়ন ঘোষালের অবস্থা ভালই, নিজের সম্পত্তিও আছে, পাঁচ রকমে উপার্জনও আছে। কাজেই দেহে এবং পোশাকে-পরিচ্ছদে খুব বেশি পরিবর্তন হয় নাই। ঘোষাল মোলায়েম হাসিয়া ম্যানেজারবাবুকে কহিল, গরিবদের তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, আমাদের ভদ্রলোকদের জন্তে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে বলুন। ম্যানেজারবাবু ভ্রূ-কুঞ্চনের সহিত মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিল, দেখুন, গভর্মেণ্ট মিড্‌ল-ক্লাসের জন্তে তো কোন অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেন নি, আমরা কি করব বলুন? আমরা তো গভর্মেণ্টের আন্‌ডিজায়ারেব্‌ল কোন কাজ করতে পারি না! ঘোষাল মিনতির সুরে কহিল, তা হ'লে কি এরা সব ম'রে যাবে বাবু? ম্যানেজার কহিল, তা আমরা কি করব বলুন?—বলিয়া ঘাড়টি কাত করিয়া চোখের দৃষ্টি ঘোষালের মুখের দিকে স্থির করিয়া দিল। হেডমাস্টার কাছে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। ম্যানেজার ঘাড় সোজা করিয়া কহিল, তা আপনাদের সব প্রপার্টি রয়েছে, বিক্রি ক'রে চালান; যাদের কোথাও কিছু নেই, তাঁদের তো আগে দেখতে হবে। বাঁকড়া

গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটা চোখ দুইটা ভাঁটার মত করিয়া গলার মাংসপেশী ফুলাইয়া বার কয়েক কি বলিবার চেষ্টা করিয়াই থামিয়া গেল।

বেলা পাঁচটার সময়ে হাকিমদের লইয়া হারাধন মোটরে আসিয়া হাজির হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেদবহুল দেহ, মাঝারি গঠন, চকচকে চেহারা, ঝকঝকে দামী নিখুঁত সাহেবী পোশাক, মেয়েদের মত শ্মশ্রুবিরল মুখ, টেবো গাল, চোখে সদ্যনিদ্রোত্থিত পুসি বিড়ালের মত নিদ্রালু নির্লিপ্ত দৃষ্টি। প্রায় বিশ মাইল রাস্তা দামী মোটরকারে চড়িয়া আসিয়া ক্লান্তিতে এলাইয়া গিয়াছেন, এমনই ভাবে চেয়ারে গিয়া বসিলেন। বড় হাকিম—লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় পাতলা চুলে মেয়েদের সিঁথির মত তেড়ি, পরিধানে ধোপদস্ত সাহেবী পোশাক, মুখের গোঁফদাড়ি নির্মূল করিয়া চাঁচা। ইঁহার পাতলা ঠোঁট, সূক্ষ্মাগ্র নাকের ডগা, কেশবিরল ভুরু, পিঙ্গল চোখের তারা, বিশেষ করিয়া ইঁহার মুখের ও চোখের গঠন ও ভাব দেখিলে ইঁহার ক্রূর, অহঙ্কারী, আত্মপরায়ণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না। ইনিও পা দুইটি ফাঁক করিয়া, পাতলুনের দুই পকেটে দুই হাত চালাইয়া দিয়া, গম্ভীর মুখে জনারণ্যের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলাইয়া গটগট করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে গিয়া বসিলেন। হারাধনের পরিধানে শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি, আদ্দির গিলা-করা পাঞ্জাবি, পায়ে দামী পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু; নিপীড়িত মানবের দুঃখে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে—এমনই মুখ-চোখের ভাব; ধীরপদে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর এক পাশে বসিল।

সারির পর সারি বাঁধিয়া দরিদ্রের দল বসিয়া গিয়াছে; প্রত্যেকের সামনে একটা করিয়া শালপাতার ঠোঙা; আজ সকলকে এখানে

বসিয়া খাইয়া যাইতে হইবে। পরের দিন, যাহার ইচ্ছা হইবে, বাড়িতে লইয়া গিয়া খাইবে।

ম্যানেজার একটা রূপার থালায় কতকটা খিচুড়ি ও একটি রূপার চামচ আনিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আসিল। সাহেব উঠিয়া আসিয়া মহিমময় মৃদু হাসিতে মুখমণ্ডল মণ্ডিত করিয়া এক চামচ খিচুড়ি লইয়া একজনের পাতে ঢালিয়া দিলেন। একজন ফোটোগ্রাফার অদূরে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিয়া লইল।

ম্যানেজারবাবু বাম হাত তুলিয়া পর পর হাঁকিতে লাগিল—জয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জয়, জয় এস. ডি. ও সাহেবের জয়, জয় জমিদারবাবুর জয়! জনকয়েক লোক তাহার দেখাদেখি হাঁক দিতে লাগিল।

পরিবেশন শুরু হইয়া গেল। হারাধন হাকিমদের লইয়া গাড়ির দিকে চলিল। হারাধনের বাড়িতে গিয়া তাঁহারা পান ভোজন ও বিশ্রাম করিবেন। ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ঘোষাল, হেডমাস্টার, ঝাঁকড়া ভুরু ও গোঁফওয়ালা লোকটা এবং আরও জনকয়েক লোক ইঁহাদের সঙ্গ লইল। বড় হাকিম ঘোষালকে কহিলেন, কি ঘোষাল মশায়, কি খবর আপনার? ঘোষাল দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর, আমাদের একটা নিবেদন আছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কাছে। সকলে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ঘোষালের দিকে একবার তাকাইয়াই, বড় হাকিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া ইংরেজীতে প্রশ্ন করিলেন, কে লোকটা? বড় হাকিম ইংরেজীতে ঘোষালের পরিচয় দিলেন। বড় হাকিম নীরসকণ্ঠে ঘোষালকে কহিলেন, কি, বলুন না? সে বলিল, হুজুর, আমাদের ভদ্রলোকদের কি ব্যবস্থা করলেন? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জবাব না দিয়া

মুখ ফিরাইলেন। জবাব দিলেন বড় হাকিম ; ভারী গলায় কহিলেন, আপনাদের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে পারব না আমরা, আপনারা চাল কিনে খাবেন। হেডমাস্টার আগাইয়া আসিয়া উত্তেজনায় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, চাল কই দেশে? থাকলেও কেনবার পয়সা কার আছে? মুচকি হাসিয়া হাকিম কহিল, কার কি আছে তা তো আমাদের জানবার কথা নয়। আপনাদের কোন ব্যবস্থা করবার জন্যে কোন নির্দেশ আমরা সরকারের কাছ থেকে পাই নি। হেডমাস্টার কহিলেন, কিন্তু হারাধনবাবু তো আমাদের চাল দেবেন বলেছিলেন, আর তার জন্যেই আমরা চাল কেনবার সময়ে কোনও বাধা দিই নি। হারাধন কহিল, আমার ম্যানেজার আপনাদের কি বলেছেন, তার জন্যে আমি দায়ী নয়। হেডমাস্টার কহিলেন, কিন্তু আপনি নিজেও তো কথা দিয়েছিলেন। হারাধন ভুরু কুঁচকাইয়া কহিল, কই, আমার তো স্মরণ হচ্ছে না! হঠাৎ পোজ বদলাইয়া কোলাহলসহকারে ভোজনরত দরিদ্রের দিকে হাত বাড়াইয়া চোখে ও মুখে করুণার আভা ফুটাইয়া ভর্ৎসনার সুরে কহিল, মাস্টার মশায়, এদের দিকে তাকিয়েও আপনাদের নিজের কথা মনে হচ্ছে? আপনারা কি? ভাবোচ্ছ্বাসে গলা বন্ধ হইয়া আসিল হারাধনের, চোখে জল আসিল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিল হারাধন।

ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটা এতক্ষণ ড্যাবড্যাব করিয়া তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িল, ভা-ভা-ভারি মি-মি—। ঘোষাল থামাইতে গেল তাহাকে, দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, মি-মি-মিথ্যাবাদী চা-চা-চামার, ক-ক—

জনকয়েক লোক তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘামিতেছিলেন, পকেট হইতে রুমাল বাহির

করিয়া মুখের ঘাম, বোধ হয় ঠোঁটের এক টুকরা মৃদু হাসিও, মুছিয়া ফেলিলেন। বড় হাকিম রুষ্ট মুখে ঘোষালকে কহিলেন, কে লোকটা? ঘোষাল সবিনয়ে কহিল, হুজুর, ওর মাথার ঠিক নেই, যা-তা বলে সবাইকে। প্রশ্ন হইল, পাগল নাকি? ঘোষাল জবাব দিল, আজ্ঞে পাগল নয়, লোক ভালই। দিন কয়েক আগে ওর একটি সোমত্ত মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে, একখানা শাড়ি চেয়েছিল বাপের কাছে, পয়সার অভাবে কিনে দিতে পারে নি, তারই অভিমানে। তারপর থেকে ওর মাথাটার বেশ ঠিক নেই। হাকিম কহিলেন, মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল? ঘোষাল জবাব দিল, আজ্ঞে না হুজুর, খেতে পরতেই দিতে পারে না, তার ওপর বিয়ে!—বলিয়া ম্লান হাসিল। হাকিমও মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে তো ভালই হয়েছে ওর, একটা হাঙ্গামা চুকে গেছে। তা ছাড়া, আজকালকার বাজারে একটা খাবার লোক ক'মে গেছে, সেটাই কি কম লাভ? বলিয়া নিজের রসিকতায় হাসিয়া উঠিলেন। ঘোষাল ও অন্য লোকেরা হুজুরের হাসিতে যোগ দিল, হেডমাস্টার গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

* * *

বড় হাকিমের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামে গ্রামে কলেরা ও উদরাময় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, শিশু ও বৃদ্ধেরা, অক্ষম ও দুর্বলেরা দলে দলে মরিতে লাগিল; যাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহারা শবদেহের সৎকার করিল; যাহারা পারিল না, তাহারা প্রিয় আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ মাঠে, ঘাটে, শুভঙ্করীর দাঁড়ার গর্তে ফেলিয়া দিয়া আসিল। অবিরত নরমাংস খাইয়া খাইয়া শৃগাল-কুকুরেরা হৃষ্ট হইয়া উঠিল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের জীবন-প্রদীপ দিন দিন তিল তিল করিয়া

তৈলহীন হইয়া আসিতে লাগিল। ভবিষ্যতে কোনদিন যে তাহারা আবার তাজা হইয়া সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহার সম্ভাবনা সুদূরবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারা, যাহারা মরিতে লাগিল তাহারাও হারাধনের জয়-জয়কার করিতে লাগিল।

* * *

এক মাস পরে একটি দিন, হারাধনের বিশেষ স্মরণীয় দিন। সকাল হইতে সুখবরের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। ম্যানেজারের চিঠি আসিয়াছে, লিখিয়াছে—কলেরার আক্রমণ যেরূপ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অন্নসত্র বেশিদিন চালাইতে হইবে না, হইলেও খরচ এস্টিমেটের অনেক কম হইবে। তাহা ছাড়া, অনেক পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা খাস করিয়া লওয়া চলিবে। বড় হাকিম লিখিয়াছেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগামী রায়বাহাদুরির জন্ত হারাধনের নাম লাটসাহেবের কাছে সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং যেরূপ জোর দিয়া সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে আগামী নববর্ষ-দিবসের খেতাববর্ষণে হারাধনের রায়বাহাদুরি-প্রাপ্তি একেবারে নিশ্চিত। ইহা ছাড়া, সেদিনের দেশী বাংলা ও ইংরেজী খবরের কাগজে হারাধনের কীর্তিকাহিনী বাহির হইয়াছে; সঙ্গে অন্নসত্রে ভোজনরত দরিদ্রবৃন্দের এবং তাহাদের পুরোভাগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, হারাধন ও বড় হাকিমের ছবি, ছবিতে কালো ঢেরাচিহ্ন দিয়া দানবীর হারাধনকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বসিবার ঘরে খবরের কাগজখানার উপর চোখ রাখিয়া হারাধন ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া রহিল, ছবিটা দেখিয়া দেখিয়া যেন তাহার আর

সাধ মিটিতেছে না। পাড়ার লোকেরা আসিতে শুরু করিল, একের পর এক, বিরাম নাই, সকলের মুখেই এক কথা—ধন্য হারাধন! বেঁচে থাক হারাধন। দরাজ হাতটা উবুড় করিয়াছ তো আর চিন্তা করিও না; আর হাতটা কষ্ট করিয়া অতদূরে লইয়া না গিয়া আশেপাশে পাড়ার লোকের উপরেই স্থির করিয়া রাখ। একটি বিনয়বিগলিত মধুর হাস্য হারাধন মুখের উপরে একেবারে আঁটিয়া রাখিয়াছে, কহিতেছে, কিছুই করিতে পারে নাই সে. অর্থাৎ যাহা করিয়াছে তাহা তাহার ইচ্ছার প্রাবল্যের অনুপাতে অতি তুচ্ছ। ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আসিতেছে, একে একে স্পষ্ট স্বীকার করিতেছে, হারাধনকে তাহারা চিনিতে পারে নাই; তুচ্ছ দৈনন্দিন ব্যাপারে মানুষের পরিচয় পাওয়াও যায় না, বিশিষ্ট বৃহৎ ব্যাপারেই মানুষের আসল পরিচয়; কেহ কেহ [illegible] দিতেছে, সুরাহা হইলে হারাধনকেই তাহারা ওয়ার্ডের কমিশনার করিবে। একজন সুরাহার খবরও দিয়া গেল, ওয়ার্ডের কমিশনার জগৎবাবুর কার্বাঙ্কল, ডায়াবিটিসের রোগী জগৎবাবু এ যাত্রা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। খবর শুনিয়া হারাধনের বুকের ভিতরটা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, সত্যি নাকি? ভারি মুশকিল তো!

আপিসে কর্মচারীরা একে একে হারাধনের কামরায় আসিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ যেন হারাধনের মাত্রাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, এমনই হাবভাব তাহাদের; যেন খবরের কাগজে তাহাদেরই কীর্তি-কাহিনী ও ছবি বাহির হইয়াছে, হারাধনের নয়। কে যে বেশি আনন্দ দেখাইবে, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। সেদিন কাজকর্ম কেহ কিছু করিল না; কর্মচারীবৃন্দের সমবেত আনন্দপ্রকাশটিকে কি করিয়া

হারাধনের চোখের সামনে ধরা হইবে, ইহার জন্য জল্পনা শুরু হইল। শেষে স্থির হইল, সংবর্ধনা-সভা ডাকা হইবে, সেখানে হারাধনকে মাল্যচন্দনের দ্বারা ভূষিত করা হইবে, কবিতায় 'হারাধন-প্রশস্তি' পাঠ করা হইবে এবং হারাধনকে উপহার দেওয়া হইবে। কবিতার জন্য চিন্তা নাই, একটি সদ্য-কলেজ-হইতে-পাস-করা ছোকরা কবিতা লেখার ভার লইল, কিন্তু কি উপহার দেওয়া হইবে এই লইয়া তর্ক বাধিল। কলেজী ছোকরাটি কহিল, ফাউণ্টেনপেন। বড়বাবু ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না, অনেক দাম, বাজারে পাওয়াও যাবে না। তা ছাড়া, লেখাপড়ার ব্যাপার তো নয়, কেন্দ্র অনুযায়ী একটা কিছু বল। রকমারি প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর একজন বলিয়া বসিল, একটা লক্ষ্মীর চুপড়ি দিলে হয় না? সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদও করিল এক[illegible] হাতে ডালি ধরিয়ে দেবে বাবা! বিলক্ষণ অলক্ষুণে যে! একজন মুচকি হাসিয়া কহিল, ডালি নয়, ধামা, কেন্দ্র-অনুযায়ীই বটে। বড়বাবু কিন্তু পছন্দ করিলেন, কহিলেন, ঠিক বলেছ, কম দাম, খাটি দিশী জিনিস, তা ছাড়া লক্ষ্মীর চুপড়ি লক্ষ্মীমন্তর হাতে মানাবে ভাল।

বড়বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হারাধনের কক্ষে ঢুকিলেন। হারাধন টেলিফোনের রিসিভার কানের কাছে ধরিয়া কথা শুনিতেছিল— যাহার তাহার নহে, প্রিয়তোষিণীর। প্রিয়তোষিণী বলিতেছিল, সকালেই দেখেছি, কিন্তু কিছু বলি নি আপনাকে, দেখছিলুম নিজে থেকে খবর দেন কি না! অভিমানের স্বরে কহিল, কই, মনে তো পড়ল না আমাকে? লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই ফোন ধরলুম। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ বিষাদের রেশ মিশাইয়া কহিল, যখন দেখলুম, তখন কি মনে হচ্ছিল, জানেন? মনে হচ্ছিল, সেদিন যদি আপনাদের সঙ্গ নিতুম, তা

হ'লে আপনার পাশে, মানে, আপনার সঙ্গে আমারও ছবি উঠে যেত। একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। হারাধন একটা জুৎসই উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সাক্ষাৎ রসভঙ্গের মত বড়বাবুর প্রবেশ ঘটিল। হারাধন বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে কহিল, কি দরকার? বড়বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, একটা বিশেষ দরকারে এসেছি স্যার। হারাধন রিসিভার রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া গরম হইয়া বসিল। বড়বাবু কহিলেন, আমরা আপিসের কর্মচারীরা মিলে আপনার সংবর্ধনা করব, স্থির করেছি। হারাধনের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; কহিল, তাই নাকি? কখন? বড়বাবু কহিল, আজ চারটের সময়। ভুরু কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিয়া হারাধন কহিল, বাইরে কাউকে নেমন্তন্ন করছ নাকি? বড়বাবু মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, আমাদের আয়োজন অতি সামান্য, বাইরে কাউকে ডাকা চলবে না। শুধু মিস্টার মুখার্জি আর মিসেস মুখার্জিকে ডাকা হবে। হারাধন পুলকিত হইয়া কহিল, সেই ভাল, দেরি ক'রো না, এখনই কাউকে পাঠিয়ে দাও।

সংবর্ধনা-সভায় মিস্টার মুখার্জি আসিতে পারিলেন না। কোমরের বাতটা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, একটু জ্বরও হইয়াছে। কাজেই মিসেস মুখার্জিকে একাই আসতে হইল। মাল্যদানটা তাঁহাকে দিয়াই সম্পন্ন করা হইল, চুপড়ি দান করলেন স্বয়ং বড়বাবু, আর প্রশস্তি পাঠ করল কলেজী ছোকরাটি।

পাঁচটার পরে হারাধন মিসেস মুখার্জিকে লইয়া মোটরে বাহির হইল। প্রথমে চলিল, একটা দেশী বড় হোটেলে। কর্মাধ্যক্ষ বহুদিনের পরিচিত; বহুবার বহু সঙ্গিনী লইয়া হারাধন সেখানে আসিয়াছে। সে অত্যন্ত সমাদরের সহিত হারাধনকে অভ্যর্থনা করিল এবং একটা

নিভৃত কক্ষে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া বসাইয়া পান-ভোজনের ব্যবস্থার জন্ম চলিয়া আসিল। অবিলম্বে ভৃত্য আসিয়া প্রচুর ও বহুবিধ ভোজ্য ও পেয় সামগ্রী টেবিলে সাজাইয়া দিয়া দরজা ভেজাইয়া চলিয়া গেল।

নিভৃত নির্জন কক্ষ, মাথার উপর ফ্যান ঘুরিতেছে। হারাধন নিজের গলার মালাটি মিসেস মুখার্জিকে পরাইয়া দিল। মুখ রক্তবর্ণ করিয়া মিসেস মুখার্জি কহিল, ও কি হ'ল? হারাধন হাসিয়া কহিল, মাল্যদানটা সম্পূর্ণ ক'রে দিলাম। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে মিসেস মুখার্জি কহিল, যান, আপনি ভারি দুষ্টু!

হোটেল হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা শহর ছাড়িয়া, শহরতলী ছাড়িয়া বহুদূর ঘুরিয়া আসিয়া রাত্রি আটটার সময়ে হারাধন প্রিয়তোষিণীকে বাড়ি পৌছাইয়া দিল। কহিল, বাড়ির ভেতরে পৌছে দিতে হবে নাকি? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়তোষিণী কহিল, ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না, উনি বলবেন কি?

সত্যি!—বলিয়া হারাধন প্রিয়তোষিণীর সঙ্গ লইল।

ভগবতীবাবু শুইয়া ছিলেন, একজন কোমরে সেক দিতেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, ভারি সুখী হয়েছি, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, দেশের মুখোজ্জ্বল করুন আপনি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লানকণ্ঠে কহিলেন, যা শরীরের অবস্থা হচ্ছে দিন দিন, বেশি দিন বাঁচব না আর, এদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন চিরদিন। প্রিয়তোষিণীর সহিত চোখাচুখি করিয়া হারাধন কহিল, কি যা-তা বলছেন! কোন চিন্তা নেই আপনার।

প্রিয়তোষিণীর কাছে বিদায় লইয়া হারাধন তাহার পোষা ফিল্মস্টারটির কাছে চলিল। সে সকালেই টেলিফোন যোগে

আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং একটি বার যাইবার জন্ত মাথার দিব্য দিয়াছে।

সকাল হইতে সারাদিন একের পর একটি করিয়া প্রায় আটচল্লিশ জন স্তাবক ও ভক্তকে বিদায় করিয়া রাত্রি আটটার সময়ে ফিল্মস্টার ঐন্দ্রিলা দেবী (ডাক নাম খেঁদী) প্রায় অধম হইয়া দোতলার বারান্দার একটি ঈজি-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া ছিল। হারাধনের মটরের হর্ন শুনিয়াই খাড়া হইয়া বসিয়া নাতি-প্রশস্ত সুন্দর কপালটির নীচে সুন্দর ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত করিয়া কহিল, গেলুম বাবা! তারপর চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে প্রসাধন-কক্ষে প্রবেশ করিল। হারাধন সরাসরি বারান্দায় আসিয়া ঈজি-চেয়ারে বসিল। মিনিট কুড়ি পরে ঐন্দ্রিলা ফিরিয়া আসিল,পরিধানে সাধারণ সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, চুল রুখু (পাউডার সহযোগে) ও এলোমেলো, মুখটি ম্লান। হারাধনের দিকে একবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া বারান্দার অপর প্রান্তে গিয়া, রেলিঙের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইল। মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল হারাধন; মাসে মাসে মোটা টাকা দিতে হইতেছে, তাহার উপরে আবার মান ভাঙাইতে হইবে নাকি? তাহা ছাড়া, প্রিয়তোষিণীর সঙ্গসুখ আজ তাহার মনকে সম্পৃক্ত করিয়া তুলিয়াছে, অন্ত নারীসঙ্গ আজ আর ভাল লাগিতেছে না তাহার। হারাধন উঠিয়া আসিয়া ঐন্দ্রিলার পাশে দাঁড়াইল। ঐন্দ্রিলার বাহুমূলে হাত দিল হারাধন। ঐন্দ্রিলা হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, থাক্। হারাধন কহিল, কেন? কি হ'ল? বিষণ্ণকণ্ঠে ঐন্দ্রিলা কহিল, কি আবার হবে! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ঐন্দ্রিলা। হারাধন বিষণ্ণমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঐন্দ্রিলা কহিল, সারাদিন পথ চেয়ে ব'সে আছি আমি, শুটিঙে পর্যন্ত যাই নি, কতবার স্টুডিও থেকে লোক এল,

ফিরিয়ে দিলুম; এতক্ষণে মনে পড়লে আমাকে? কি অপরাধ করেছি আমি? খুব সম্ভব কান্নায় শেষের দিকটায় কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল ঐন্দ্রিলার। ঐন্দ্রিলাকে শান্ত করিবার ঔষধ জানে হারাধন; মনিব্যাগ হইতে একটি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া ঐন্দ্রিলার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, অপরাধের জরিমানা, অপরাধীকে মাপ কর দেবী। ঐন্দ্রিলা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, চাই নে তোমার টাকা, আসল জিনিসটাতেই ফাঁকে পড়লুম। টাকা! রেখে দাও তোমার টাকা। কিন্তু নোটটি হাত-ছাড়া করিল না এবং হারাধনের আলিঙ্গনে আত্মহারা হইতে হইতে কোন এক সুযোগে নোটটি ব্লাউজের মধ্যে চালান করিয়া দিল।

রাত্রি দশটার সময় বাড়ি ফিরিল হারাধন। হলধর ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। হলধরের পদোন্নতি হইয়াছে বটে, পনরো টাকার গোমস্তাগিরি হইতে পঁচিশ টাকার সরকারি। ভগবতীবাবুর সহিত ভাগে হারাধন গঙ্গার ও-পারে যে বিরাট ইট চুন ও সুরকির কারবার ফাঁদিতে শুরু করিয়াছে, হলধর তাহাই দেখাশুনা করে। হলধরের স্ত্রীও বেকার বসিয়া নাই, হারাধন-গৃহিণীর খাস দাসীর কর্মে নিযুক্তা হইয়াছে। গোবর্ধন দাসদাসী-মহলে কি ভাবে মানুষ হইতেছে হলধর বা তাহার স্ত্রী সারাদিন খোঁজ রাখিবার অবসর পায় না। হারাধন হলধরের দিকে তাকাইয়া কহিল, আজকের হিসেবপত্র সব ঠিক আছে তো? হলধর কহিল, হুজুর, হ্যাঁ।

কাল সকালেই দেখব।—বলিয়া হারাধন বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

তেতলার বিস্তৃত ছাদে পাশাপাশি মাত্র দুইটি কক্ষ, বাকি ছাদটা এমনই পড়িয়া আছে। হারাধন একটা কক্ষে ঢুকিল, তাহার পত্নীর শয়নকক্ষ; দামী প্রকাণ্ড পালঙ্কে শুভ্রশয্যায় হারাধন-গৃহিণী শায়িতা;

শুষ্ক শীর্ণ দেহ, যৌবনের ক্ষীণমাত্রও অবশেষ নাই দেহে, শুধু বড় বড় চোখ দুইটিতে ব্যর্থ জীবনের ক্ষোভ—ক্ষীণ দ্যুতিতে জ্বলিতেছে। পায়ের কাছে বসিয়া একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের শ্যামলী মেয়ে, গৃহিণীর পায়ে হাত বুলাইতেছে। হারাধন আসিয়া পত্নীর পাশে বসিতেই মেয়েটি ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিল। হারাধন এই অবকাশেই তাহার মুখ দেখিয়া লইয়া মনে মনে কহিল, হলধরের বউটি তো মন্দ নয় দেখিতে! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলিয়াই এমন চমৎকার স্বাস্থ্য। আর আমার? নিজের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া নিশ্বাস ফেলিল হারাধন। মেয়েটির দিকে তাকাইয়া কহিল, হাত বুলোও না পায়ে। গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, না না, যাও তুমি, বাইরে দাঁড়াওগে। হলধরের স্ত্রী চলিয়া গেল।

গৃহিণী সক্ষোভে কহিলেন, সারাদিনের মধ্যে একটিবারও খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে না? মরেছি কি না—তাও তো দেখে যেতে পার একবার! হারাধন তাহার মাথায় হাত বুলাইবার চেষ্টা করিল। গৃহিণী হাতটা ঠেলিয়া দিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, থাক্, আর সেবায় কাজ নেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবেগহীন নীরস কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, দেখ, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার, মিথ্যে নিজেও কষ্ট পাচ্ছি, তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছি, একটু বিষ এনে দিতে পার আমাকে? দিও দেখি, খেয়ে মরব আমি। তারপর ঘরের কাঁটা স'রে গেলে, মনের মত যাকে খুশি ঘরে এনে সুখে রাজত্ব করবে তুমি।

হারাধন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, গৃহিণী পাশ ফিরিয়া শুইলেন, নিশ্বাস ঘন ও দ্রুত হইয়া উঠিল, হয়তো নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

হারাধন ধীর পদে বাহির হইয়া আসিয়া পাশের কক্ষে ঢুকিল। এখানে থাকে তাহার রুগ্ন পুত্র, আর তাহার নার্স সুনীতি, শান্ত শিষ্ট

সেবাপরায়ণা মেয়েটি, সুন্দরীও বটে। মাসে এক শত টাকা করিয়া মাহিনা দিতে হয় তাহাকে। হারাধন শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনীতি একটা পেয়ালায় করিয়া খোকাকে হর্লিক্স খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে, পেয়ালাটা মুখের কাছে আনিতেই খোকা দুই চোখ বুজিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া, মাথা নাড়িতেছে, কিছুতেই হর্লিক্স খাইবে না সে। পেয়ালাটা সরাইয়া লইতেই খোকা কাঁদিতে শুরু করিতেছে, ভাত খাব আমি, ভাত দাও আমাকে—

হাসি পাইল হারাধনের। বহু লক্ষপতি হারাধন, কত লোককে ভাত দিতেছে প্রতিদিন, তাহার একমাত্র পুত্র ভাতের জন্ম কাঁদিতেছে! কলিকাতার শহরে রাস্তায় রাস্তায় বুভুক্ষু ভিক্ষুকের দল যে সুরে দ্বারে দ্বারে ভাতের জন্ম দিবারাত্র প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছে, সেই সুরই যেন বাজিতেছে তাহার পুত্রের কণ্ঠে। হারাধন কহিল, খোকাকে কি ভাত দেওয়া চলবে না মোটেই? সুনীতি মৃদু বিনীত কণ্ঠে কহিল, না, পাকস্থলী ওর একেবারে শক্তিহীন হয়ে গিয়েছে, তরল খাদ্য ছাড়া আর কিছু সহ্য হবে না।

হারাধন বাহিরে আসিল। ছাদের এক প্রান্তে গিয়া, আলিসায় দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। সারা কলিকাতা শহর যেন অন্ধকার পুরী; যাহারা একদিন হাজার হাজার আলো জ্বালাইয়া অন্ধকারকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল, তাহারাই আজ আলো নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারকে সমাদরে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। হারাধন আকাশের দিকে তাকাইল; সদ্যধৌত সিমেন্টের মেঝের মত কৃষ্ণাভ ধূসর পরিচ্ছন্ন আকাশ, অসংখ্য তারায় সমাকীর্ণ। হারাধনের ঠিক চোখের সামনে, আকাশের এক প্রান্তে বৃহৎ এক খণ্ড মেঘ, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। হারাধনের মনে হইল যে,

বিধাতা পুষ্পে কীট, শুভ্র সুকোমল শয্যায় ছারপোকা, ও প্রেয়সীর মুখে পায়োরিয়া সঞ্চার করিয়া মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গে রসিকতা করেন এবং যিনি হারাধনের জীবনের পরিপূর্ণ সুধাপাত্রে একবিন্দু গরল ঢালিয়া দিয়াছেন ও তাহার জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সরস সুমিষ্ট সুপক্ক ফলটিতে এক ফোঁটা পচ ধরাইয়া দিয়াছেন, তিনিই যেন নিজের রসিকতায় মুহুর্মুহু হাসিতেছেন।

॥ শেষ ॥